পাকা ধানের গান

সাবিত্রী রায়

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সাড়ে তিন টাকা

এই লেখিকার

স্বজন

ত্রিস্রোতা

নূতন কিছু নয়

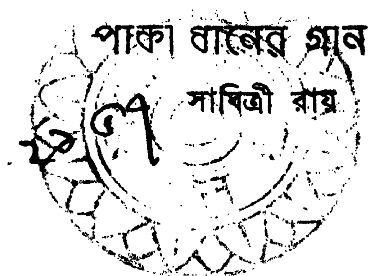
স্বরলিপি

মালশ্রী

আষাঢ়, ১৩৪৬

মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস, ১৮৬।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৪ হইতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

হৈমদি ও রমাকে


পাকা ধানের গান
সাবিত্রী রায়

দুরন্ত বেগে সাইকেলে ছুটে চলেছে পার্থ। পৌষের কনকনে শীত।... শার্টের ভেতর দিয়ে গায়ে ফুটছে বরফের কুচির মত ঠাণ্ডা হাওয়া। দু'ধারে রবি-শস্যের বুকে রাত্রির অন্ধকার। জোনাকী জ্বলছে অন্ধকারের বুক ভরে'। বহুদূরে গৃহস্থ বাড়ীর পরিচয় জানাচ্ছে শেয়াল-তাড়ানো কুকুরের ডাক। একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করে পার্থ, রাত্রি দ্বিপ্রহর হ'বে। পাহারায় রত নক্ষত্রপুঞ্জ—কালকেতুর কটিবন্ধ, অসি জ্বলজ্বল করছে। আকাশের স্তব্ধ নীলিমায় জেগে রয়েছেন বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, বিশাখা, বৃহস্পতি, শুক্র আরও কত মহাত্মা মুনি ঋষি, সাধ্বী মুনি পত্নীরা। গ্রামের ভিতর থেকে চৌকীদারের হাঁক কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে। একটু হুঁশিয়ার হ'য়ে ব্রেক কসে বেঁকে চলে ক্ষেতের আল ধরে। আল পেরিয়ে আবার তীরের বেগে ছুটে চলে। গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে চলেছে। হঠাৎ চমকে ওঠে—পুলিশ দেখা যাচ্ছে খেয়াঘাটে। আর একটু গেলেই সর্বনাশ হ'য়ে যেতো। অল্পের জন্য ফাঁড়া কাটলো। সন্তর্পণে সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে ফুলস্পীডে প্যাডেল চালায়।

কিন্তু ওপারে যেতেই হ'বে, যে করেই হোক। মুহূর্তের মধ্যে সংকল্প স্থির করে ফেলে পার্থ।

নিস্তেজে বয়ে চলেছে শীতের বিশীর্ণা নদী। শেষ রাত্রির কুয়াসা উঠছে নদীর বুক থেকে। পার্থ সাইকেল থেকে নেমে কাপড়টা শক্ত করে বেঁধে নেয়; তারপর সাইকেলটা কাঁধে করে নেমে পড়ে নদীতে। বরফের মত ঠাণ্ডা জল। মনে হয় দেহের শিরাগুলি দিয়ে উষ্ণ রক্তের বদলে বরফ জল বইছে—সমস্ত শরীর যেন অবশ হ'য়ে আসছে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে সাঁতরিয়ে পার হয়!

শিব মন্দিরের পেছনে অপেক্ষা করছে জ্যোতিপ্রকাশ, পার্থকে এ অবস্থায় দেখে অবাক হ'য়ে যায়। খুশিও হয় মনে মনে "এই হাড় কাঁপানো শীতে

নদী সাঁতরিয়ে পার হ'য়ে এলে? তুমি বিপ্লবীদলের যোগ্য ছেলে বটে, কিন্তু এ ভেজা কাপড়ে ষ্টেশনে গেলে সন্দেহ করবে। তার চাইতে কোনও বাড়ীতে রাতটুকু কাটিয়ে যেতে পারলে ভাল হ'ত। কাছে কোনও চেনা বাড়ী আছে?"

"আমাদের পাঠশালার মাষ্টারমশাইর বাড়ী আছে মাইল দুই দূরে।"

"সেথানেই যাও। কিন্তু সাবধান। ঠিক সময়ে জায়গামত পৌছান চাই। না হ'লে সব পণ্ড হ'বে।" রুমালে বাঁধা একটি ভারী জিনিষ পার্থর হাতে দেয় জ্যোতিপ্রকাশ, "কোমরে বেঁধে নাও।" সংযত গম্ভীর আদেশ।

আবার সাইকেলে ছুটে চলে পার্থ। ভিজে শার্ট গায়ে—তার উপর ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে রাত কত বাকী। একটা তারা খসে পড়লো। হিম উঠছে ক্ষেতের বুক থেকে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষেত পাহারা দেবার টিন পিটানোর শব্দ। সরষে ফুলের গন্ধ। পার্থ নিজের বাড়ীর সামনে দিয়ে চলেছে। বাড়ীর লোক সব ঘুমিয়ে। উঠোনের কোণায় খড়ের গাদা, টিনের ঘর, হাঁসের খাঁচা—গরুটা জাবর কাটছে গোয়ালে। মা, বাবা, ভাই বোন সবাই নিদ্রিত। কতবড় হ'য়েছে লক্ষী এখন? কতবড় হ'য়েছে অর্জুন। একটু দেখে যাবে নাকি। মুহূর্তের মধ্যে আবার শক্ত করে নেয় মনের ক্ষণিক দুর্বলতাটুকু। তারপর প্যাডেলটার ওপর মনের শক্ত সংকল্পের চাপ দিয়ে জোরে পা ঘুরায়। নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে চলেছে পার্থ। লক্ষীর মুখখানাও যেন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। জলজল করছে তার নাকের নোলকটি, কপালের কাঁচপোকার টিপটি।

আরও একটা তারা খসে পড়লো অন্ধকার মহাশূন্যের বুকে। রহস্যময় রাত্রির কোন নিগূঢ় সংকেতময় কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ধাবমান জ্যোতির বিন্দু।

গৃহস্থ বাড়ীর আঙ্গিনা ছাড়িয়ে অন্ধকার স্তব্ধতায় ভেসে যাচ্ছে এক নবজাত শিশুর ক্রন্দন। স্তন্যহীনা দরিদ্র জননীর বিরুদ্ধে ক্ষুধাতুর শিশুর প্রথম অভিসম্পাতে ইতিহাসের করুণ ক্ষুব্ধ ইঙ্গিত?

শিশুর কান্না ক্রমশই আক্রোশে ফেটে পড়ছে। জননীর কণ্ঠস্বরও বিকৃত হ'য়ে ওঠে, "ওলো, ও দেবকী, উঠে জলটুকু গরম করে দিবি না কি? কি মরণই হ'য়েছে আমার। ওদিকে ডাক্তারের কড়া হুকুম নড়াচড়া করা চলবে না।"

অনেকক্ষণ ধরেই শিশুর কান্না শুনছে দেবকী ঘুমের মধ্যেই; তবু এ কাঁথার তলা থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। চোখ ভরা ঘুম—তার উপর বাইরে ঐ গায়ে ছুঁচফোটানো শীত।

পাশের খোপের তক্তপোষে শোওয়া দেবকীর বাবা শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে আসে অপরাধীর মত। এ বয়সে সন্তানের পিতা হওয়ার অপরাধটা যেন তারই। বিশেষ এই দরিদ্র সংসারে। উঠে এসে দীনবন্ধু আস্তে একটু ঠেলা দেয় বারো বছরের মেয়েটার গায়ে, "দেবী ও দেবী ওঠ ত। বোনের জন্য গরম জল করে' দিবি না, মা?"

মায়ের চড়াসুরের তেতো আওয়াজের পর বাবার কথাগুলি বড় অনুরোধের মত শোনায়। আর শুয়ে থাকতে পারে না দেবকী। চোখ ডলতে ডলতে উঠে পড়ে। কিন্তু কুপিটা আর খুঁজে পায় না। একটা হোঁচট খায় তক্তপোষের পায়ার তলার একটা ইটে। শীতের দিনের সামান্য একটু গুঁতোতেই মনে হয়, পায়ের নখটা বুঝি ছিঁড়ে গেল। তার উপর মায়ের ধমক, "কি লো, ঘুম কি আর ভাঙবে না। কি ঘুমই দিয়েছিল ভগবান তোর চোখে। নে, ঘটি থেকে একটু জল দিয়ে নে চোখে।"

কুপি আর খুঁজে পায় না দেবকী। অন্ধকারের মধ্যে এক হাতে পা-টা চেপে ধরে আরেক হাতে হাতড়াতে থাকে তক্তপোষের তলায়। খুঁজতে খুঁজতে কুপিটা যদি বা পেল, এতক্ষণে খেয়াল হয়, পাটশলা ত এনে রাখেনি বিকেলে। সর্বনাশ! মার বকুনি ত আছেই, তার উপর এই দুপুর রাতে রান্নাঘরের পেছন থেকে পাটশলা নিয়ে আসা! অন্ধকারের

ভিতর থেকে একটা ভূতুমপেঁচা ডেকে চলেছে—'ভুত-ভুতুম।' চোখে না দেখা ভূত প্রেতের আওয়াজের মতই গম্ভীর ডাক।

তবু উপায় নেই। পাটশলা না আনলে জল গরম করবে কি দিয়ে। এমন পাজি মেয়েও জন্মেছে, রোজ দুপুর রাতে ওর মিছরির জল না খেলে চলবে না। সমানে ট্যাঁ ট্যাঁ করবে। একমাসও নয় বয়স—এরই মধ্যে কি গলার স্বর। যেমন মেয়েটা, তেমন তার মা, আর ঐ ভুতুম পেঁচাটা। সব কটা তার শত্রু। মনে মনে গজ গজ করতে করতে কপাট খোলে দেবকী; বাঁ হাতে শক্ত করে ধরা কুপির পলতেটা বাতাসে কাঁপছে। নিবে গেলেই সর্বনাশ। শুয়ে শুয়ে আবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে সুবালা, "পাটশলা এনে রাখতে বুঝি কাল আর মনে ছিল না। কোনও কাজেই খেয়াল থাকে না, বিয়ের যোগ্যি মেয়ে। দু'দিন বাদে শ্বশুর শাশুড়ীর মন জুগিয়ে চলতে হ'বে। এমন উদাসীন মেয়ের কপালে যে কত কিল-গুঁতো লেখা আছে।" শাশুড়ীর কিলগুঁতোর ভাবনার চাইতে অনেক বেশী যে দুর্ভাবনা এখন দেবকীর ঐ ভুতুমপেঁচার "ভূত ভুতুম" আওয়াজের মধ্যে ঘরের বার হওয়া; সে কথা মাকে বল্লে ত কুরুক্ষেত্র লাগিয়ে দেবেন নবাবী বিছানায় শুয়ে শুয়ে। বলবেন, 'বাইরে যেতে ভয় করে, ন্যাকামী যত। দিনের বেলায় সাতপাড়ায় ধেই-ধেই করে নেচে আসতে ভয় করে না, আর যত ভয় এসে জমলো ঘরের পেছনে।" কিন্তু দিন আর রাত কি এক কথা। দুপুর রাতে মরা মানুষের আত্মারা যে ঘুরে বেড়ায় দেখা-না-দিয়ে, তাদের ভয়েই ত অমন গা ছম ছম করে। দেবকী কুপি হাতে নেমে আসে উঠোনে। উঃ, কি অন্ধকার চারদিকে। দিনের বেলার সুন্দর সুন্দর গাছ গাছালিগুলো কিম্ভূত কিমাকার হ'য়ে ওঠে রাত্রি বেলা। দৈত্যদানার মস্ত মস্ত হাত পা, গোল গোল চোখ যেন। আর ফাঁকে ফাঁকে "ভূত ভুতুম" আওয়াজ। মনে মনে একদমে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপতে জপতে তাড়াতাড়ি হাঁটে দেবকী। এক দৌড়ে যে এক আঁটি পাটশলা নিয়ে আসবে রান্নাঘরের পিছন থেকে,

তারও উপায় নেই—কুপিটা যদি নিবে যায়! আর কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা চারদিকে। যেমন ঠাণ্ডা হাওয়া, তেমনি ঠাণ্ডা মাটি। পায়ের তলাটা কেটে যাচ্ছে মনে হয়। পাটশলার আঁটিকে এক হাতে নিয়ে আরেক হাতে কুপিটা ধ'রে বড় বড় করে পা ফেলে দেবকী ঘাড়টা সোজা রেখে। ডান, বাঁয়ে কোনদিকেই তাকায় না—যদি কিছু দেখে ফেলে—ভূত প্রেতের লম্বা একটা হাত বা পা।

রান্নাঘরের পিছন থেকে উঠোনে পা দিয়েই দেখে, কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠোনে—সর্বাঙ্গ জলে ভেজা। সঙ্গে সঙ্গে পাটশলার পাঁজাটা হাত থেকে ফেলেই এক দৌড়। পার্থ মনে মনে প্রমাদ গণে। তাড়াতাড়ি পেছন থেকে ডেকে বলে চাপাগলায়—"এই দেবকী, শোন শোন। তোমার বাবাকে ডেকে দাও।"

মানুষেরই গলা। নাকি সুর নয়। দেবকী একটু আশ্বস্ত হ'য়ে ফিরে তাকায়। পার্থ এগিয়ে এসে বলে, "মাষ্টার মশাইকে ডেকে দাও। আমাকে চিনতে পারলে না?"

এতক্ষণে চিনতে পারে দেবকী। "পার্থদা না? স াঁকো ভেঙে বুঝি পড়ে গিয়েছিলে এই শীতের রাতে?"

"হ্যাঁ স াঁকো ভেঙেই।" বড় ঘরে তামাক টানার গুড় গুড় শব্দ হ'চ্ছে লক্ষ্য করে পার্থ বলে, "মাষ্টার মশাই জেগেই আছেন। আমি পশ্চিমের ঘরে বসলাম। মাষ্টার মশাইকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও। আর একটা কাপড়ও দিয়ে যেয়ো।"

দেবকী ঘরে গিয়ে দীনবন্ধুকে বলে, "পার্থদা স াঁকো ভেঙে একেবারে ভিজে এসেছে। আপনাকে ডাকছে পশ্চিমের ঘরে।" পার্থ এসেছে? অবাক হ'য়ে দেবকীর মুখের দিকে তাকায় দীনবন্ধু। তার পাঠশালা থেকে বৃত্তি পেয়ে সিলেট সরকারী স্কুলে পড়তে যায় পার্থ—। সেই থেকে দেশছাড়া সে। প্রায় সাত বছর আগের কথা। সেই সিলেট থেকেই পড়তে পড়তে

নাকি স্বদেশী ডাকাতদের দলে যোগ দিয়েছে। কোথায় থাকে কোথায় ঘোরে, তার বাপও জানে না। এক বছর যাবৎ পুলিশ খোঁজ করছে তাকে। আর সেই পার্থ এই রাতদুপুরে তার বাড়ীতে! কুপিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয় দীনবন্ধু। দীনবন্ধুকে ভালভাবেই চেনে পার্থ। তাই নিঃসংশয়ে একরাতের জন্য আশ্রয় চায়। দেবকী ধুতি দিয়ে যায়—সঙ্গে আগুনের পাতিলটাও রেখে যায় সামনে। পার্থর মুখের দিকে লক্ষ্য করে বলে দীনবন্ধু, "সারাদিন নিশ্চয়ই না খেয়ে রয়েছ। মুড়িটুড়ি কিছু খাও।" পার্থ বানিয়ে বলে, "আমি সদর থেকেই খেয়ে রওয়ানা হ'য়েছি। ট্রেন ফেল করায় আপনার এখানে এলাম। মনসাডাঙ্গায় গেলাম না। চট করে জানাজানি হ'য়ে যেতে পারে।" "না, না সেখানে না গিয়ে ভালই করেছ। তোমার জন্য মাসের মধ্যে কতবার যাচ্ছে তোমার বাবার কাছে,—একবার টোক পেলে আর ছাড়বে না।" কি একটু চিন্তা করে বলে দীনবন্ধু, "কিন্তু আমার মনে হয়, দিনের গাড়িতে না যেয়ে, রাতের গাড়িতেই যাওয়া ভাল তোমার। আমার এখানে ভয়ের কোনও কারণ নেই। চৌকিদারের সঙ্গে আমার খাতির আছে। তাছাড়া এ অঞ্চলে তোমাকে এখন চিনবেও না কেউ।" সুবালা খুশি হয় না। ফেরার ছেলে। তারজন্য আবার কোনও ফ্যাসাদে না পড়তে হয়। পাঁচ বছর যাবৎ বিদেশে বাস পার্থর। সেই তেরো বছরের পাঠশালার ছেলে, এখন একুশ বছরের কলেজে পড়া এক যুবক—এক নজরে চেনাও দুঃসাধ্য তাকে। তবু সারাটা দিন ঘরেই থাকে পার্থ। দীনবন্ধু বাজার থেকে চিতলমাছ কিনে এনেছে। রান্নাঘরে এসে বলে, "মুইঠ্যা রাঁধ দেবকী।" দেবকী কোনদিন মুইঠ্যা রাঁধেনি। ঝিনুক দিয়ে বসে বসে মাছগুলি আঁচড়িয়ে বের করে। সুবালা এখনও হেঁসেল ছোঁবে না। দুয়ারে দাঁড়িয়ে মেয়েকে রান্না দেখিয়ে দেয়।

খেতে বসে রান্নার সুখ্যাতি করে পার্থ, "বহুকাল পর এত ভাল জিনিষ খেলাম।"

দীনবন্ধু দেবকীকে ডেকে বলে, "পার্থকে আর একটু মাছ এনে দে।" মায়ায় ভরে উঠেছে তার মনটা। কখন যে কি ঘটে এসব ছেলেদের কপালে। খাওয়া হ'লে বাবাকে তামাক সেজে দিয়ে পার্থকে সুপারী দিয়ে আসে দেবকী। পার্থ মৃদুহাস্যে জিজ্ঞেস করে, "পড়াশুনা কর না।" দেবকী ম্লানস্বরে উত্তর দেয় "এখানে ত মেয়েদের স্কুল নেই। বাবার কাছেই একটু একটু পড়ি।'

পার্থ দেবকীর ম্লান-মুখখানি লক্ষ্য করে বলে, "তুমি যদি পড়তে চাও, আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সদর বালিকা বিদ্যালয়ের ঈষাণী দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

দেবকীর চোখদু'টি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, "সত্যি পারো? বাবাকে একটু বলে' যাবে তা'লে?"

সারাটা দিন দীনবন্ধুও বের হয় না। মনের তলায় চাপা উদ্বেগ, কে কখন টোক নিয়ে যায়, বলা যায় না। ঘরে বসে পার্থকে বোঝায়, "এবার এসব ছেড়ে সংসারী হ'ও। আই, এ, পাশ ছেলে গৃহস্থ কৃষকের ঘরে কম গৌরবের কথা নয়।"

পার্থ কথাটা ঘোরাবার জন্য বলে, "আপনি আজকাল বেহালা বাজান না?"

ঘরের কোণে তক্তপোষের উপর সাজানো তবলা, ডুগি খোল, করতাল, আর একটা বেহালা। দীনবন্ধু এ অঞ্চলের নাম করা কীর্তনিয়া। বহু দূরদূরে গ্রাম থেকে তার কীর্তনের বায়না আসে বারোমাস, নানা পূজোপার্বন উপলক্ষে। দোলযাত্রার সময় অষ্টপ্রহর কীর্তন হয় জমিদার বাড়ী। ছোটবেলায় পার্থও তার বাবার সঙ্গে বহুবার এসেছে দীনবন্ধুর কীর্তন শুনতে।

পার্থ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করে আশপাশের গ্রাম সম্বন্ধে। "ন্যাশনাল স্কুলের হেড মাষ্টার এখন কে?"

"শংকর বাবু। ঋষির মত মানুষ। কংগ্রেস অফিসেই থাকেন তিনি।"

"কংগ্রেস অফিসে আর কে কে আছেন এখন?"

"শংকর বাবু আছেন, আর খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রিয়তোষ বাবু থাকেন।"

বৈকালের ছায়া নামে উঠোনে। উঠোনে কাপড় রোদে দেবার তারে একটা ধুঁতুল গাছ লতিয়ে ওঠেছে। ধুঁতুলগুলি দুলছে মাঝে মাঝে। দেবকী একটা আঁকশী দিয়ে সেগুলো পাড়তে চেষ্টা করছে। দীনবন্ধু কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করে বলে, "ও ভাবে টানিস না, গাছে চোট লাগবে। দাঁড়া আমি পেড়ে দিচ্ছি।"

ধুঁতুল পেড়ে দিয়ে এসে তামাক খাবার যোগাড় করে দীনবন্ধু। কল্কের ছাইগুলো বারান্দারই এক কোণে ঢেলে রেখে নূতন করে টিকে ধরায়। তামাক খাওয়া হ'লে বেহালাটা তুলে নেয় কাঁধে।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে—হারিকেন ধরিয়ে লক্ষ্মীর ঘরে বাতি দিতে চলেছে দেবকী। কুন্তী সাথী খেলা শেষ করে বাড়ী ফেরে। সুবালা ডেকে বলে, "ঘাট থেকে সব হাত পা ধুয়ে আয় ভাল করে।" ধুনুচিতে ধুপ দিয়ে সারা ঘরে ঘুরিয়ে নেয় দেবকী, "হরি বোল, বোল হরি—আপদ বালাই দূর করি।" লক্ষ্মীর কাছে ধুনুচিটা রেখে উপুড় হ'য়ে প্রণাম করে। কিন্তু কি যে প্রার্থনা করবে, ভেবে পায় না আজ। কত অনন্ত প্রার্থনা, কত অফুরন্ত কামনা সুর হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে আজ বেহালার ছড়ের টানে, পূরবীর এ আকুল মূর্চ্ছনায়।

রাত্রিতে ঠিক একই সময়ে এক ঘুমের পর জেগে ওঠে মেয়েটা। দেবকী আজও পাটশলা এনে রাখতে ভুলে গেছে। আজ আর মায়ের বকুনি খেতে হয় না। ঘুম ভরা চোখে দুয়ারটা খুলে কুপি হাতে জোরে জোরে পা ফেলে চলে উঠোনে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে কাদের যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস। কোনও দিকে আর তাকায় না দেবকী। কুপির পলতেটার উপর চোখ রেখে দ্রুতপায়ে হাঁটে। উঠোনের মাঝখানে আসতেই একটা দমকা হাওয়ায় কুপিটা নিবে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে ওঠে দেবকী।

পার্থ পশ্চিমের ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ওর কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে।

বড় ঘরের দুয়ার খোলার শব্দ শুনেই উঠে পড়েছে সে। আর কিছুক্ষণ বাদেই রওনা হ'তে হবে তা'কে।

দেবকী আবার কুপি জ্বালিয়ে বাইরে এসে ভয়ে ভয়ে হাঁটে। পার্থ সামনে এসে বলে "ভয় করছে? চল আমি দাঁড়াচ্ছি। এতরাতে রোজ রোজ পাটশলা দিয়ে কি কর?"

"বোনের জন্য জল গরম করি।" সংক্ষেপে উত্তর দেয় দেবকী। কিন্তু বেশীক্ষণ মনের রাগ চেপে রাখতে পারে না। মনের বিরক্তি প্রকাশ করেই বলে, "রাতে উঠে মিশ্রির জল না খেলে ঘুম আসে না নবাব পুত্রীর।"

পার্থ হাসে কথা শুনে। তাকিয়ে দেখে, শীতে কাঁপছে দেবকী। স্নেহের সুরে বলে, "গায়ে চাদর দিয়ে বের হ'লেই পার—ভূত তা হ'লে আর ছুঁতে পারে না।"

"ধ্যেৎ ভূত আবার আছে নাকি?" টসটস করে জবাব দেয় দেবকী। "সত্যি ভূত নেই?" উত্তর শুনে হাসে পার্থ, "কিন্তু শীত ত আছে, শীতও ত ছুঁতে পারে না চাদর গায়ে থাকলে।"

রান্না ঘরের পেছনে পাঁজা করা ঝুলান পাটশলা। তা থেকে একটা আঁটি বের করে পা দিয়ে চেপে ভাঙতে ভাঙতে বলে দেবকী, "শীত আর কই? পৌষ মাস যায় যায়, শীতই পড়লো না এ বছর।"

রাত ভ'রে জলো বাতাস বইছে। নদীর ধারে বাড়ী। হাত পা বরফের মত হ'য়েছে ঠাণ্ডায়, আর দিব্যি বলে দিল দেবকী, "শীতই পড়লো না।"

আর কোনও প্রশ্ন করে না পার্থ। চাষীর ঘরে জন্ম তার। শীতের কষ্ট যে কি, অজানা নেই তার। এই দুরন্ত শীতের রাতে ভাই বোনদের গায়ের গরমই ছিল দেহ গরম করার একমাত্র উপায়। দেবকী ঘরে চলে যায়।

উনুনের উপর জল ফুটছে মাটির হাঁড়িতে। ফুটে আসা জলের সোঁ সোঁ শব্দ, দীনবন্ধুর তামাক খাওয়ার শব্দ আর বাইরের জলো হাওয়ায় গাছের ডালপালা নড়ার শব্দ। তিন রকমের আলাদা আলাদা শব্দ মিলিয়ে এক

অদ্ভুত রাত্রির সৃষ্টি হ'চ্ছে দেবকীর চারপাশে। শুধু নানা ধরণের শব্দের মাঝেই এ রাত্রির পরিচয়।

দূরে ভূতুম পেঁচাটা ডাকছে আজও—ভূত-ভূতুম। কিন্তু আজ আর ভয় করছে না দেবকীর।

জল ফুটে উঠেছে। সোঁ সোঁ শব্দটা এখন ফুটন্ত জলের টগবগ শব্দে পরিণত হয়েছে। পাটশলাগুলো জ্বলে জ্বলে নিবে আসছে। কুপিটার গায়ে কতগুলো শ্যামাপোকা মরে পড়ে আছে। কিছুই লক্ষ্য করে না দেবকী। তবু সব কিছুরই এক অলক্ষ্য ছাপ প'ড়ে চলেছে মনে। অপরিস্ফুট অনুভূতির বলয় চন্দ্রচ্ছায়ার মত।

আজ আর রাগ হয় না দেবকীর রাক্ষস মেয়েটির উপর। মোলায়েম হাতে তুলে আনে ইতিকে কাঁথায় জড়িয়ে। ইতিও আজ কি ভালই হ'য়েছে। এক ঝিনুক মিশ্রির জল গিলে ফেলে আবার হাঁ করে। দেবকী ঝিনুকটা মুখে দেয় আজ সতর্কতার সঙ্গে—ব্যথা যেন না পায়। আহা বেচারা, কত ক্ষিধেতে এমন করে কাঁদে রোজ রাতে। পেট ভরে মিষ্টি জল খেয়ে খুশিতে হাত পা ছোঁড়ে ইতি দিদির কোলের উপর। দেবকী সস্নেহে দেখে।

আট বছর বয়স থেকে মাঝ রাতে উঠে একটির পর একটি ভাইবোনকে মিশ্রির জল খাওয়াতে খাওয়াতে বিরক্তি ধরে গিয়েছে মনে। কিন্তু আজ নূতন চোখে দেবকী দেখে শিশুটির ছোট ছোট হাত পা, হাতের আঙ্গুলগুলো যেন গলানো মোমের পুতুলের মত নরম।

ভোরে উঠে বড় ঘরের বিছানা তুলে রেখে পশ্চিমের ঘরের বিছানা তুলতে যায় দেবকী। কিন্তু কি কাণ্ড—পার্থদা তার গায়ের চাদরখানা ভুলে ফেলে গেছে দেখছি। একটামাত্র শার্ট গায়ে এই শীতের রাতে কি করে কাটাবে গাড়ীতে। সস্নেহ চিন্তার ছায়া নামে চোখে। তবে কি পার্থদা ইচ্ছে ক'রেই রেখে গেল চাদরখানা। কিন্তু কি ক'রে জানলো, সত্যি যে ওদের একখানা চাদর কমতি পড়েছে কুন্তী বড় হ'য়ে ওঠায়। আটে পা দিল

কুন্তী এবার, তাই সাথীর চাদরখানা সে-ই গায়ে দেয়। সাথী দেয় কেতকীর খানা। আর কেতকী পেয়েছে তার বাবার পুরানো চাদরখানা। কীর্তন শুনে খুশি হ'য়ে দীনবন্ধুকে একখানা শাল উপহার দিয়েছে ভুইঞা বাড়ী থেকে। কিন্তু দেবকী আর তার মাকে শাড়ির আঁচল জড়িয়েই শীত কাটাতে হয়।

রাত্রিতে মোটা মোটা কাঁথার তলায় সবগুলো ভাইবোন জড়াজড়ি হ'য়ে শুয়ে যখন থাকে, শীত টের পায় না। কিন্তু বাইরে বের হয় যখন পাটশলা আনতে তখন টের পায় দেবকী, শীত কাকে বলে। দেবকী দীনবন্ধুকে এসে বলে, "বাবা, পার্থদা যে তার চাদরখানা ফল গেছে।"

"ফেলে যখন গেছে তখন তুই ওখানা গায়ে দে।" দেবকী অবাক হ'য়ে বাবার মুখের দিকে তাকায়—এ কি বলছেন আজ তার বাবা।

দীনবন্ধু বলে, "ঐ চাদর সে ফিরিয়ে নিতে আসবে ভাবছিস্ তুই? ওসব ছেলে যে পথ দিয়ে যায়, সে পথে আর ফেরে না।"

আর কিছু বলে না দীনবন্ধু। কি একটা বিষণ্ণতা থম থম করছে চারদিকের কুয়াসায়। চোখে ভাসছে তেরো বছরের একটি সুন্দর ছেলে তন্ময় হ'য়ে বেহালা শুনছে দুয়ারে বসে। আবেশে বিভোর দুটি চোখ।

সাথী ছুটতে ছুটতে আসে, "বাবা পুলিশ আসছে আমাদের বাড়ীতে।" বলতে বলতেই উঠোনে লাল পাগড়িতে ছেয়ে যায়। দারোগা, পুলিস, গ্রামের চৌকিদার। বাড়ী খানাতল্লাস করা হয়। তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘরগুলো দেখে। বড়ঘর, রান্নাঘর, বাহিরবাড়ীর ঘর, ঢেঁকিরঘর লাকরির ঘর—সব খুঁজে দেখে। ধানের মটকিগুলো সব উপুড় ক'রে ঢালে, মসলা পাতি ঢেলে ঢেলে কি দেখে। বৃথাই হয়রানি। আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় না। এই শীতের ভোরে এতখানি পথ ভেঙে বৃথাই ছুটে এসেছে—মনের রাগ আর চাপতে পারে না দারোগাবাবু। ঠাস ঠাস করে দুই থাপ্পড় লাগায় বুড়ো চৌকিদারের দুইগালে। "কই আসামী কইরে হারামজাদা।" উঠোনভর্তি পরিচিত লোক ছেলেপুলে। তাদের সামনে

বুড়োমানুষের এই অপমান। তবু আজ কারও মনে সহানুভূতি জাগে না। মনে মনে খুশি হয় দীনবন্ধু, ব্যাটা নেমকহারাম। এই সেদিনও তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছে ছেলের অসুখে ডাক্তার ডাকতে। আর সেই কি না গেছে দারোগাকে টোক দিতে?

দুপুরের মধ্যেই সবাই চলে যায়। দু'চারজন কৃষক উঠোনে বসে পার্থ সম্বন্ধে নানা ধরণের গল্প করে। কোন পাহাড়ে নাকি সাহেবদের সঙ্গে পার্থদের যুদ্ধ হ'য়ে গেছে। কেউ বলে, দ্বীপান্তর হ'য়েছে পার্থর। দীনবন্ধু নিঃশব্দে শোনে। দেবকী ছাড়া আর কোনও ছেলেপুলের কাছে পার্থর পরিচয় দেওয়া হয় নি। তবু দুশ্চিন্তা কাটে না মন থেকে। ভালয় ভালয় পৌছায় ছেলেটা তবেই হয়। মনটা বড় খারাপ হ'য়ে থাকে সারাদিন। তবু খাওয়ার পর একবার বের হ'তে হয়। বিলাসখানের বড় ভুইয়াদের বাড়ীতে কীর্তনের বায়না এসেছে। দু'রাতে দু'খানা পালা গাইতে হ'বে মাথুর আর মানভঞ্জন।

তালপুকুর থেকে ভুইঞাদের বাড়ী মাইল পাঁচেক হ'বে। ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দীনবন্ধু। পাঠশালার আয়ে আর চলে না সংসার। এই কীর্তনের দলটির উপরই নির্ভর। তাছাড়া এই কীর্তনই তার প্রাণ। বেহালাটায় ছড় টানার সঙ্গে কোন দূর অতীত গোপ যশোদের দেশে চলে যায় দীনবন্ধু। কৃষ্ণের সখা—সুদাম, বলরাম, রাধার সখী—ললিতা, বিশাখা। সুবালা এসব গান বাজনা কোনদিনই পছন্দ করে না। "ভদ্রলোকের বাড়ী ত নয়—যেন একটা যাত্রাদলের আসর - তবলারে, ডুগীরে।" গজ গজ করে সুবালা, "এর চাইতে জমিদারদের সেরেস্তায় একটা কাজ নাও জমিদারবাবুকে বলে কয়ে।"

দীনবন্ধু নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে। একটানা তিনমাইল পথ নদীর ধার দিয়ে। বাঁ দিকে ক্ষেতের পর ক্ষেত—সরষে, কলাই-মটর···। শাক তুলছে ভিখারী মেয়েগুলি। দীনবন্ধুকে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে।

দীনবন্ধু ধমক লাগায়, "পরের ক্ষেতে ঢুকে মটর ভাঙ্গছিস এই দিনদুপুরে? কার ক্ষেত এটা! লক্ষ্মণের না?"

একটি ছোট মেয়ে উত্তর দেয়, "মটর ভাঙ্গতেছিনা, এই চারটি সেচির শাক তুলছি।"

"সেচির শাক তুলতাছি! যা, ভাগ এখান থেকে।" আরেকবার ধমক দেয় দীনবন্ধু। দূরে সড়ক দিয়ে হাটে চলেছে হাটুরেরা। তাদের দেখে খেয়াল হয়, আজত হাটবার। একেবারেই ভুলে গেছে। তামাক নেই ঘরে। তাড়াতাড়ি পা চালায় দীনবন্ধু। হঠাৎ অবাক হ'য়ে দেখে, আমিনুদ্দির ক্ষেতের পাশের ক্ষেতটা খালি পড়ে রয়েছে। কি ব্যাপার? জমিটা ফেলে রেখেছে কেন? মফির মায়ের জমি না এটা?

তাকিয়ে দেখে, দূরে বটগাছতলায় আমিনবাবু জগাই বাঁড়ুজ্যে বসে বসে জরিপের ম্যাপ দেখছে। ফিতে নল, কাঁটা সামনে। দীনবন্ধুকে দেখে ডাক দেয়, "এই যে দিনুমাষ্টার,—কোনদিকে চললেন।"

"বিলাসখানে যাচ্ছি। তা মফির মায়ের জমিটা জরিপ করতে বুঝি?"

"আর বলবেন না।" পকেট থেকে দু'টো বিড়ি বের করে—একটা দীনবন্ধুর দিকে, একটা নিজে ধরায় জগাই বাঁড়ুজ্যে।

আলি এসে বসে মফির মাকে নিয়ে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাফির মা চোখ মুছছে। এই জমিটুকুন সম্বল তার। ধান পাট লাগিয়ে বছরের খোরাকীটা হ'য়ে যেতো। কিছুর মধ্যে কিছু না হঠাৎ একদিন শমন এসে হাজির—মাফির বাপ নাকি কাছারী থেকে দু'হাজার টাকা কর্জ নিয়ে খেয়েছে। আকাশ থেকে পড়ে মফিরমা। শাক ভাত খাওয়া মানুষ তারা, দু'হাজার টাকা নিয়ে খেয়েছে মফির বাপ—এ কি একটা বিশ্বাস যোগ্য কথা?

কিন্তু নায়েববাবু খত খুলে দেখায়, আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে খতে। মরা মানুষের আঙুলের ছাপ—সত্যি মিথ্যার বিচার একমাত্র আল্লা করতে পারেন।

কিন্তু গরীবের জন্য জমিদারের বিচারের উপর আর বিচার নেই। তাই জাল খতের জোরেই বুকের রক্ত, বুকের কলিজার সামিল ঐ জমিটুকু হাতছাড়া হ'তে চল্ল। অঝোরে চোখের জল ফল মাফির মা।

গ্রামের মাতব্বর দু' একজন উপস্থিত। আমিন বাবু নল ফিতে নিয়ে জরিপ শুরু করে। গোমস্তাকে ধমক লাগায় মাঝে, মাঝে, "এই সোজা করে' ধর ফিতে, টান করে ধর।" বাঁ হাতের বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে কলম নিয়ে বসে।

আমিন, গোমস্তা, দারোয়ান আর গ্রামের মাতব্বরদের হাঁকডাক ঠাট্টা তামাসায় বুক ঠেলে কান্না ওঠে মফির মায়ের, আকুল দৃষ্টি দিয়ে শেষ দেখা দেখে নেয় জমিটার। আলির চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠেছে চাপা আক্রোশে। দীনবন্ধুরও মনটায় সায় দেয় না। এভাবে একটা অনাথার জমি কেড়ে নেওয়া যায়! না হয় আর দু'টো বছরও সময় দিলে পারতো। কিছু টাকাও যদি শোধ করতে পারতো মফির মা।

হঠাৎ গ্রামের ভিতর থেকে ঢোল দেওয়ার শব্দ আসে। সবাই কান পেতে শোনে। ঢোল দিয়ে শমন জারি করছে সরকার। "পথকর না দিয়ে মনসাডাঙ্গার পথে কেউ যদি চলাফেরা করে, তবে ফৌজদারী শোপর্দ করা হ'বে।"

আবার আরেকটা বিড়ি ধরায় আমিন বাবু। "পথকর দেবে না—বুঝুক এবার শালারা। জমিদারকে ফাঁকি দেবার ঠেলা।"

আলি প্রতিবাদের সুরে উত্তর দেয়, "গ্রামবাসীর দাবীটা ত এমন কিছু অন্যায় ছিল না। মনসাডাঙ্গার হাটুরেদের ঐ একটি মাত্র পথ। অথচ বর্ষার দিনে অর্দ্ধেক পথই থাকে জলের তলায়। মনসাডাঙ্গার পোলটা ভেঙে রয়েছে দু' বছর হ'ল। কয়টা টাকা খরচ করলেই ওটা মেরামত হয়। বুক জল ভেঙেই যদি চাষীরা হাট বাজার করবে তবে আর পথকর দিয়ে লাভ কি?"

"তোদের বাপ ঠাকুরদারা ত বুক কেন, গলাজল ভেঙেই হাট বাজার করতো।

পরনের গামছাখানা খুলে মাথায় বেঁধে নিতো তারা।" বলে মুচকি হাসে আমিনবাবু।

সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় আলির। সেও উত্তর দেয়, কড়া বিদ্রূপের সুরে, "শুধু আমাদের বাপ ঠাকুরদারা কেন অনেকেরই বাপঠাকুরদা গামছা খুলে মাথায় বেঁধে খাল সাঁতরে পার হ'য়েছে। তা' নিয়ে কথা তুলে ত লাভ নেই। গ্রামের মানুষের কথা হ'ল পথকর নিতে হ'লে পথ ভাল করতে হ'বে—পোল মেরামত করতে হ'বে।"

আমিনবাবু খোঁটাটা তখনকার মত হজম করে নিয়ে বলে, "পথের জন্য এত যখন গরজ, তখন কয়টা টাকা তাদেরই ট্যাঁক থেকে দিক না?"

"তাদের টাকা থাকলে কি এমন অত্যাচার করতে পারেন আপনারা। এই যে মফির মায়ের জমিটা, এ ভাবে বেদখল করতে পারতেন। ধর্ম বলেও কি কিছু নেই জমিদারদের। তাদের ধর্মের বিচার করারও কি কেউ নেই?"

"ধর্মের বিচার করবেন রাজা, করবেন সরকার। ধর্ম আছে বলেই ত তোরা তোদের মনিবকে ঠকিয়ে মরে গিয়ে ওত্রাণ পাচ্ছিস না। মফির বাপের কৃত কর্মের পাপ ভোগ করবে তার ছেলেমেয়ে বৌ।"

আলি উঠে পড়ে। বুকের ভিতরে ধক ধক করছে চাপা ক্রোধ। পাপপুণ্যের যোগ্য বিচার কর্তাই বটে।

দূরে ঝোপের মধ্যে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে একটা ডাহুক। সূর্যদেব পশ্চিম কাতে ঢলে পড়েছেন। স্তিমিত রোদে স্নান করছে ক্ষেতগুলি। সবাই চলে গিয়েছে শুধু আমিনবাবু জমানবিশবাবু বসে বসে ম্যাপ, কাগজপত্র ফিতে নল সব গুছিয়ে রাখছে। গম্ভীর হ'য়ে বলে আমিনবাবু, "ছোঁড়াটা বড় লম্বা লম্বা কথা বলে গেল। একটু নজর রাখতে হ'বে ওর উপর। এই পথকর বন্ধ করার ব্যাপারে ওই নিশ্চয় চাঁই।"

আহারের পর তামাক খেয়ে পাঠশালায় যায় দীনবন্ধু। নদীর ধারে একটা লম্বা টিনের ঘরে প্রাইমারী স্কুল। আলকাতরা দিয়ে রঙকরা ঘরের বেড়া। সামনেই একটা মস্ত বটগাছ। ঘরের ভিতরে বহুকালের পুরোনো কয়টা বেঞ্চি। শিক্ষকের জন্য একটি লোহার চেয়ার। একটি ব্লাকবোর্ড।

ডেস্ক নেই—ছাত্ররা হাতের উপর স্লেট রেখে অঙ্ক কষে। দীনবন্ধু নূতন অঙ্ক শেখায়। মন কষার যোগ। চক নিয়ে বোর্ডে অঙ্ক বোঝায়—চার ছটাক আর পাঁচ ছটাকে নয় ছটাকের নামানা এক ছটাক। হাতে কত থাকবে পচা? "পচা তখন মন দিয়ে একটি লক্ষ্মী পেঁচার ছাব আঁকছে স্লেটে। নয় কথাটা শুধু কানে পৌঁছেছে তার। উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় সে, "নয়।"

দীনবন্ধু অবাক হ'য়ে মুখের দিকে তাকায়, "নয় ছটাকের হাতে থাকে নয়? কয় ছটাকে এক পোয়া হয়?"

পচা উত্তর দেয়, "বৃন্দাবনের দোকানে চার ছটাকে এক পোয়া, হরিমুদির দোকানে সাড়ে তিন ছটাকে এক পোয়া, আর জগাইবাবুর দোকানে তিন ছটাকে এক পোয়া।"

উত্তর শুনে তাজ্জব বনে যায় দীনবন্ধু। "তিন ছাটাকে এক পোয়া জগাইবাবুর দোকানে?"

কেষ্টা উঠে দাঁড়িয়ে সমর্থন করে সহপাঠীকে, "হ্যাঁ স্যার। বিশ্বাস করেন স্যার। আমাদেরও এক পোয়া লক্ষ্মীবিলাসের তেলের শিশিটা ভরে না আমিনবাবুর দোকান থেকে তেল কিনলে।"

কি বিপদ। দীনবন্ধু হাল ছেলে দিয়ে বসে পড়ে। এমন নিরেট গর্দভ ছাত্রদের মাষ্টার হওয়াও শাস্তি বিশেষ। ছাত্র ছিল পার্থদের সময়ে। তারই এই পাঠশালা থেকে বৃত্তি পায় পার্থ। আর এদের মাথায় ঘিলুর বদলে শুধু গোবর। সেদিনের মত অঙ্ক শেখান শেষ করে বাংলা পড়ান আরম্ভ করে। "গৃহপালিত পশু কি কি?"

পচার লক্ষ্মীপেঁচার ছবি আঁকা শেষ হ'য়ে গেছে। চটপট উঠে দাঁড়িয়ে

উত্তর দেয় সে, "সিংহ, ব্যাঘ্র।" "তোর বাড়ীতে সিংহ ব্যাঘ্র পোষা হয়?" বক্রোক্তি করে দীনবন্ধু।

পচা না ঘাবড়ে উত্তর দেয়, "চিড়িয়াখানায় পোষা হয় স্যার। আমি কোলকাতায় গিয়ে দেখে এসেছি।"

"আমি গৃহপালিত পশুর কথা জিজ্ঞেস করেছি। চিড়িখানার পশুর কথা জিজ্ঞেস করিনি।"

"চিড়িয়াখানায়ও অনেক গৃহ আছে স্যার। এরকম টিনের ঘর নয়। পাকা দালান। পাকা দালানেই থাকে সিংহ বাঘ আরও কত পশু।"

"হ্যাঁ এবার সেই পাকা দালানে তোকেও নিয়ে রাখা হবে।"

হঠাৎ নদী ভাঙার একটা দুম্‌দাম্ শব্দে আচম্‌কা চমকে ওঠে সবাই। পাঠশালা থেকেই চোখে পড়ে, মস্ত একটা চাপ ভেঙে পড়লো নদীতে।

দীনবন্ধু খানিক দূরে গিয়ে নদীর ঘূর্ণির দিকে তাকিয়ে দেখে। কোথায় ছিল এ নদী। আর কোথায় এসেছে। সেই শিবের মন্দির, কালীখোলার মাঠ—বটতলা—সব নদীর কোন অতলে তলিয়ে গিয়েছে। কেমন উদাস হয়ে আসে দৃষ্টি। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলে, "যা এবার সারি দিয়ে নামতা বল।"

ছাত্ররা খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। নামতা পড়ার পরই পাঠশালা ছুটি হয়। ক্লাসের ভাল ছাত্র রাম নামতা পড়ায় সহপাঠীদের।

"বারো দুগুণে চব্বিশ।"

এক ঝাঁকে সব ছেলেরা সুর করে বলে, "বারো দুগুণে চব্বিশ।" "তিন বারো ছত্রিশ।" "তিন বারো ছত্রিশ।"

পাঠশালার গা ছুঁয়েই ধানক্ষেত চলে গিয়েছে নদী পর্যন্ত। চারদিকে থৈ থৈ করছে সবুজ ক্ষেত। ধানের শীষগুলিতে সুদূর হেমন্তের স্বপ্ন। ধান-ক্ষেতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে পাঠশালার ছেলেদের নামতা পড়ার সুর— "চার বারং আটচল্লিশ। পাঁচ বারং ষাট।" দীনবন্ধুর চোখের তারা ছুটি

মাঠের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে আসে। একটা অন্তর্লীন বিষণ্ণ ছায়া পড়ে চোখের তারায়। যেন কোন রহস্যময় অজানার স্পর্শ রয়েছে অপরাহ্ণের রোদের এই কাঁচা সোনার রঙে। কোন অসীম অনন্তের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইছে এক অপার্থিক আত্মা।

পাঠশালা ছুটি হয়ে যায়। স্লেট পেনসিল, দোয়াত কলম, পুঁথি নিয়ে চলেছে ছাত্ররা—গায়ে ছেঁড়া জামা, পরনে ময়লা জাঙিয়া। খালি পায়ে ধুলো মাখা। আবার ধীরে ধীরে একটা আত্মতৃপ্তির প্রসন্ন আমেজ ধরা দেয় সে বিষণ্ণ চোখের তারায়। গরীব গ্রামের গরীব ছেলেদের মানুষ করছে সে। এই মহীয়ান ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে তাদের। পুরুরাজ—অশোক, হর্ষবর্ধন। এই বিরাট ভারতবর্ষের নদী, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, উপকূল। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র। মানচিত্রটা সযত্নে গুটিয়ে রাখে একটা পেরেকের সঙ্গে।

ছেলেরা চলে গেলে বসে বসে ত্রৈমাসিক পরীক্ষার প্রশ্ন তৈয়ার করে দীনবন্ধু। "বাংলা দেশের কৃষিজাত দ্রব্য কি কি? তুলা জন্মায় কোথায় কোথায়? রবিশস্য কাহাকে বলে। আউশ ধান ও আমন ধানে পার্থক্য কি?"

প্রশ্ন করা শেষ হ'লে ঘরে তালা দিয়ে নদীর ধার ধরে' হাঁটে। পাড়ে আছড়ে পড়ছে নদী ভাঙা ঢেউ। মাঝ নদীতে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চিক্ চিক্ করছে শেষ বেলার রোদ। যেন একখানি মুলতান রাগিণী ছড়িয়ে রয়েছে এই রোদে-নাওয়া ঢেউয়ের গায়ে। হঠাৎ মনে পড়ে দীনবন্ধুর, বেহালাটা কতদিন ধরে পড়ে রয়েছে বৃন্দাবনের দোকানে। বৃন্দাবনের দোকানের দিকেই হাঁটে দীনবন্ধু। দোকানে পৌছাতে পৌছাতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। বৃন্দাবন দোকান ঘরের দুয়ারে জল ছিটিয়ে ধুনো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বেড়ার গায়ে টাঙান গণেশের ছবির কাছে ভক্তিভরে প্রণাম করে' ধুনচিটা রাখে ছবির সামনে।

দুজন খরিদ্দার বসে রয়েছে বাইরের বেঞ্চিতে। দীনবন্ধুর বেহালাটা বের করে, মিঞাদের মশুর ডাল, পেঁয়াজ, লবণ মেপে দেয় বৃন্দাবন। অপরিচিত

মুসলমান খরিদ্দার দুজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। "একখানা বাজান দেখি, আমরা একটু শুনে যাই।"

দীনবন্ধু তাদের দিকে তাকিয়ে হাসে সস্নেহে। কাঁধের উপর ধ্বনিযন্ত্রে ছড় টেনে চলেছে। প্রৌঢ়ত্বের সীমা প্রায় ডিঙিয়ে চলেছে দীনবন্ধু। তবু কি মৃদু কোমলতা তার আঙুলের ডগায়। তার শীর্ণ আঙুলের টানে টানে শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে অশ্রুমতী রাগিণীরা। কি করুণ সুর।

ছড় থামিয়ে বলে দীনবন্ধু, "কি বাজালাম জান? বাগেশ্রী।"

দীনবন্ধুর ঠাকুরদা ছিলেন বৈষ্ণব। কীর্তন গান ছিল তাঁর পেশা ও ধর্ম। আর দীনবন্ধুর বাবা বেহালা বাদকের কাজ করতেন কোন থিয়েটারের দলে। ঠাকুরদা ও বাবা দুজনেরই গুণ অধিকার করেছে দীনবন্ধু উত্তরাধিকার সূত্রে। দীক্ষিত বৈষ্ণব না হলেও এই রাগ-রাগিণীর মধ্য দিয়ে রাধাতত্ত্ব তার মজ্জায় মজ্জায় মিশে রয়েছে। মেঘমল্লার, মুলতান, মালকোষ, এরাই তার আশৈশবের প্রাণের সাথী। অন্ধকার ভোরে রামকেলীর আলাপ শুনতে শুনতে তার ঘুম ভাঙতো। সংসারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না তার বাবার। আত্ম তন্ময়—সংগীত-সাধক।

অন্ধকার নামছে বন-বনানী ঘিরে। এ অন্ধকার রাত্রির বুকে মিশে রয়েছে কত সুর, কত সংগীত, কত রাগ-রাগিণী। বেহালাটা কাঁধে নিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে চলে দীনবন্ধু বাড়ীর দিকে।

ব্রহ্মপুত্রের একটা শাখা নদী বিলাসখান, তালপুকুর মনসাডাঙ্গার গা ঘেঁষে ভিতরে চলে গিয়েছে—উত্তরে। নদীর গায়ে গায়ে মালোপাড়া, কুমোরপাড়া, তাঁতীপাড়া। বাগদী, হাড়ি, রাজবংশী—আর মুসলমান চাষী। ধর্ম আলাদা হলেও তাদের সুখ দুঃখের ও স্বার্থের সম্বন্ধ একই। কেউ কারও ঘরে না ঢুকলেও উঠোনে বসেই সুখ দুঃখের আলাপ চলে। আজও সুদামের উঠোনে জড়ো হয়েছে সবাই। মাঝি, কুমোর, তাঁতী—সবাই সে বৈঠকে। স্বতন্ত্র

উপজীবিকা হলেও কুমোর, তাঁতি, জেলে মাঝিদের স্বার্থও চাষীদের স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন। তাই সরকারি ঢোল শুনে তারাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হাটে যাবার ঐ একটি মাত্র রাস্তা। রাস্তাটার সংস্কার হয় না। তারা নিজেরাই তবু মাঝে মাঝে সাঁকো বেঁধে কোনও মতে হাট-বাজার করে।

লক্ষণ বাড়ী বাড়ী গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে বৈঠকে আসার জন্য।

আলিই প্রথমে আরম্ভ করে, "কেউ আমরা দেবো না পথ-কর। দেখি কি করে আদায় করে। এইত সেদিন কেষ্ট কুমোর এক ঝাঁকা হাঁড়ি-কলসি নিয়ে সাঁকো ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। হাঁড়ি-কলসিগুলো ত গেলই, তার উপর কোমরে চোট পেয়ে দু মাস শয্যা নিয়ে থাকলো।"

সায় দেয় কেষ্টর ছেলে, "শুধু কি শয্যা? কবিরাজের পাঁচন, মালিশ তেল কিনতে কমপক্ষেও এক কুড়ি টাকা বেরিয়ে গেল।"

লক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে বলে, "পথকর না দিলে ফৌজদারী সোপর্দ করবে। ফৌজদারী, দেওয়ানী, নায়েবানী, বাবুয়ানী দেখি কত করতে পারে। রাস্তা সমান না করলে এক আধলাও কর দেবো না আমরা। হোক তারা ধনী লোক, আমাদের একেবারে গরু ভেড়া যেন মনে না করে। হাতের আঙ্গুল কাটলে রক্তই পড়ে গরীবেরও। কাটা আঙ্গুল দিয়ে জল বের হয় না।"

আলি আবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠে, "জুলুম না? এ কি সোজা জুলুম? এই ত মফির মায়ের জমিটুকু কেড়ে নিল, জাল খত দিয়ে। আবার আমিনবাবুর কত তেজ। বলে, নেংটা হ'য়ে খাল সাঁতরালেই বা দোষ কি তোদের। ছোটলোকের আবার লাজলজ্জা। ওদের কাছে কুকুর বিড়ালের সামিল আমরা।"

রুখে ওঠে লক্ষণ, "কুকুর ত তোরাই। শুধু কুকুর নয়। পা-চাটা কুকুর। তফাৎ শুধু তাদের ছেলেপুলে পেটের থেকে পড়েই ক-খ গ-ঘ শেখে। আর আমাদেরগুলো বন-বাদারে ঘুরে বেড়ায়। তবে অমন পা-চাটা কুকুর ধরার

থেকে হাল গরু ধরা অনেক ভাল। মূর্খ, চাষী হ'লেও আমরা অমন কুত্তার জাত নই। এই কথাটা বলে আসতে পারলে না আমিনবাবুকে।"

সুদামের শালা অমূল্য উত্তর দেয়, "আমাদের টাকা নেই তাই ছেলে-পুলেদের স্কুলে দিতে পারি না। স্কুলে দিলে তারাও ফাষ্টো হ'তে পারে। আমাদের পার্থ ই ত প্রমাণ করলো তা'। এতটুকু বয়স থেকে সব কটা পরীক্ষায় প্রথম হ'য়েছে সে।" পার্থর সাক্ষাত মামা অমূল্য। ভাগ্নের গৌরবে গৌরব বোধ করে' আবার বলে, "তাও ত খাতা ছিল না—পুঁথি ছিল না। কত কষ্ট করে পড়েছে ছেলেটা।"

কুঞ্জ মাঝি একটু স্বর নামিয়ে বলে, "শুনলাম পার্থ নাকি এই তালপুকুর দিয়েই কোথায় গেছে। আমাদের চৌকিদার নাকি এই দেখলো তাকে খেয়া ঘাটে, ফিরে তাকিয়ে দেখে, কোথাও নেই সে। চক্ষের নিমেষে উধাও। তাজ্জব কাণ্ড। এক সাংঘাতিক দলে নাকি নাম লিখিয়েছে। কত বোমা, পিস্তল, বন্দুক নাকি থাকে ওদের সঙ্গে সঙ্গে। পার্থকে ধরবার জন্য দীনু মাষ্টারের বাড়ী তল্লাসী করলো দারোগাবাবু।"

সুদাম অলক্ষ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছেলের আলোচনায়। অমূল্য বলে ওঠে, "সেও যে আরেক বাবু। সব শিয়ালেরা এক রা। পরনে ধোপ দুরস্ত ধুতী কাপড় জুতো জামার এত পয়সা আসে কোথা থেকে? শুধু কি তাই—আবার বাজারের মানুষ আছে না?"

অমূল্যর ভাই টিটকারী করে, "আরে বাবু যে, তাই ঘরের বিবিতে মন ভ'রে না।" তার কথা বলার ঢংয়ে হেসে ওঠে সবাই।

অমূল্যর খুড়ি মুখ টিপে হাসে, "রাম রাম, কথা বলার ছিরি কি ছোঁড়ার।"

অমূল্য সুর পালটে বলে, "থাক এসব বড় লোকের রামায়ণ মহাভারতে আমাদের কাজ নেই। আসল যে কথা হ'চ্ছিল।"

আগের কথার জের টেনে বলে আলি, "তাহ'লে এই রইল কথা—কেউ আমরা পথকর দেবো না। এক আধলাও না।"

"এক আধলাও না।"

জুয়ান কণ্ঠের সে আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই পুব পাড়ের বন-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে—অন্ধকারের ভিতর লক্ লক্ করছে আগুনের শিখা। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত চীৎকার।

"আলিদের পাড়ায়—ঘরে আগুন লেগেছে কার জানি।" একসঙ্গে ছুটে যায় সবাই। আলির ঘরেই আগুন জ্বলছে। কি করে আগুন লাগলো কেউ বলতে পারছে না।

"আগে আগুন নেবাও। পরে হবে সে খোঁজ।" ধমকে ওঠে পার্থর বাবা।

কলসী কলসী জল টেনে আনে মেয়ে-বৌরা। পাড়াশুদ্ধ ছেলেদের মরিয়া চেষ্টায় রক্ষা পায় আলির ঘরখানা। কিন্তু আলির ঘরের সংলগ্ন মফির মায়ের খড়ের ঘরখানা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ওরা আসার আগেই।

জুয়ান জুয়ান ছেলেরা হাঁপাচ্ছে তখনও—ঘাম ঝরছে দর দর করে। আর অঝোরে জল পড়ছে মফির মায়ের চোখ দিয়ে। স্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকে সবাই। কি ক'রে যে আগুন ধরলো—কেউ হদিশ পায় না।

একটি কথাও বলে না আলি। সমস্ত রক্ত তোলপাড় করছে ভিতরে কি এক সন্দেহে। অন্ধকারের মধ্যে দেখছে সে, জল জ্বল করছে ছ'টো কুটিল চোখ—একটা সরু গোঁপের রেখা—ক্রুর বীভৎস একটা মুখ।

"থানায় একটা এজাহার দিয়ে রাখতে হবে।" উপদেশের সুরে বলে আলির চাচা আমিমুদ্দি। "থানায়।" দাঁতে দাঁত চেপে একবার উচ্চারণ করে আলি।

রাগে, দুঃখে অপমানে যেন ফেটে যাচ্ছে তার চোখ মুখ। বেড়াজাল দিয়ে যেমন করে ছেঁকে ধরে মাছ, ঠিক তেমনি করে চারদিক দিয়ে জাল ফেলে মারতে চায় এরা তাদের। পোড়া ঘরের দুয়ারে বসে মফির মা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে মৃত পুত্রের নাম করে। "মফি রে—ওরে আমার মফি।"

আলি উঠে এসে তার হাত ধরে বলে, "চোখ মোছ মফির মা। আমরাই

তোমার মফি। আমার ঘরে চল আজ রাতের মত। তোমার ঘর আমরাই তুলে দেবো।”

“তুললেও সে ঘর থাকবে না রে আলি। আমার কপালই পোড়া রে। আমার কপালই যে পোড়া। তুললেও সে ঘর আবার পুড়বে।”

“পোড়ে যদি আবার তুলবো। যতবার পোড়াবে ততবার ঘর তুলবো।”

অন্ধকার উঠোনে গমগম করে উঠে সে কথাগুলো। সবাই সন্ত্রস্ত হ’য়ে মুখের দিকে তাকায়। যেন একটা জীবনমরণ প্রতিজ্ঞা ফেটে পড়ছে কণ্ঠস্বরে।

দীনবন্ধু ফিরে এসে বসে দাওয়ায়। দেবকীকে ডেকে বলে, “কল্কেটা একটু ধরা ত, দেবী।”

সুবালা ঘর থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করে, “এ কি ফিরে এলে যে এত সকালেই। বায়না আনতে গেলে না।”

“আজ আর যাওয়া হ’ল না। মনসাডাঙ্গাতেই দেরি হ’য়ে গেল। আলির ঘরে আগুন লাগিয়েছে কে কাল রাতে। ওরা সন্দেহ করছে জগাই বাঁড়ুজ্যেকে। তার সঙ্গে খাতির আছে চৌকীদারের। সে ব্যাটাই নাকি টাকা খেয়ে আলির ঘরে আগুন লাগিয়েছে। একেবারে অবিশ্বাস্যও মনে হয় না। দু’জনেই দু’ নম্বরের ঘুঘু। বাইরে থেকে বুঝবার সাধ্য নেই। শান্ত শিষ্ট মানুষটি।”

“হুঁ, যাকে বলে বিড়াল তপস্বী।” উত্তর দেয় সুবালা।

পাঠশালার সময় হ’য়ে যায়। দীনবন্ধু স্নান করে আসে।

পাঠশালায় এসেই মনের চিন্তা ভাবনা সব কেটে যায়। অঙ্কের ক্লাস। খড়ি দিয়ে বোর্ডে লেখে :—

“সের প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর
ছটাকের দাম শিশু তত আনা ধর।

আনা প্রতি পাঁচ কড়া, সিকি প্রতি পাই
গণ্ডা প্রতি এক কাক মনে রেখো ভাই।"

ছেলেরা একসঙ্গে মুখস্ত করে—

"কড়া প্রতি ধরিয়া লইবে পঞ্চ তিল
শুভঙ্কর দাস কহে এই মত মিল।"

হঠাৎ পচার দিকে চোখ পড়ে দীনবন্ধুর, "একি রে পচা—তোর প্যাণ্ট ভেজা কেন?" অকিয়ে দেখে ঘরের বেড়ার সঙ্গে একটা ভেজা গেঞ্জি মেলা রয়েছে। "গুগলি তুলতে নেমেছিলি?"

"না, স্যার, আমাদের সাঁকোর বাঁশটা কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। তাই খালটা সাঁতরে এলাম।"

সাঁকোর বাঁশ চুরি গেছে? আবার চিন্তিত হ'য়ে ওঠে দীনবন্ধু। এও নিশ্চয় জগারই কাজ। কিন্তু এভাবে ওদের ক্ষেপিয়ে তুললে শেষে একটা গোলমালই না আরম্ভ হয়। সাঁকো না থাকলে জগাইর ত কোনও অসুবিধা নেই। জমিদারের মোসাহেব—জমিদারদের ছিপ নিয়ে হাট বাজার করবে।

চিন্তিত মনে তাড়াতাড়ি পাঠশালা ছুটি দিয়ে দেয়।

হাটবার আজ। হাটে যেতে হবে তাকেও। সাঁকোটা যদি সত্যি না থেকে থাকে, সে ত আর খাল সাঁতরে ওপারে যেতে পারবে না। ওদিকে তামাক পাতা আজ না কিনলেই নয়।

বাড়ী এসে উঠোন থেকেই ডাক দেয়, "দেবী, দে আমার ছাতাটা দে দেখি, মেঘলা-মেঘলা লাগছে আকাশটা। হাট থেকে ঘুরে আসি বেলা থাকতেই। শুনলাম, আবার মনসাডাঙ্গার সাঁকোর বাঁশটা কে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

সুবালা ডেকে বলে, "ধান কিনতে হবে, সে খেয়াল আছে ত? ঘরে কিন্তু আর আধমন খানিক চাউল আছে। ধান কিনে আনতে আনতেই ত আর চাল হ'বে না। রোদে দেওয়া লাগে, সেদ্ধ করা লাগে। তাছাড়া

দেবকীর কাপড়ও কিনতে হ'বে এই হাটে। বাড়ন্ত হ'য়ে উঠেছে শরীর। এখন কি আর নয় হাত কাপড়ে চলে? ওকে একজোড়া দশ হাত কাপড় কিনে দিলে, ওর জোড়া কেতী পরতে পারে। ও মেয়েই বা আর কদ্দিন ফ্রক পরে ঘুরবে।"

দেবকী কষ্টে ধরিয়ে নিয়ে আসে। উঠোনে একটা জলচৌকীতে বসে দীনবন্ধু। তাকিয়ে দেখে সে, সত্যি লম্বা হ'য়ে উঠেছে মেয়েটা। এইত তের চলছে। বয়স অনুপাতে লম্বা একটু বেশীই। তাই পরণের শাড়ীতে পায়ের গোড়ালি ঢাকে না। তবু দেখতে ভালই লাগে। ছিমছাম গড়ন। মাজা রঙ গায়ের। চোখে মুখেও শ্রী আছে, লাবণ্য আছে। ঢল ঢল করে মুখখানা। স্নেহাতুর দৃষ্টি দিয়ে বার বার তাকায় দীনবন্ধু মেয়ের মুখের দিকে। সারাটা দিন খেটে মরে মেয়েটা আর বকুনি খায় মায়ের। তবু কি হাসি-খুশি মুখখানা।

"বাবার কি কাণ্ড।" বলেই খিল খিল করে হাসে দেবকী। "জামার পকেটে কইমাছ ভরে এনেছেন।" দেবকী কইমাছটা হাতে নিয়ে হাসির চোটে কথা আর শেষ করতে পারে না। "আমি গিয়েছি দড়িতে কাপড় গুছিয়ে রাখতে, হঠাৎ দেখি বাবার জামার পকেটে কি নড়ছে। প্রথমে ভয়ের চোটে আমি ত এক লাফ—সাপই নাকি।"

দীনবন্ধু হেসে ফেলে। "মাছটার কথা মনেই ছিল না। মনসাডাঙ্গার দিকে যেতে পথের মধ্যে দেখি এক খেজুর গাছের ঝোপে মাছটা আটকে রয়েছে। ওটাকে বের করে ছাতার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম। কিন্তু যা রোদ—ছাতাটা না মেললেও নয়। কি করি, শেষে পকেটেই পুরে নিলাম মাছটা।"

মাছটার দিকে আবার একটু চোখ বুলিয়ে বলে, "দেখেছিস কত বড় কই। বিলের কই ত, তাই এতবড়। আর তেমনি তেল।"

দীনবন্ধু বেরিয়ে গেলে সুবালা দেবকীকে বলে, "যা মাছটা কেটে একটু হলুদ লঙ্কা বাটা দিয়ে রেঁধে রাখ। এককালে ত মাছ ছাড়া মোটে ভাতই

খেতে পারতেন না। কিন্তু এমনই কপাল, এত নদী-বিলের দেশেও একটু মাছ পড়ে না পাতে।"

মায়ের কথা শুনে মনটা ভিজে ওঠে দেবকীর। এত মাছ ভালবাসে বাবা। দুপুরবেলা বঁড়শি দিয়েই ধরে আনতে পারে সে, বাবার খাবার মত মাছ। কিন্তু মা জানতে পারলে রক্ষা রাখবে না। তবু চুপিচুপি সাথীকে দু'টো পয়সা দিয়ে বলে, "বৃন্দাবন কাকার দোকান থেকে দু'টো বঁড়শি কিনে আনিস ত। মাকে বলিস না।"

আলির ঘরে আগুন যে জমিদারের কর্মচারীদের মধ্যেই কেউ লাগিয়েছে—এ বিষয়ে ক্রমশই নিঃসন্দেহ হয় সবাই। আরও ক্ষেপে যায় তারা—কিছুতেই পথকর দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয় বার ঢোল পড়ে গ্রামে—পথকর না দিলে ফৌজদারি সোপরদ্দ করা হবে। বাচ্চা ছেলেরা বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সুর করে বলে, "ফৌজদারি দেওয়ানী নায়েবানি বাবুয়ানী।"

একদিন ভোরে ক্ষেতে কাজ করতে করতে দেখে চাষীরা নদীর ধারে একটা তাঁবু খাটান হ'য়েছে। তাঁবুর সামনে পুলিস, দারোগা, চৌকীদার দফাদার জন পঞ্চাশেক হ'বে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারোগারা দলবলসহ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে। সন্ত্রস্ত হ'য়ে লক্ষ্য করে চাষীরা। আল্লাবক্স বলে, "মনসাডাঙ্গার দিকেই চল্ল মনে হয়।" একজন লক্ষ্মণের ক্ষেতে উঠে গিয়ে বলে আসে সংবাদটা। লক্ষ্মণ ক্ষেত ছেড়ে উঠে যায় তাড়াতাড়ি। "দেখে আসি কি ব্যাপার।"

বাড়ী পর্যন্ত আর যেতে হয় না। পথেই দেখে, ছুটোছুটি করছে ছেলেরা। একটি ছোট ছেলের মুখে শোনে—পুলিস বাড়ী বাড়ী ঢুকে মারপিট করছে। সুদামের বাড়ীতেও ঢুকেছে। কয়দিন ধ'রে জ্বরে ভুগছে সুদাম। কাঁথার তলায় শুয়ে ছিল। দারোগা তার ঘরে ঢুকে এমন এক লাথি লাগিয়েছে বুট

দিয়ে, বুড়ো মানুষ টাল সামলাতে না পেরে ভিরমি খেয়ে পড়ে যায়। লক্ষ্মণের শাশুড়ী মঙ্গলা গিয়েছিল গরু বের করতে গোয়ালে। চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, জামা কাপড় ভিজে যাচ্ছে সুদামের। ছুটে গিয়ে ধরে সে স্বামীকে, "মানুষটাকে মেরে ফেল্ল গো—বুড়ো মানুষ কাহিল মানুষ, কদিন ধরে জ্বরে ভুগছে।" দারোগা মঙ্গলাকে ঠেলে ফেলে সমানে ঘুষি লাগায় সুদামের নাকে মুখে, "বল, পার্থ কই। তোর ছেলের খবর তুই জানিস না, পাজী বদমাইস!"

লক্ষ্মণ বাড়ী ঢুকে এ দৃশ্য দেখে আগুন হ'য়ে ওঠে। দারোগার সামনে গিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলে, "পার্থ কই তা' উনি জানবেন কি করে।"

একজন চৌকীদার বলে দেয়, "এই ব্যাটা আরেক পাণ্ডা।" সঙ্গে সঙ্গে সুদামকে ছেড়ে লক্ষ্মণের নাকে মুখে ঘুষি লাগায় দারোগা।

"বল, পথকর দিবি কি না।"

"এক আধলাও না।" গর্জে ওঠে লক্ষ্মণ।

রাগে গলার স্বর বিকৃত হ'য়ে ওঠে দারোগার। একজন পুলিসকে ডেকে বলে, "বাঁধো শালাকে।" সারাটা সকাল ঘরে ঘরে তাণ্ডব চালায়। যাকে সামনে পায় তাকেই মারে। ধান চালের মটকিগুলি ভেঙে চুরমার করে। তারপর কয়জন জুয়ান ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে তাঁবুর দিকে।

সুদামের মেয়ে লক্ষ্মী বাসন মাজতে বসেছে নদীতে। গত ফাল্গুনে লক্ষ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়েছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে সে, লক্ষ্মণকে বেঁধে নিয়ে চলেছে পুলিসে। শুধু লক্ষ্মণকে নয়, গ্রামের আরও অনেককেই বেঁধে নিয়ে চলেছে। কিছুর মধ্যে কিছু না, ভাল মানুষ, সকালবেলা পান্তা খেয়ে গেছে ক্ষেতে কাজ করতে—এরই মধ্যে এ কি কাণ্ড। আতঙ্কে চোখের পাতাটি পড়ে না লক্ষ্মীর।

লক্ষ্মণ ডেকে বলে, "বাড়ী যা লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মী বাসনের পাঁজা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসে। উঠোনে পা

দিয়েই থমকে দাঁড়ায়। কি কাণ্ড! উঠোনময় ধানের মটকি, হাঁড়ি পাতিল সব ছড়ানো—ভাঙা, আধা-ভাঙা। ধান, চাল, মুগ, মসুর সব একাকার। বালিসগুলো ছেঁড়া—তুলোগুলি ধুলোয় মাখা, উঠোনে ছড়ান।

লক্ষ্মীকে দেখে কেঁদে ফেলে মঙ্গলা, "তুই কোথায় ছিলি। লক্ষ্মণকে ত' ধরে নিয়ে গেল পুলিসে। আর দেখ তোর বাবাকে"—কথা আর শেষ করতে পারে না মঙ্গলা। ঠোঁট কেঁপে ওঠে। ঘরের দাওয়ায় অচেতন অবস্থায় শোওয়া তার বাবা। চোখ মুখ ফুলে বিকৃত হ'য়ে উঠেছে। মঙ্গলা জলপটিটা বদলে দিয়ে যায়। লক্ষ্মী বাসনের পাঁজাটা রান্নাঘরে রেখে আসে। হাতপা যেন আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। মাকে বলে, "নদীর পাড় দিয়েই ত নিয়ে গেল ওদের।"

উঠোনে বসে শিল নোড়ায় গাঁদা পাতা ঠুকছে দাসুর মা। সম্পর্কে লক্ষ্মীর পিসী। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, "তুই দেখে এলি? কোনদিকে গেল?"

"বিলাসখানের দিকে। আরও অনেককেই নিয়ে গেল। আলিভাইকে, ইউনুস ভাইকে—নিকুঞ্জ খুড়োকে।"

দাসুর মা গাঁদা পাতা ছেঁচা শেষ হ'লে লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বলে, "তোর বাবার নাকে রসটা লাগিয়ে দে। যা রক্ত পড়ছে। মেরে আর রাখেনি কিছু মুখপোড়ারা। বুড়ো মানুষটার গায়ে পা তোলা, ঐ পা খসে পড়বে না! পোকা পড়বে ঐ পায়ে।" দুঃখে অপমানে শাপ দেয় মঙ্গলা আর উঠোন থেকে চাল ডালগুলো ঝাঁট দিয়ে তোলে।

সূর্য মাথার উপরে। তখনও উনোন ধরেনি কোনও বাড়ীতে। লক্ষ্মীকে ডেকে বলে মঙ্গলা, "যাও ত লক্ষ্মী, চারটি পাটশলা দিয়ে ওনার দুধ সাবুটুকু জ্বাল দিয়ে আন।"

কুলোতে ক'রে খানিকটা ধুলো মাখা চাল-ডাল ঝেড়ে বলে, "আর নে এই চাল-ডাল চারটি ফুটিয়ে রাখ। কখন ছাড়বে ছোঁড়াটাকে, কে জানে।

এসে যেন চারটি মুখে দিতে পারে। ভাগ্যিস অর্জুনটা বাড়ী ছিল না। না হ'লে ওটাকেও ধরে নিয়ে যেতো।"

দাস্থর মা বাতাস দিচ্ছে স্থদামের মাথায়। স্থদাম চোখ মেলে তাকায় একবার। একটু জল খেতে চায়।

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ঘটি থেকে জল ঢেলে দেয় বাটিতে। বাবাকে ধরে বসায় আস্তে আস্তে। মঙ্গলা এক টুকরো মিশ্রি বের করে আনে, "এই মিশ্রিটুকু মুখে দিয়ে জল খাও। খালি পেটে জল খেয়োনা।" চোখ মুখ ফুলে নীল হ'য়ে রয়েছে—ব্যথায় টনটন ক'রছে শরীর। চারদিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "লক্ষ্মণ আসে নি?"

"এখনও ত আসে নি।"

"কংগ্রেস আশ্রমে একবার গেলে পার প্রিয়তোষ বাবুর কাছে। শুনে এস কি বলেন উনি।" বলতে বলতেই প্রিয়তোষবাবু এসে দাঁড়ায় উঠোনে। মঙ্গলা তাড়াতাড়ি জলচৌকী এনে দেয় বসতে। "বুড়ো মানুষটাকে মেরে কি করেছে, দেখেন।"

"সেই শুনেই ত' এলাম।" স্থদামের কপালে হাত দিয়ে বলে প্রিয়তোষবাবু, "জ্বরও ত একটু হ'য়েছে।"

"জ্বর হ'বে না। যা মার মারলো।" দাস্থর মা জবাব দেয়।

প্রিয়তোষবাবু উত্তর দেয়, "এই ত পরাধীন দেশের অভিশাপ। এ অপমান হজম করে গেলে ওদের আস্পর্ধা আরও বেড়ে যাবে। ইংরেজদের পা-চাটা কুকুরদের জানিয়ে দিতে হবে যে ভারতবাসী আমরা কুকুর বিড়াল নই। এর প্রতিবাদে কালই একটা সভা করা হ'বে মনসাতলায়। তোমরা এ গ্রামের সবাইকে খবর দিয়ে দিও। আমি এখন উঠি। শুনলাম ওদের নাকি থানায় নিয়ে গেছে। দেখি ওদের জামিনের ব্যবস্থা করতে পারি কি না।"

মঙ্গলা বাটায় করে পান এনে রাখে সামনে। স্থদাম লক্ষ্মীকে ডেকে বলে, একটা ডাব কেটে এনে দে। এই রোদে রোদে ঘুরবেন এখন।"

"না, না ডাবের কোনও দরকার নেই।" একটু সুপারী মুখে দিয়ে উঠে পড়ে প্রিয়তোষবাবু।

বেলা পড়ে আসে। মঙ্গলা বার বার রাস্তার দিকে তাকায়। কখন ছাড়বে ওদের?

এক বছরও হয় নি লক্ষ্মণের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। মা বাপ নেই ছেলের। বড় ভাই জাহাজীর কাজ করে চাটগাঁয়।

বহুকাল দেশ ছাড়া সে। এই এতটুকু বয়স থেকেই পার্থর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল লক্ষ্মণের। বিয়ের'পর তার বাড়ীতেই থাকে লক্ষ্মণ। পার্থর বাবার সে শক্তি আর নেই। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে কাহিল। অর্জুনও ছেলেমানুষ। লক্ষ্মণই ক্ষেতের কাজ করে। বীজ বোনা, নিড়ান দেওয়া, ধান কাটা, ধান তোলা, ঝাড়াই মাড়াই সব কিছুতেই লক্ষ্মণ তাদের ডান হাত। লক্ষ্মণকে যদি না ছাড়ে—যদি জেলখানায় নিয়ে যায়। জেলখানা! ভাবতেই হাতে-পায়ে ঝিম ধরে আসে।

অর্জুন বাড়ী ফেরে বিকেলের গাড়ীতে। তাকে সদরে পাঠিয়েছিল প্রিয়তোষবাবু তুলো কিনতে। পথে শুনে আসে, আলিকে নাকি মেরে আধমরা করেছে থানায় নিয়ে। বুকের ভিতরটা অবশ হ'য়ে আসে মঙ্গলার। লক্ষ্মীর পটের কাছে গিয়ে মানত করে, "মা, তুমি ওদের ফিরিয়ে এনে দাও। পাঁচপোয়া বাতাসা দিয়ে ভোগ দিয়ে আসবো হরিতলায়।"

গরুগুলোকে খড় কেটে দিয়ে আসে লক্ষ্মী। ঘরের কাজ-কর্ম সেরে নেয়। বিকেলে সভায় যেতে হবে।

অর্জুন নাইতে যায় দীঘির ঘাটে। বেলা একেবারেই নেই। আরেক ঘাটে বসে বাসন মাজছে বামুন বাড়ীর মেঘী। অর্জুনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, "লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিয়েছে?" তারপর একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আলিকেও নাকি ধরে নিয়ে গেছে?"

গলা জলে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় অর্জুন, "আলিভাইকে মেরে আর রাখে নি।"

লক্ষ্য করে অর্জুন, তার কথায় হঠাৎ মুখটা কেমন কালো হ'য়ে উঠলো মেঘীদির। মুখ নীচু করে বাসন মাজছে সে। মনে হ'চ্ছে, চোখ দু'টো যেন ভিজে উঠেছে তার। কি হ'ল, ঠিক বুঝতে পারে না অর্জুন। একটু অবাক হ'য়ে তাকায়। কিছু না বুঝে আবার বলে, "আজ বিকেলে একটা সভা হ'বে মনসাতলায়।" মেঘী বাসনের পাঁজা নিয়ে উঠতে উঠতে ফিস ফিস করে বলে, "লক্ষ্মীকে বলিস সভায় যাবার সময় আমাকে যেন ডেকে নিয়ে যায়।"

সারাটা দিন চলে গেল। পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছেন সূর্যদেব। তখনও লক্ষণরা ফিরে এল না। সভায় চলেছে মালোপাড়ার মেয়েরা। মঙ্গলাকে ডেকে বলে, "সভায় যাবে না লক্ষ্মীর মা ?"

সুদাম ঘর থেকে উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই যাবে। তোরা যা, ওরা এখুনি আসছে।"

মঙ্গলাকে ডেকে বলে, "ঘরের কাজ-কর্ম এখন থাক। তোমরা সভায় চলে যাও।"

লক্ষ্মী পথে গিয়ে মাকে বলে, "মেঘীদিকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছে।"

অমূল্যদের বাড়ীর উপর দিয়ে ঘুরে যায় মঙ্গলা বামুন বাড়ীর দিকে। উঠোনের কোণায় একটা কাঠের উনুনে ধান সেদ্ধ বসিয়েছে অমূল্যর শাশুড়ী। লক্ষ্মীকে ডেকে বলে, "সভায় চলেছিস। একটু দাঁড়া, আমিও যাব।" উনুনের জ্বালটা টান দিয়ে নিবিয়ে, ধানের পাতিলটা নামিয়ে রাখে। ঘর থেকে একটা পান মুখে দিয়ে এসে বলে, "চল এবার।"

দীঘির পাড় থেকেই মেঘীকে ডাক দেয় লক্ষ্মী।

মেঘী তার মাকে বলে আসে, মনসা বাড়ী যাচ্ছে। কি দুঃসাহস। মঙ্গলার কেমন ভয় ভয় করে। কালাঠারাণ যদি টের পায় একবার মেয়ের সভায় যাবার কথা, তবে আর রক্ষা রাখবে না মেয়ের।

কিন্তু আপত্তিই বা কেন এত সভায় আসতে। বামুন ভদ্রলোক হ'লেই কি, ভাত আছে কি তাদের ঘরে? সুখ আছে সংসারে?

মঙ্গলা বার বার মেঘীর মুখের দিকে তাকায়। মুখখানা যেন বড় শুকনো শুকনো। একটু নরম সুরে জিজ্ঞেস করে, "আজ বুঝি একাদশী গেছে?"

এই সামান্য একটু স্নেহের সুরেই চোখ ছলছল করে ওঠে মেঘীর। ম্লান সুরে উত্তর দেয়, "না একাদশী না। এমনই শরীরটা ভাল লাগছিল না তাই ভাত খাই নি।"

দাসুর মা বলে, "আর তার উপর মায়ের যা গঞ্জনা। কে বলবে, যে গর্ভধারিণী মা।"

মনসাতলায় এসে সবাই পৌঁছায়। মাঠটা ভরে গেছে। দড়ি দিয়ে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র আসন। মঙ্গলা মেয়েদের মধ্যে এসে বসে। বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ হ'য়ে গেছে। মঙ্গলা তাকিয়ে দেখে, সুদামও উঠে এসেছে লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। সামনে এগিয়ে এসে বলে, "না এসে থাকতে পারলাম না।"

কৃষ্ণনট্ট বক্তৃতা দিচ্ছে।

বক্তৃতা শেষ হয় না। পুলিস এসে সভা ভেঙে দিয়ে কৃষ্ণনট্টকে গ্রেপ্তার করে। তাজ্জব বনে যায় মঙ্গলা,—মুখের কথাটা পর্যন্ত বে-আইনী?

সরকার থেকে আবার ঢোল দেয়। একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারী হ'ল। সভা বা বৈঠক করা বে-আইনী। একসঙ্গে চারজনের বেশী রাস্তা দিয়ে চললে গ্রেপ্তার করা হ'বে।

এর উপর আবার পিটুনী ট্যাক্স বসায়। পিটুনী পুলিসদের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

ঘরে ঘরে গুমরে ওঠে সবাই, "আমাদেরই পিটাবে, তার জন্য আমরাই আবার ট্যাক্স দেব। যেন মামার বাড়ীর আব্দার।"

রাত্রিবেলা ঘরে ঘরে গিয়ে আলোচনা করে প্রিয়তোষ বাবু। আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হ'বে পরদিন থেকে।

অন্ধকার ভোরে কাঠের পোল থেকে বিষাণ বেজে ওঠে। সবাই এসে জড়ো হয় পোলের ধারে। খালের ওপারে পুলিস পণ্টন জমা হ'য়েছে। মহকুমা থেকে হাকিম সাহেব, পুলিস সাহেব এসেছে। সঙ্গে গুর্খা পণ্টন।

চারদিকে ধু ধু করছে লাঙ্গল চষা মাটি। প্রতীক্ষামৌন, নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ জমির বুকে কেঁপে ওঠে চাষী কণ্ঠের উদাত্ত ধ্বনি। "বন্দে মাতরম্।"

"বন্দে মাতরম্।"

স্বেচ্ছাসেবকরা তেরঙ্গা নিশান নিয়ে হেঁটে চলে সড়ক দিয়ে চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে। পর পর তিন সারির স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। আবার শঙ্খধ্বনিতে মুখর হ'য়ে ওঠে বন-বনানী। ধ্বনি দেয় কংগ্রেস সেবকরা। ধ্বনি দেয় কিশোর অর্জুন। আর তার সাথীরা। আ-দিগন্ত ক্ষেতের বুকে ছড়িয়ে পড়ে তরুণ কণ্ঠের সে গম্ভীর আওয়াজ। প্রতিজ্ঞায় কঠিন মুহূর্ত্ত। দারোগা পুলিস থানার দিকে হেঁটে চলে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে। ক্ষেতের আড়ালে মিলিয়ে যায় তাদের শেষ দেখাটুকু। মেয়েরা, মায়েরা ঘরের পেছনে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির শেষ রেশটুকু লেগে রয়েছে তাদের আকুল দৃষ্টিতে।

সাতদিন চলে যায়। কৃষ্ণপক্ষ ঘুরে শুক্লপক্ষ আসে। ক্ষেতের কাজ-কর্ম অচল। বীজ বোনার সময় এসে পড়ে। চিন্তা দেখা দেয় জমিদারের কর্মচারী মহলে। প্রিয়তোষ বাবুকে ডেকে পাঠায় পাঁচানীর সেরেস্তায়। আলিদের ছেড়ে দিয়েছে। তাদেরও ডাকা হয় নাটমন্দিরে। জমিদারবাবু নিজে বসে আপ্যায়ন করে কংগ্রেসীবাবুকে। বিনম্র স্বরে বলে, "প্রজারা হ'ল আমার সন্তানের সামিল। তাদের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্বন্ধ। আপনারা স্বদেশী করেন। দেশমাতার বন্দনা। কিন্তু দেশের মাটি—সে ত আমাদেরও মা। তাই আপনাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধের সম্বন্ধ নয়। সামান্ত ব্যাপার নিয়ে অনর্থক এত হাঙ্গামার সৃষ্টি হ'য়েছে। আমি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ত কিছুদিন

পশ্চিমে ছিলাম। এসে শুনি, এই কাণ্ড। আমি এখানে থাকলে কখনই এতদূর গড়াতে দিতাম না। রাস্তাটা সমান করে দিলেই যদি ওদের অভিযোগ মিটে যায়, তবে নিশ্চয়ই তা সমান করা হবে। বাঁশের সাঁকো কদিন আর টিকবে? কাঠের পোলই একটা করে দেবো।

লক্ষ্মণদের দিকে তাকিয়ে বলে, "তবে, অর্দ্ধেক খরচ তোমরা দাও। অর্দ্ধেক আমরা দিই।"

সরকার মশাই চাকরকে দিয়ে চা ও জলখাবার নিয়ে আসে প্রিয়তোষবাবুর জন্য বাড়ীর মধ্য থেকে।

আলি হঠাৎ উঠে চলে যায়। লক্ষ্মণকে ফিসফিস করে বলে যায়, "আমার কেমন সুবিধার মনে হ'চ্ছে না'।" জমিদারবাবু খাবারের রেকাবটা প্রিয়তোষ-বাবুর দিকে একটু ঠেলে দিয়ে সহাস্যে বলে, "আমার নূতন মায়ের হাতের মিষ্টি।"

প্রসন্ন মনে বেরিয়ে আসে প্রিয়তোষবাবু জমিদার বাড়ী থেকে। কংগ্রেস আশ্রমের ঘরের মেঝেটা বাঁধিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জমিদারবাবু। সেদিনই বৃদ্ধ চাষীদের সঙ্গে দেখা করে। বীজ বোনারও সময় এসে পড়েছে—বুড়োরা সবাই গিলে পরামর্শ করে পথকর দিতে রাজী হয়। "রাস্তা যখন সমান করে দেবে, তখন পথকর দিতে আপত্তি করা উচিত নয় তোমাদের।" সুদামের উঠোনে বসেই আলোচনা করে আলির চাচা আমিনুদ্দি।

কিন্তু আলি, লক্ষ্মণ, কুঞ্জ এরা খুশি হ'তে পারে না এ আপোষে। পুলিস এসে চাষীদের ধান-চাল নষ্ট করে যে ক্ষতি করে গেল, সে ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত দিতে রাজী হন নি।

দীনবন্ধু জমিদার বাড়ীর সেরেস্তায় কাজটা পেয়েছে। কাজ পেতে পেতেই কি এক কাজে জমিদারবাবুর সঙ্গে কলকাতা যেতে হ'বে। সুবালা স্বামীকে বলে, "এই সঙ্গে দেবকীকেও নিয়ে যাও। ওর বড় মামার কাছেই উঠবে। একটা সম্বন্ধের কথা লিখেছিলেন বড়দা—পাত্র পক্ষ মেয়ে দেখতে চায়।"

কলকাতা দেখার আনন্দে ভরপুর দেবকী। সুবালা বাক্স থেকে তার বিয়ের জামদানী শাড়িখানা বের করে দেয়। একখানা শান্তিপুরে ডুরেও বের করে আনে। বার বার হুঁশিয়ার করে দেয় মেয়েকে, "দেখিস সাবধানে পরিস শাড়ী দু'খানা। ছিঁড়ে-টিড়ে আনিস না।" পুরানো পুচপুচে শাড়ী—ভাঁজের উপর রয়েছে। তবু পাঁচজনের মধ্যে যাচ্ছে মেয়ে, দু'খানা ভাল শাড়ী ছাড়া পাঠায়ই বা কি করে? স্বামীর সংসারের এমন অবস্থা হ'লে হয় কি, বাপের বাড়ীর অবস্থা ত খারাপ ছিল না সুবালার। দাদারাও বড় চাকুরি করেন কলকাতায়। শুধু বংশ দেখে এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরদা।

রেল গাড়ীতে উঠে ঝলমল করে ওঠে দেবকী—কলকাতা দেখার আনন্দে। কিন্তু ভোরে ঘোড়ার গাড়ী থেকে নেমে মামার বাড়ীতে পা দিয়েই সমস্ত আনন্দ তার উড়ে যায়। চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায় মামাতো বোনেরা, সবাই যেন চোখ দিয়ে গিলে ফেলবে তাকে।

মামা মামীকে প্রণাম করে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে দেবকী। এই প্রথম মামার বাড়ীতে আসা। কাউকেই চেনে না। মামা ঠাট্টা করে বলে, "আরে আমরা তোর শ্বশুর বাড়ীর কেউ নই। এখনই কনে দেখতে আসে নি কেউ। অমন মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

মামাত বোনদের মধ্যে বিবাহিত যেটি, সে উত্তর দেয়, "এখন থেকেই প্র্যাক্‌টিস করছে।"

একসঙ্গে এতগুলো শহুরে চোখ তাকে দেখছে চারদিক থেকে—ভিতরে ভিতরে ঘেমে ওঠে দেবকী। যেন কঠিন একটা অঙ্ক দিয়েছে পাঠশালার মাষ্টারমশাই—এমনি করুণ হ'য়ে উঠেছে ওর মুখ চোখ।

একটি মেয়ে একটু যেন মায়াবতী। সে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ওকে পাশের ঘরে। "এতদূর থেকে এসেছে আগে চান-টান করুক। তা' না সবশুদ্ধ তোরা ছেঁকে ধরেছিস ওকে।" পাশের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তোমার নাম দেবকী না? কি পড় তুমি—কোন ক্লাসে পড়?"

"দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেছি।"

কথা আর শেষ হয় না। আবার সব কয়টি বোনে ফিক ফিক করে হাসে। এক বোন ব'লে ওঠে, "ও মা, এতবড় মেয়ে, মাত্র দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেছে।" সবচাইতে ছটফটে ছোটটি হাসি চেপে জিজ্ঞেস করে, "এক দুই গুনতে পার?"

সেই মায়াবতী মেয়েটি ধমক লাগায় সেই বোনকে, "ছিঃ নীলা ওভাবে কথা বলতে হয় না।"

দেবকীর বুক ঠেলে কান্না আসছে—এ কোথায় রেখে গেল তার বাবা। সন্ধ্যের আগে নাকি তাঁর সাথে দেখা হবে না।

যে মেয়েটি এ আক্রমণ থেকে তাকে উদ্ধার করলো, তার নাম স্বপ্না।

দেবকী সতৃষ্ণ নয়নে দেখে, তারই সমবয়সী মেয়েরা গাড়ী করে স্কুলে যায়, মোটা মোটা বই পড়ে! আর সে শুধু কোন মতে বানান করে পড়তে পারে।

সেদিন বিকেলে মামাতো বোনেরা সবাই মিলে লেকে বেড়াতে যাবে। সাজ গোজ নিয়ে ব্যস্ত সবাই। দেবকী অবাক হ'য়ে চেয়ে চেয়ে দেখে, কি সুন্দর শাড়ী সব। নাম নাকি মেঘদূত শাড়ী। শাড়ীর মধ্যে মেঘ ভেসে চলেছে—তা'তে আবার উড়ন্ত পাতি হাঁস আঁকা।

শুক্লা বলে, "দেবকী তোমার শাড়ী বের কর।" দেবকী তার বাক্স থেকে মায়ের বিয়ের জামদানিখানা বের করে পরে আসে। গাঢ় বেগুনী রঙের রেশমী শাড়ী। সবকটি বোন গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখে শাড়ীখানা। নীলা অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে। "ওমা তোমার শাড়ীতে তিনটে করে পাড় কেন?"

মামীমা ভারিক্কী সুরে বুঝিয়ে দেন, "ওটাকে পাছাপাড় শাড়ী বলে। এ হ'ল সেকেলে শাড়ী। আজ-কাল এসব শাড়ী কেউ পরে না।"

মামীমার কথার সুরে ম্লান হ'য়ে যায় দেবকী। হাবুল ড্রেস করে পরে নাও শাড়ীটা, স্বপ্না বলে। শুক্লা শাড়ী পরছে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে। দেবকী মন দিয়ে দেখে নিজের শাড়ীখানা—ওদের মত করে ঘুরিয়ে পরে সামনে পুরুষদের মত খানিকটা কোঁচা দিয়ে। হাবুল ড্রেস!

আবার একসঙ্গে সবাই খিল খিল হাসির তুবড়ি ছোটে। বড় আয়নাটাতে নিজেকে দেখে দেবকীও হেসে গড়িয়ে পড়ে বোনদের সঙ্গে। স্বপ্না অতি কষ্টে হাসি চেপে বলে, "এস দেবকা, আমি তোমাকে শাড়ী পরিয়ে দিচ্ছি।" রাস্তায় বেরিয়ে মনে মনে প্রমাদ গণে দেবকী। কেমন করে জড়িয়ে জড়িয়ে পরিয়ে দিল শাড়ী, পা ফেলতেই যে প্যায়ে আটকে যাচ্ছে শাড়ীটা। তার উপর তার জুতো নেই বলে এক বোনের একজোড়া জুতো পরিয়ে দিয়েছে— খড়মের চাইতেও উঁচু তার গোড়ালি।

নীলা তাড়া দেয়, "তাড়াতাড়ি হাঁট দেবকী। এত আস্তে হাঁটলে যে লেকে যেতেই সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে।"

তাড়াতাড়ি যে কেন হাঁটছে না দেবকী, তা' শুধু সেই জানে। তবু নীলার তাড়াতে একবার বড় করে পা ফেলতেই কাপড়ে টান লেগে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় রাস্তার মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে হাসির ধুম পড়ে যায়। কেউ মুখে রুমাল দিয়ে, কেউ খিল খিল করে, কেউ মুখ চেপে হাসে। দেবকীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে—শাড়ীটা ফেঁসে গেছে। মায়ের বিয়ের শাড়ী। তবু তখনকার মত গা ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে আবার হাঁটে বোনেদের সঙ্গে। প্রতিবার পা ফেলতেই মনে হয়, এই বুঝি পড়ে যায়। হায় হাবুল ড্রেস, কি বিপদেই না ফেল্ল তাকে। আবার খড়মের মত জুতোটাও আরেক ফ্যাসাদ।

এত হয়রানি হ'য়ে যা দেখতে এল, তা' দেখে একেবারেই দমে যায় দেবকী। এরই নাম লেক। এ ত মনসাডাঙ্গার খাল।

দেশে ফিরে এলে প্রথমই মুখ ভার হয় সুবালার। দীনবন্ধুর কাছে শোনে, বড়দাদা বলেছেন—লেখাপড়া জানা মেয়ে চায় পাত্রপক্ষ। অন্ততঃ ক্লাস সেভেন এইটেও যদি পড়তো—বলতে পারতো—ম্যাট্রিক দেবে। তাই মেয়ে মোটে দেখানোই হয়নি।

সে কথা আগে লিখলেই পারতেন বড়দা। অনর্থক এতগুলো টাকা গেল। তার উপর জামদানি শাড়িখানা ছিঁড়ে এনেছে দেখে আগুন হ'য়ে

ওঠে সুবালা। "এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে কি করে যে শাড়ি ছেঁড়ে ভেবে পাই না। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত গিলতে জানে শুধু ধাড়ি মেয়ে। এ মেয়ে যে কত ঝাঁটার বাড়ী খাবে শাশুড়ীর হাতে তার ঠিক নেই।"

মুখ বুজে শোনে দেবকী মায়ের বকুনি। মাকে ত আর হাবুল ড্রেসের করুণ কাহিনী শোনান যায় না। তাই দুপুরে যেই সুবালা ঘুমিয়েছে, দেবকী মামাত বোনদের মত করে শাড়িখানা পরে বাবার খড়মটা পায়ে দিয়ে বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর বৌদিকে দেখাতে চলে।

কয়টা ক্ষেত পেরিয়েই জগাই বাঁড়ুজ্যের বাড়ী। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে খড়ম পায়ে আঁচল উড়িয়ে কৌতুকে উড়ে চলে দেবকী। নিঝুম দুপুর বেলায় গ্রামের বৌদিদের সঙ্গে আম-জাম-তেঁতুল খাওয়া মেয়ে দেবকী কলকাতার নাগরিক জীবনের কাহিনী রঙিয়ে রসিয়ে না বলা পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না।

জগদীশ কাকার বাড়ী গিয়ে প্রথমে উঁকি মেরে দেখে খুড়ীমা ঘুমিয়েছেন কিনা। তারপর বৌদিকে ডেকে নেয় রান্নাঘরে। বৌদি তাকে এমন বিচিত্র বেশে দেখে হেসে প্রশ্ন করে, "কলকাতা থেকে শাড়ি পরা শিখে এলে বুঝি, ঠাকুরঝি। আবার একটা খড়ম পায়ে কেন?"

"শাড়ি পরা না—হাবুল ড্রেস গো, হাবুল ড্রেস। আর এটা হাই হিল সু।" বলে রান্নাঘরের মধ্যে খট খট করে খড়মের শব্দ করে হাত ঝুলিয়ে বুক টান করে হাঁটে দেবকী।

"এসো বৌদি তোমাকেও পরিয়ে দিই।"

"আমার আর হাবুল ড্রেসে দরকার নেই। তুমিই শেখ ভাল করে, কলকাতায় যখন তোমার শ্বশুর থাকে।"

মনে মনে ভাবে দেবকী, ভাগ্যিস সম্বন্ধটা ভেঙে গেছে। না হ'লে অমন জড়িয়ে জড়িয়ে শাড়ি পরে বাসি বিয়ের দিন কলাগাছ তলায় সাত পাক ঘোরবার সময়ই সাতটি আছাড় খেতো সে।

"সেখানে কেউ পায়ে আলতা পরে না। আলতা পরে ঠোঁটে।" দেবকীর

কথা শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বৌদি, "কি যে বলিস, আলতা পরে ঠোঁটে!"

বাড়ী আসার পথে মফির মার সঙ্গে দেখা হয় লক্ষ্মণের ক্ষেতের ধারে। মটর ক্ষেতে ছড়া ধরেছে। দেবকী ডেকে বলে, "মফির মা, আমাকে দু'টো দাওনা।" মফির মা কয়টা ছড়া এনে দেয় হাতে। বাড়ী এসে কেতকী নালিশ করে মাকে, "মা, দিদি মফির মাকে ছুঁয়ে এসেছে।"

সুবালা আগুন হ'য়ে ওঠে, "দিন দিন ধাড়ি হ'চ্ছে মেয়ে আর আক্কেল বাড়ছে। মফির মাকে ছুঁয়ে এলি এই ভর সন্ধ্যায়। এখন যা নদী থেকে ডুব দিয়ে আয়। এই মেয়ে নিয়ে আমার মরণ। একদিন আচ্ছা ঠেঙ্গানি দিয়ে ওর পাড়ায় পাড়ায় নেচে বেড়ান বের করবো।"

একবার বকতে আরম্ভ করলে আর সহজে থামবার আশা নেই। দেবকী তাড়াতাড়ি নদীতে চলে যায়। কেতকী যায় সঙ্গে, সত্যি ডুব দেয় কিনা, দেখতে। এই মাঘ মাসের পড়ন্ত বেলায় ডুব দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী আসে দেবকী। দীনবন্ধু হাট থেকে ফিরে এসে দেখে, দেবকী ভিজে কাপড়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। "এই অবেলায় স্নান করে এলি। অসুখ করবে না।"

"ডুব দেবে না? মফির মাকে ছুঁয়ে এসেছে।"

"তা একটু তুলসীপাতার জল ছিটিয়ে দিলেই ত হ'ত। আর ছুঁয়েছে ত কি হ'য়েছে—সেও ত একটা মানুষই।"

"একেবারে ব্রেহ্ম হ'য়ে উঠেছে সব।" বিকৃত সুরে বলে সুবালা। উত্তর দেওয়া অনর্থক বুঝে দীনবন্ধু মেয়েকেই ডেকে বলে, "যা কিছু শুকনো পাতা জ্বালিয়ে নে উঠোনে।"

পশ্চিমের ঘরের দুয়ারের সামনে বসে শিকদার বাড়ীর সুখদাপিসী কুন্তীর জন্য মাঘমণ্ডলের লাউল গড়াচ্ছে পুকুরের আঁটালো মাটি দিয়ে। সূর্যের ছেলে বসন্ত এই লাউল। মূলোফুল, গাঁদাফুল, অতশীফুল দিয়ে তার রূপসজ্জা হ'চ্ছে—কুন্তী পাশে বসে মন দিয়ে দেখছে। দেবকী একটু দেখে বলে, "যা কয়টা

শীষফুল নিয়ে আয় লাউলের জন্য। সুন্দর দেখাবে।” উঠোনের হাওলার বেড়ার গায়ে সীম গাছ লতিয়ে উঠেছে। বেগুনী রঙের ছোট ছোট ফুল। কুন্তী কয়টা ফুল তুলে এনে দেয় সুখী পিসীর হাতে। কিশোরী কন্যার কত স্বপ্ন কুহেলী, কত কামনার প্রতিনিধি এই চন্দ্র সূর্য তারারা। দেবকী গুন গুন করে সুর টানে আগুন পোহাতে পোহাতে—

“আসবেন সূর্য বসবেন খাটে
পা মেলাইবেন সোনার পাটে।”

উঠোনের মাঝখানে ব্রতের আঁক দিয়ে দিয়েছে সুখদা। চালের গুঁড়ো, কয়লার গুঁড়ো, ইটের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো মিলিয়ে নানা রঙের বিচিত্র ফুল লতার মাঝে চন্দ্র সূর্যের প্রতিকৃতি।

কেতকীর তারার ব্রত সাঙ্গ হ’য়েছে গত বছর। কুন্তী আরম্ভ করেছে এ বছর। “ষোল ষোল তারা তোমরা হইও সাক্ষী ঘৃত দিয়া করি আমরা পঞ্চগ্রাসী।”

দুপুরবেলা সুবালা ঘুমিয়ে পড়লে রান্না ঘরে বসে চুপি চুপি তেঁতুল মাখে দেবকী বৌদির জন্য। সাথী এসে হাত পাতে। ভাইকে একটু দিয়ে বলে, “মাকে বলিস না, আমি একটু বৌদিকে তেঁতুল কাসুন্দী দিয়ে আসি।”

আঁচলের তলায় কলাপাতাটা লুকিয়ে নিয়ে ক্ষেতের ধার দিয়ে হাঁটে দেবকী। কিন্তু বাঁড়ুজ্যে বাড়ী এসে দেখে, সব ঘরে শিকল দেওয়া। শুধু দক্ষিণের ঘরে বসে জগদীশ কাকা কি একটা খুট খুট করছে। দেবকীকে দেখে বলে, “দেবী নাকি লো? ওরা ত সব মনসা বাড়ী গেছে।” বলে একটু যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখে দেবকীকে। “তুই এসেছিস যখন, আমাকে এক খিলি পান দিয়ে যা’ত বড় ঘর থেকে।”

দেবকী বড় ঘরের দুয়ার খুলে পানের বাটা থেকে পান নিয়ে আসে। পানের খিলিটা জগদীশের হাতে দিতেই শক্ত করে ধরে ফেলে সে দেবকীর হাতটা। এই অদ্ভুত আচরণে অবাক হ’য়ে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে দেবকী, জগদীশ কাকার মুখটা কেমন মাতালের মত হ’য়ে উঠেছে।

কেমন একটা জ্বর জ্বর ভাব চোখে মুখে—অথচ কেমন মিটমিট করে হাসছে। অপরিণত মন দিয়েও একটা শয়তানী উদ্দেশ্যের আভাস পায় দেবকী। হাতটা ছাড়াবার জন্য একটু টান দিয়ে বলে, "হাতটা ছাড়ুন না, লাগছে যে।"

শিকার হাতছাড়া করার মত লোক নয় জগাই। আরও শক্ত করে ধরে ফিসফিস কি বলে। কথাটা শুনে আঁৎকে ওঠে দেবকী। কি লজ্জার কথা। ভয়ে আর লজ্জায় মরিয়া হ'য়ে টান দেয় হাতে। তবু ছাড়াতে পারে না। অনুপায় হ'য়ে জোরে এক কামড় বসিয়ে দেয় জগদীশের লোমশ হাতের মাঝে। আচমকা কামড়ে হাতটা ফসকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এক দৌড়ে ছুট দেয় দেবকী। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে দৌড়তে থাকে। পেছনে আর তাকাবার সাহস হয় না। ভয় হয়, বুঝি পেছনে তাকালেই দেখবে শয়তানটাকে।

উধ্বর্শ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ায় যখন, মনে হয় ঢেঁকীর পাড় পড়ছে বুকের ভিতরে। বড় বড় টেনে টেনে নিশ্বাস ফেলে দম নেয় খানিকক্ষণ।

উঃ এত পাজী হয় কোন মানুষ ?

জগাই বাঁড়ুজ্যের লোমশ হাতের চাপটা তখনও যেন লেগে রয়েছে তার হাতে। কি ভেবে ঘাটে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসে দেবকী।

সুবালা বকুনি লাগায়। "এই অবেলায় ডুব দিয়ে এলি—সারারাত চুল ভেজা থাকবে।"

মাকে বানিয়ে বলে, "কুকুরের বমি পাড়িয়ে এসেছি। তাই ডুব দিয়ে এলাম।"

আর কোনও দিন একা বের হ'তে সাহস হয় না দেবকীর। দুপুরবেলা নিঝুম নিস্তব্ধ ক্ষেতটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন একটা ভয়ে ছম ছম করে। এত খারাপও যে হয় মানুষ, জানতো না সে। বিড়াল না কুকুর না, একটা মানুষের মনেও এত পাপ। এই পাপী মানুষই হয়তো নরকে যায়।

নরকে যাবে তাহ'লে জগাই বাঁড়ুজ্যেও? যমদূতরা আগুনের ছেঁকা দেবে তার গায়ে।

একটা কেঁচো চলেছে ঘরের পিঁড়া দিয়ে। হঠাৎ কি ভেবে কেঁচোটা ধরে বঁড়শি এনে গাঁথে। ছিপ নিয়ে বসেই ভুলে যায় দেবকী—পাপী মানুষের নরক যাত্রার কথা। তন্ময় হ'য়ে মাছের ফাৎনা নড়া দেখে। ছোট ছোট কয়েকটা বাঁশপাতা মাছ ওঠে।

"বাবাকে ভেজে দিতে পারবো মাছ কটা" খুশি মনে ভাবে দেবকী। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গর্জন কানে আসে। "এই মেয়ে নিয়ে কি মরণই যে হ'য়েছে আমার।" একটা জ্বালানী কাঠ নিয়ে এসে পিছন থেকে পিঠের উপর বাড়ি মারে সুবালা, "আবার বঁড়শি নিয়ে বসেছিস ছোটলোকদের মেয়ের মত বিয়ের যোগ্যি মেয়ে—এখনও লজ্জা সরমের বালাই নেই।"

মাছগুলো সব ছুঁড়ে ফেলে দেয় সুবালা।

কুন্তী চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, "দিদিকে আর মেরো না। ওমা পায়ে পড়ি মা। আর মেরো না।"

দেবকী বঁড়শি রেখে ঘরের পিছনে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদে দুঃখে অপমানে। নদীর পাড় দিয়ে পিওন আসছে, তাদেরই বাড়ী তাদের উঠোনে এসে একখানা চিঠি দেয় সাথীর হাতে। "দেবকী দাস।" দেবকী চোখ মুছে ছুটে আসে উঠোনে। সুবালাও বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, "বড়দার চিঠি নাকি?"

"না সদর থেকে এসেছে। মেয়ে স্কুলের ঈষানী দেবী লিখেছেন। দাঁড়াও আগে পড়তে দাও চিঠিখানা।" চিঠিখানা পড়তে পড়তে উত্তর দেয় দীনবন্ধু। ঈষানী দেবী দেবকীকে জানিয়েছেন, তাঁর স্কুলে বিনা বেতনে পড়তে পারবে সে। আর বোর্ডিংএ থাকাও ফ্রি।

দেবকীর মনে হয়, যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে সে। বোঝে, এ পার্থদারই ব্যবস্থা। পার্থর মুখখানা চোখে ভাসে। কি সুন্দর দেখতে হয়েছে পার্থদা। তার কথাবার্তা, চলাফেরা সব কিছুই সুন্দর। তার অপলক কুমারী

চোখের তারায় এক উন্নত ললাট ঋজু স্মৃতির ছায়া পড়ে। ঠিক এক বছর আগের একটি শীতের দিন। একটি হিমেল রাত্রির স্পর্শ। "পার্থদার কি এখনও মনে আছে তাকে?" কি কোমল এক অনুভূতির শিহরণ।

…বিকেলের কাজ আরম্ভ করে দেবকী। ঘর ঝাঁট দিয়ে হারিকেনের চিমনিটা মেজে আনে।

একটা হালকা খুশির সুর বইছে মনে। বাতিতে তেল ভরে ধুপচিটা ঠিক করে রাখে।

রাত্রিতে দীনবন্ধুকে পরামর্শ দেয় সুবালা, "বিয়ের যোগ্যি মেয়ে ও, চোদ্দ বছরে পা দিয়েছে—ওকে আর এখন পড়তে পাঠিয়ে লাভ কি। তার চাইতে কেতকীকে পাঠাও।"

সে ব্যবস্থাই ঠিক হয়। ঈষানী দেবীকে চিঠির উত্তর লেখে দীনবন্ধু, তার দ্বিতীয় কন্যাকে পড়তে পাঠাতে চায়—বড়টিকে না পাঠিয়ে।

যথা সময়ে চিঠির উত্তর আসে। কেতকীরই পড়ার ব্যবস্থা হয়। রওয়ানা হবার দিন ঠিক হ'য়ে যায়। কিন্তু দেবী কান্নাকাটি শুরু করে। সারাদিন ধরে কাঁদে। কেতকীর সঙ্গে সেও পড়তে যেতে চায়। দীনবন্ধুর মনটা কেমন ভিজে আসে মেয়ের কান্নায়। দেবকীকে বুঝিয়ে বলে, "আমার খুড়োমশাই থাকেন সেখানে। দেখি, তার কাছে একখানা চিঠি লিখে দেখি, তার বাড়ীতে থেকে পড়া সম্ভব কিনা। স্কুলের মাইনেটা না হয় আমিই চালাব যে করে হোক।"

অবশেষে দুজনকেই পড়তে পাঠানো ঠিক হয়।

তালপুকুর থেকে কাঞ্চনপুর পাঁচ মাইলের উপরে নৌকোয় যেতে। গরুর গাড়ীতে যেতে কম সময় লাগে, তবু নৌকোয় যাওয়াই ঠিক করে। গঞ্জের হাট থেকে কিছু খেজুর-গুড় কিনে নিয়ে যাবে খুড়োমশাইর জন্য। দুই মেয়েকে নিয়ে নৌকো-ঘাটায় এসে নৌকোয় ওঠে দীনবন্ধু। সাথীও যায় সঙ্গে। সে আবার বাবার সঙ্গে ফিরে আসবে।

শীতের নদী। দু'ধারে আদিগন্ত রঙের আবেশ। ক্ষেতের পর ক্ষেত। উপরে সুনীল আকাশ।

একমনে বৈঠা কেটে চলেছে মাঝি। তিন ভাই বোন বাইরে বসে। মাঝি একবার আপত্তি করে, "নাওয়ের মাথা ভার করবেন না।"

দীনবন্ধু ছইয়ের ভিতর থেকে ডাক দেয়, "এই তোরা ছইয়ের ভিতরে এসে বোস।"

কলাই ক্ষেত, ধান ক্ষেত, সরষে ক্ষেত। মাঝে মাঝে টিনের ঘর কলাগাছের ঝাড়।

একটা ছেঁড়া পাটি, বালিস, কলসী পড়ে রয়েছে নদীর ধারে। কেউ মারা গেছে শীগ্‌গীর।

সাথী করুণ চোখে দেখে মৃত মানুষের পরিত্যক্ত শয্যাগুলো।

তাঁতীপাড়ার ধার দিয়ে নৌকো চলেছে। মাকু চালানর শব্দ। দীনবন্ধু পারের দিকে লক্ষ্য করে বলে, "এই মসজিদ ছিল কোথায়, নদী থেকে কতদূরে। আর এখন নদীর বুকেই ছায়া পড়েছে গম্বুজের।"

একটা নৌকো আসছে পেছন থেকে। সাথী চেঁচিয়ে ওঠে, "ঐ নৌকোটা আমাদের সঙ্গে 'বাইচ' দিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাও, মাঝি।"

বলতে বলতেই তাদের নৌকো ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় পেছনের নৌকোটা। "ইস, ছাড়িয়ে গেল আমাদের।"

মাঝি আরও জোরে হাত চালায়, "কতদূর আর যাইবো ছাড়াইয়া। এই হাতে ষ্টীমারের সঙ্গেও পাল্লা দিছি।"

সাথী অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে, "সত্যি? ষ্টীমারের সঙ্গে বাইচ দিয়েছিলেন আপনি?"

দীনবন্ধু হাসে ছেলের অজ্ঞতায়। মাঝিকে বলে, "গোপাল ভাঁড়ের গল্প জান নাকি? কও দেখি একখান।"

মাঝি আরম্ভ করে।

গঞ্জের হাটে এসে পড়ে। একটা অশ্বত্থ গাছের শিকড়ের সঙ্গে নৌকোটা বেঁধে পাড়ে নেমে পড়ে মাঝি। দেবকী কেতকী আবদার ধরে, তারাও যাবে।

"এখানকার কালীখোলা দেখিনি আমরা।"

অনিচ্ছায় মত দেয় দীনবন্ধু। "চল তবে।" এ অঞ্চলের বিখ্যাত হাট এই গঞ্জের হাট। গরু বিক্রী হ'চ্ছে গরু-হাটে। "কত দিয়ে কিনলে গরুটা ?" জিজ্ঞেস করে দীনবন্ধু।

"তিরিশ টাকার কমে কিছুতেই দিল না। দেখেন ত ঠকলাম নাকি ? বল্ল ত পাঁচ সের দুধ দেয়।"

"না ঠকনি।" গরুটার সারা গায়ে চোখ বুলিয়ে উত্তর দেয় দীনবন্ধু।

কালী মন্দিরে এসে মেয়েদের বলে, "তোরা এখানে বোস। আমি গুড় কিনে আনি।" মাঝিকে নিয়ে হাটের মধ্যে চলে যায়। রঙ বেরঙের সিরাপ নিয়ে বসেছে একটা ছোকরা। "খাবি নাকি লেমেনেট।"

সাথী মনের খুশি চাপতে পারে না লেমেনেড্ খাবার কথায়। একটা লেমেনেড্ কিনে অর্দ্ধেক ছেলেকে দিয়ে বাকীটা নিজে খায়। "চল, দেবী, কেতীর জন্য নারকেলী বিস্কুট কিনে নিয়ে যাই।"

গুড় আর বিস্কুট কিনে নৌকোয় ফেরে দীনবন্ধু।

মাঝি সাথীর ধূলোমাখা পায়ের দিকে লক্ষ্য করে বলে, "পাটা ধুয়ে উঠুন খোকাবাবু।" নৌকোর পাটাতনগুলো খুলে জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নিচ্ছে মাঝি। সাথী অবাক হ'য়ে দেখে, নৌকোর পাটাতনের তলায় মাঝির রান্নার সরঞ্জাম। মাটির হাঁড়ি, মাটির সানকি উনুন। ছইয়ের একধারে মাঝির বিছানা ঝুলছে— বিছানার ধারে একটা কুপি বাঁশের নলের সঙ্গে ঝুলান। কুপিটা বের করে তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা করে মাঝি। দীনবন্ধুও একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে, "বাতাস ছাড়লো, এবার পালটা টানিয়ে নাও। সন্ধ্যার আগে পৌছাতে পারবা ত' ?"

সন্ধ্যার আগেই কাঞ্চনপুরে ওরা পৌছায়। দূরে নদীর ঘাটে জেটি দেখা

যাচ্ছে। বড় বড় পাটের গুদাম। পাট বোঝাই মস্ত মস্ত নৌকো। উনুন জ্বলছে পাটাতনের উপর। রাত্রির রান্না বসিয়েছে উত্তর পারের মাঝিরা। ডাল সম্বরার রসুন পেঁয়াজের গন্ধ।

দীনবন্ধু বলে, "কামার বাড়ীর খালে কি জল আছে? তার চাইতে হাইস্কুলের কাছেই নৌকো ভিড়াও। ঐটুকু হেঁটেই যাই।"

পাড়ে নেমে দেবকী, কেতকী শাড়ীটা একটু ঠিক করে নেয়। আকাশী রঙের আর পেঁয়াজী রঙের শাড়ী পরেছে দু' বোনে। বড় সুন্দর মানিয়েছে শাড়ীর রঙে—দীনবন্ধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মেয়েদের।

একটা ভাঙা মন্দিরের গা ফুঁড়ে বিরাট অশ্বত্থ গাছ বেরিয়েছে। দীনবন্ধু যেতে যেতে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, "ঐ যে পুকুরের ওপারে বালিকা বিদ্যালয়।" টিন দিয়ে ঘেরা কয়টা টিনের ঘর। সাইন বোর্ডে স্কুলের নাম। আনন্দে বড় বড় হ'য়ে ওঠে চোখ দেবকীর,—এই স্কুলে পড়বে তারা!

স্কুল থেকে দীনবন্ধুর খুড়োর বাড়ী বেশী দূরে নয়। গলার আওয়াজ পেয়ে বৃদ্ধ ঘর থেকে নেমে আসে। দেবকী কেতকী পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। দীনবন্ধু বলে, "যা আগে ঘাট থেকে পা ধুয়ে আয়।"

তিন জনেই আবার একটু ভাল করে দেখে ঠাকুরদাকে। ঠাকুরমা জীবিত নেই। আর সবাই বিদেশে থাকে। দীনবন্ধু মেয়েদের ভর্তি করে রেখে আবার পরদিনই চলে যায়। যাবার আগে ঈষানী দেবীর উপরই মেয়েদের ভার দিয়ে যায়। "আপনার উপরই ওদের সব দায়িত্ব রেখে গেলাম। বিদেশে মেয়েদের পড়তে দেওয়া এখনও চল হয় নি আমাদের দেশে-গাঁয়ে। তবু আপনার চিঠি পেয়েই সাহস করে নিয়ে এলাম ওদের।"

ঈষানী দেবী আশ্বাস দিয়ে বলেন, "কোনও চিন্তা করবেন না আপনি। ওদের পড়তে দিয়ে খুব ভাল করেছেন। সব বাবা মায়ের কাছেই ত আমাদের এই দাবী। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন বাপমা না-বুঝলে কে বুঝবে?"

দেবকী কয়দিনের মধ্যেই ঠাকুরদার সংসার গুছিয়ে নেয়। সে-ই রান্না-বান্না

করে। দু'জন মাত্র লোকের রান্না এ ত তার কাছে খেলার রান্না মনে হয়। শিক্ষয়িত্রীদেরও সুনজরে পড়ে দেবকী। সরস্বতী পূজোর সময় অতবড় ডক্কা ডেগ খিচুড়ী কি অনায়াসেই নামাল দেবকী। রান্নার দিদিমণি বলেন, "আমরা দেবকীকে দিয়ে রান্নার ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেওয়াব।"

দেবকী অবাক হয় শুনে--রান্নারও আবার পরীক্ষা! দেবকীর এ যেন এক নূতন জীবন। যেন সাপের খোলসের মত পুরানো জীবনের খোলসটা খসে যাচ্ছে মন থেকে। সেই কোলে কাঁখে ভাই বোনদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান, বেড়াবেণী বাঁধা, গোড়ালির উপর শাড়ি পরা, আপন ভোলা দেবকী আজ যেন নূতন আয়নায় মুখ দেখছে তার। সেই কারণে অকারণে অর্থহীন খুশিতে ডগমগ মুখখানার উপর আত্মতৃপ্তির নম্র মাধুরী নামছে ধীরে।

রান্নাঘরে বসে উনুনের ছাই তুলছে দেবকী, একটি ছোট ছেলে এসে আস্তে ডাকে, "দেবী দি, তোমাকে পার্থদা ডাকছে। ঐ গরুর ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সে।"

অবাক হ'য়ে যায় দেবকী—পার্থদা ডাকছে? একটু এদিক-ওদিকে তাকিয়ে, তাড়াতাড়ি যায় গরুর ঘরের পেছনে। পার্থই দাঁড়িয়ে। পার্থ দেবকীর হাতে রুমালে বাঁধা একটা ছোট পুঁটলি দিয়ে বলে নীচু গলায়, "এটা লুকিয়ে রাখবে। খুব সাবধান কেউ যেন টের না পায়। আর আমার সঙ্গেও যে দেখা হ'ল এ সংবাদও যেন কেউ না জানে।" বলেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

দেবকীর পা দুটোকে কে যেন অবশ করে দিয়েছে মনে হয় তার। কি ভৌতিক ব্যাপার। বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। তাড়াতাড়ি শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে ফেলে পুঁটলিটা। রাতে পুঁটলিটা খুলে অবাক হ'য়ে যায় সে। সাথীকে একবার তার বাবা গঞ্জের মেলা থেকে একটা খেলার পিস্তল কিনে দিয়েছিল। ঠিক তেমনি পিস্তল—দেখতে কিছু বড় আর ভারী।

শুনেছে সে, এই পিস্তল দিয়েই নাকি মানুষ মারা যায়। আর এমন সাংঘাতিক জিনিষ লুকিয়ে রাখার ভার দিয়ে গেল পার্থদা তার উপর?

নিজেকে অনেকখানি বড় মনে হয় দেবকীর। যেন সেও পার্থদাদেরই দলের একজন। তাদের দায়িত্বের অংশীদার সেও। এক রহস্যময় অনুভূতির রোমাঞ্চ।

পাগাড়ে বসে বাসন মাজছে দেবকী। চারদিকে বেতঝোপ, জঙ্গল গাছ-গাছালিতে ঢাকা ঘন অন্ধকার। পায়ের তলায় ভিজা মাটি। কচুরী পানার পচা গন্ধ। জঙ্গলের মধ্যে শুকনো পাতার উপর দিয়ে গুই সাপের নড়াচড়া শব্দ। কেমন একটা ভূতুড়ে অন্ধকার—গা ছমছম করে দিনের বেলায়ও। বাসন মাজা প্রায় শেষ হ'য়ে আসে দেবকীর। হঠাৎ চমকে ওঠে কার গলার আওয়াজে। খুব আস্তে কে যেন ডাকছে "দেবী দি।"

উপরে তাকিয়ে দেখে সেই ছেলেটি। ছেলেটি একই স্বরে আস্তে বলে, "একটু উপরে আসুন!"

দেবকী ছাই-মাখা হাতেই তাড়াতাড়ি উঠে আসে উপরে।

"পার্থদা দিয়েছেন, পড়েই পুড়িয়ে ফেলবেন।" বলে একটা ছোট্ট চিঠি হাতে দিয়েই উধাও হ'য়ে যায় ছেলেটি।

দেবকী চিঠিটা লুকিয়ে ফেলে সেমিজের মধ্যে।

বাসনের পাঁজা নিয়ে রান্নাঘরে এসে চিঠিটা বের করে। পার্থ লিখেছে মাত্র দুটি লাইন।

"আজ স্কুলের পর আশ্রমে আমার সঙ্গে দেখা করো। জিনিষটা নিয়ে আসবে সঙ্গে।"

চিঠিটা পড়ে কুপির আগুনে ধরে। বাঁকা বাঁকা অক্ষরগুলো একটি একটি করে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। অবাক হ'য়ে ভাবে দেবকী, পার্থদা তাহ'লে এখানেই আছে?

স্কুলে যাবার সময় সেমিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে যায় রুমালে বাঁধা পুঁটলিটা। সারাটা দিন ভয়ে ভয়ে কাঁটা হ'য়ে কাটায়। হঠাৎ যদি কোন মেয়ে হাত দিয়ে ফেলে তার শরীর? কি যে পড়ান হয় কিছুই মন দিতে পারে না। কতক্ষণে ছুটির ঘণ্টা পড়বে?

স্কুল ছুটি হলে লতার সঙ্গে ঈষাণীদেবীর বাড়ীতে আসে দেবকী। লতা ঈষাণীদেবীর ভাইঝি। পিসীমার কাছেই থাকে লতা। ঈষাণীদেবীর বাড়ীরই একটা অংশে পর্ণকুটীর আশ্রম। চার ভিটেতে চারটে টিনের ঘর। একঘরে রামকৃষ্ণদেবের ছবি। এক ঘরে তাঁত। মাটির মেঝে—টিনের চাল, বাঁশের বেড়া। বেড়ার গায়ে একখানা মস্ত পার্থসারথীর ছবি। শ্রীকৃষ্ণ সারথী আর রথের ভিতরে অর্জুন। ছবিখানা বড় ভাল লাগে দেবকীর। ঘরে ঢুকে দেখে ঈষাণীদেবী চশমা চোখে দিয়ে কি সব কাগজপত্র দেখছেন ঘরের মেঝেতে পাটি পেতে বসে। আর তক্তাপোষের উপর শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে পার্থ। দেবকীকে দেখেই চোখ ইশারা করে বারণ করে কি যেন। বোঝে দেবকী, গুরুমার সামনে প্রকাশ করা চলবে না কিছু। চট করে বানিয়ে বলে, "গুরুমা, আমি এবার প্রদর্শনীতে কুলোচিত্রি দিতে চাই। তাই জানতে এলাম, কবে হবে এবার শিল্প প্রদর্শনী।" সস্নেহে উত্তর দেন ঈষাণীদেবী, "এই ত সামনের মাসে হ'বে। কুলো চিত্রি—সে ত খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু চিত্রির সঙ্গে সঙ্গে ডালা কুলো বোনাও শেখা চাই। কুটীর শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যই ত আমার এ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ আর কয়দিন বাঁচবো। তোরা দিন দিন এগিয়ে এসে এ প্রতিষ্ঠানে হাত দে। তবেই ত লেখাপড়া শেখার সার্থকতা বুঝি।"

দেবকী বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে। আবার একটু দাঁড়িয়ে বলে, "গুরু মা বড় জল তেষ্টা পেয়েছে। জলের কলসীটা কোথায়?"

"দাঁড়া আমি এনে দিচ্ছি জল। ঠাকুরের ঘরে কলসী রয়েছে। তোর কাপড়চোপড় ছাড়া না।"

ঈষাণী দেবী উঠে যেতেই চট করে পুঁটলিটা বের করে দেয় পার্থর হাতে। পার্থ তার চাদরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে। মনে মনে খুশি হয় সে দেবকীর উপর। আস্তে একবার বলে দেয়, "কাল আবার এসো—তোমাকে কয়টা

বই দিয়ে যাব পড়তে।" পার্থ ছদ্ম পরিচয় দিয়ে রয়েছে এখানে ঈষাণী দেবীর ভাই পো সেজে। একমাত্র ঈষাণীদেবীই জানেন, যে সে ফেরার ছেলে।

শেষ বেলার রোদ এসে পড়েছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে পার্থসারথীর ছবিখানার গায়ে। দেবকী আবার একটু দেখে ছবিখানা। পার্থকেও দেখে একটু। যেন মনে হয়, ঐ ছবির পার্থর সঙ্গে কোথায় তার মিল রয়েছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তারও চোখেমুখে চুলে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ পার্থদাকে—মনে মনে ভাবে দেবকী। ঈষাণীদেবী জল নিয়ে আসেন। সঙ্গে কয়েকটুকুরো কলা ও বাতাসা।

"এই ঠাকুরের প্রসাদটুকু খেয়ে জল খা।"

দেবকীকে পছন্দ করেন ঈষাণীদেবী। পার্থর দিকে তাকিয়ে বলেন, "খুব কাজের মেয়ে। যেমনি পড়াশুনোয়, তেমনি ঘর সংসারের কাজে।"

পার্থ বলে, "এত যখন কাজের মেয়ে, তখন আমার জামাটায় একটা তালি দিয়ে দিও। আমি তিন তিনবার তালি দিলাম। কিন্তু যেই গায়ে ঢুকোতে যাই খুলে আসে সেলাই।"

কথা শুনে হেসে ফেলে দেবকী।

পার্থ জামার সঙ্গে এককপি 'চলার পথে' লুকিয়ে দেয়। আস্তে বলে "তোমাকেই দিলাম।" বড় ভাল লাগছে আজ দেবকীর সব কিছুই।

পর্ণ কুটীরের তিন দিকেই বড় বড় গাছ—আম জাম মাদার গোয়ারা। গাছের ছায়া ঘরের চালায় চালায়। দক্ষিণে ধূ ধূ করছে ক্ষেত।

উঠোনের কোণায় কয়টা অতসী ফুলের গাছে ফুল ফুটে রয়েছে। ছোট ছোট হলুদ ফুল, হলুদ কুঁড়ি। কয়টা সজনে গাছ তাঁত ঘরের পাশে। সজনে গাছের ঝিরঝিরে পাতার সরু সরু ছায়া পড়েছে উঠোনে। উঠোনের মাঝখানে একটা শাড়ির টানা দেওয়া রয়েছে। লাল আর নাল পাড় হ'বে। মন দিয়ে একটু দেখে দেবকী শাড়ির টানা দেওয়া সুতোগুলি। তারপর হাঁটে বাড়ী মুখে।

বাড়ী এসে দেখে, তার বাবা এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। শিব বাড়ীতে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছে তার, আই. এ. পাশ ছেলে—অবস্থাপন্ন ঘর। কিন্তু বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে দেবকীর। তাহ'লে পড়াশুনো এখানেই শেষ? রাতে শুয়ে থেকে থেকে বুক' ঠেলে কান্না আসে কেন জানি। সত্যি বিয়ে হ'য়ে যাবে তার! শ্বশুর, শাশুড়ী দেওর ননদ। ভাবতেই ভয় করে!

পার্থদার সঙ্গেও তাহ'লে এখানেই শেষ। আর দেখা হ'বে না।

পরদিন পার্থর জামাটা ফেরত দিতে আশ্রমে যায় দেবকী। দুপুর বেলা আশ্রমে কেউ থাকে না—সবাই বাইরে কাজে চ'লে যায়। গুরুমা আজও মন দিয়ে পাটি পেতে বসে দেখছেন কাগজ পত্র সব। দেবকীকে দেখে বললেন, "ঐ ঘরে আছে, দিয়ে আয় জামাটা।"

দেবকী জামাটা রেখে কোনও ভূমিকা না করে বলে, "পার্থ দা, তুমি আমাকে বিয়ে কর।" এত স্পষ্ট সয়ম্বরার প্রস্তাবে হেসে ফেলে পার্থ। "আর বর জুটলো না।" ঠাট্টার সুরে উত্তর দেয় সে। এখনও একেবারেই ছেলে-মানুষী ভাব রয়েছে দেবকীর, এই ছেলে মানুষীটুকুই ভাল লাগে পার্থর। কিন্তু তাকিয়ে দেখে, তার উত্তরে মুখখানা ম্লান হ'য়ে উঠলো দেবকীর।

তাই স্বর বদলে স্নেহের সুরে বলে পার্থ, "তোমার বাবা মা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন কেন?"

"বাবা মা না-ই দিলেন, পালিয়ে বিয়ে করবো।" এক বিন্দু জড়তা নেই কথায়। বিয়ের কথায় লাল হ'বার মত মেয়ে নয় দেবকী।

পার্থ মনে মনে হাসে ওর কথা শুনে। তার শুকনো মুখখানার দিকে তাকিয়ে অগ্রজের ভঙ্গীতে বলে, "লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ। মন দিয়ে লেখাপড়া কর। লেখাপড়া শিখে বড় হও, তারপর বিয়ের কথা ভেবো।"

"লেখাপড়া শেখা এখানেই শেষ। বাবা নিতে এসেছেন।" দেবকী ক্ষুণ্ণ স্বরে উত্তর দেয়।

"মাষ্টার মশাই নিতে এসেছেন? তাহ'লে পরীক্ষা আর দিচ্ছ না?" বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করে পার্থ।

"পরীক্ষা এবার দেবো শ্বশুর বাড়ী গিয়ে।" ক্ষুব্ধ স্বরে উত্তর দেয় দেবকী। শুনে ম্লান হ'য়ে যায় পার্থ। দেবকীকে বলে, "তুমি যাও, আমি মাষ্টার মশাইর সঙ্গে দেখা করবো। দেখি তাঁর মত বদলাতে পারি কি না।"

রাত্রিতে গোপনে দেখা করে পার্থ দীনবন্ধুর সঙ্গে। দীনবন্ধু অবাক হ'য়ে যায় পার্থকে দেখে। পার্থ তা'হলে এখানেই আছে! পার্থ অনুরোধ জানায়, "দেবকীর পড়াটা বন্ধ না করলেই ভাল হয়। এত আগ্রহ ওর পড়াশুনায়। পরীক্ষায় ফল ভাল করেছে। আজকাল ওর চাইতে কত বড় মেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়ছে।" দীনবন্ধু বলে, "আমারও ত তাই মত ছিল। কিন্তু ওর মার মেয়ে ঘরে রাখা কিছুতেই মত নেই। তাছাড়া ছেলের অবস্থা ভাল। টাকা পয়সা লাগছে না। একবার সম্বন্ধ হাতছাড়া হ'লে পরে হয়তো মুস্কিলে পড়বো।"

রান্না ঘরের খোলা বারান্দায় বসে ভাতের জ্বাল ঠেলছে দেবকী। কাঠের উন্থনে দাউ দাউ করে জ্বলছে মাদার কাঠ। আগুনের আভায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ম্লান মুখ খানা। পার্থ বড় ঘরের বারান্দায় বসে লক্ষ্য করে দেবকীর চোখ-মুখের ম্লান ছায়া। মনটা ব্যথিয়ে ওঠে তার। কিন্তু কিছুতেই রাজী হয় না দীনবন্ধু দেবকীকে রেখে যেতে।

পার্থ উঠে আসে রান্না ঘরের সামনে। দেবকী মাথা নীচু করে ভাতের ফ্যান গালছে পেতলের হাঁড়ি থেকে। আগুনের শীসে কাল হ'য়ে গেছে হাঁড়িটা। পার্থ দুয়ারের সামনে দাঁড়ায় খুঁটি ধরে। ম্লান স্বরে বলে, "দেবকী আমি এখন যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'বে না হয়তো। প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও।" হঠাৎ অবশ হ'য়ে আসে দেবকীর হাতদুটো। হাত থেকে ফসকে পড়ে যায় হাঁড়িটা। সমস্ত ফ্যান পায়ের উপর ছড়িয়ে পড়ে।

"পাটা পোড়ালে ত। যাও শীগগীর একটু সোডা নিয়ে এস ঘর থেকে।"

দেবকী উঠে রান্নাঘর থেকে সোডার ঘটটা নিয়ে আসে, পার্থ পকেট থেকে রুমাল বের করে দিয়ে বলে "নাও এটা সোডার জলে ভিজিয়ে লাগিয়ে দাও। ফোসকা পড়বে না তাহ'লে।"

নিঃশব্দে আদেশ পালন করে দেবকী। তাকিয়ে দেখে পার্থ, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বোঝে সে কিসের জন্য এ চোখের জল। একটা কাতর যন্ত্রণা ফুটে ওঠে পার্থেরও চোখেমুখে। দেবকী পায়ে পটি বেঁধে আবার হাঁড়িটা মুছে রাখে। পার্থ অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, "দেবকী আমি যাই?" যেন দেবকীর অনুমতি না নিয়ে যেতে পারছে না সে। কি করুণ আবেদন তার স্বরে। দেবকী মুখ তুলে তাকায়। নিজেকে সংযত করে নিয়ে শুধু একবার বলে, আমাকে ভুলবে না ত পার্থ দা?"

করুণ চোখে তাকায় পার্থ দেবকীর সে আরক্ত চোখের দিকে। ব্যথায় আরক্ত হ'য়ে উঠেছে তারও দৃষ্টি। চোখে চোখ রেখে উত্তর দেয় সে, "কোন দিন ভুলবো না।" স্বরে তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিময় বেদনা।

পুকুরের ওপার দিয়ে হেঁটে চলে যায় পার্থ। অনিমেষ চোখে দেখে দেবকী তার অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়াটুকু। শুধু গাঢ় অন্ধকার দীঘির ওপারে। একটা জোনাকী জ্বলছে দীঘির আঁধার বুকে। রান্নার হাঁড়ি কড়াই মাচায় উঠিয়ে রেখে ঘাটে আসে দেবকী কুপি নিয়ে। কি ঘুরঘুটি অন্ধকার চারদিকে। বুক ঠেলে কান্না আসছে দেবকীর, আর কোনদিন দেখা হ'বে না কি তার পার্থদার সঙ্গে। জল কেটে কেটে চোখমুখ ধোয় ভাল করে। চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ে দীঘির ঘাটে। আরও ভাল করে চোখে জল দেয়, তারপর কুপি নিয়ে উঠে আসে ঠাকুরদাকে ভাত দিতে।

ভোরবেলা ঠাকুর ঘর থেকে ভাইঝিকে ডেকে বলে ঈষাণীদেবী, "লতা, এই পূজোর ফুলকটি উত্তরের বাড়ীর সুন্দর ঠারাণকে দিয়ে আয় ত। ধুতরাফুল তার শিব পূজোয় লাগবে। আরেক দিন ধুতরো ফুলের কথা বলেছিলেন।"

উত্তরের বাড়ী আর ঈষাণীদেবীর বাড়ীর মাঝখানে শুধু একটা আমবাগান।

বৃদ্ধা সুন্দর ঠারাণ একমাত্র প্রাণী উত্তরের বাড়ীতে। ছেলে বৌ সব রেঙ্গুনে থাকে ছেলেপুলে নিয়ে।

ফুলের সাজিটা নিয়ে লতা এসে দাঁড়ায় সামনে, "ঠাকুরমা তোমার জন্য ফুল পাঠিয়েছেন পিসীমা।" শোয়ার ঘরের বারান্দায় বসে বেলপাতা বাছচে বৃদ্ধা। ফুলকয়টি পেয়ে খুশি হ'য়ে বলে, "ঠাকুর জোগাড় করে দিয়েছে ফুল। আজ একটা শিবের ফুল পাইনি। সুগন্ধ ফুল দিয়ে ত শিব পূজো হয় না।"

লতা ঠাকুরমার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ তাকিয়ে দেখে কুড়ি একুশ বছর বয়সের একটি ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সহাস্যে ছেলেটি বললে, "দেখোত চেয়ে চেনা চেনা লাগে কিনা।"

হঠাৎ আনন্দে ঝলমল করে ওঠে বৃদ্ধা, "এতদিনে মনে পড়লো বুড়িকে।" উঠে গিয়ে আনন্দে জড়িয়ে ধরে নাতিকে।

লতা অবাক হ'য়ে দেখে দু' জনকে। ঠাকুরমার যে এমন সুন্দর নাতি আছে, জানতো না। সুলক্ষণ লতাদের ঘাট থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসে। দিদিমা নাতির জন্য তাড়াতাড়ি দুধ জ্বাল দিতে বসে। নারকেল ছাড়িয়ে খইয়ের মুড়কি পেড়ে আনে মাচা থেকে। সুলক্ষণ খেতে খেতে বলে, "দিদিমা বুঝি চা খাওনা?"

"এ জন্মে আর হ'ল না চা খাওয়া। আসছে জন্মে খেয়ে দেখবো কেমন জিনিষ।" তারপর হেসে বলে, "তোমার বুঝি চায়ের পিপাসা আছে। আচ্ছা বোস, লতাদের চায়ের পাট আছে। একটু চেয়ে আনি চা পাতা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই চা বানিয়ে ডাক দেয় নাতিকে। সুলক্ষণের সে চা মুখে দিয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। ফেলতেও পারছে না, গিলতেও পারছে না। হেসে বলে, "দিদিমা, তুমি আর কষ্ট করে চা বানাতে বোস না। বরং আমিই করে নেবোখন।" সুন্দর ঠারাণ ব্যাপারটা বুঝে জিজ্ঞেস করে, "চা বুঝিঠিকমত হয়নি?"

"ঠিকই হ'য়েছে। ঠিক কবিরাজী পাঁচনের মত।"

"এতক্ষণ বসে বসে চা পাতা সেদ্ধ করলাম, তা'ও এমন হ'ল ?"

বিকেলে হবিষ্যি ঘরের বারান্দায় উঠে দেখে, একটি অপরিচিত মেয়ে বসে চা তৈয়ার করছে। একটু সংকুচিত হয় সুলক্ষণ। ঠাকুরমা বলে, "লতাকে ডেকে আনলাম চা বানাতে। দিদিমার করা চা নাকি পাঁচন হয়। এবার খেয়ে দেখ, সুন্দর হাতে করা চা কেমন হ'ল।"

লতা ও সুলক্ষণ দু'জনেই একটু লাল হ'য়ে ওঠে ঠাকুরমার কথায়। সুলক্ষণ আবার একটু তাকিয়ে দেখে লতাকে, সেই কতটুকু ফ্রকপরা মেয়ে দেখে গিয়েছিল সাতবছর আগে। আর আজ চোদ্দ পনের বছরের শাড়িপরা মেয়ে। ভাবতেও কৌতুক লাগে।

পরদিন ঈষাণীদেবী বলে পাঠান, সুলক্ষণ যেন তাঁর ওখানেই চা খায়। কিন্তু চা প্রায় ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে, সুলক্ষণ আসেনা। ঈষাণীদেবী লতাকে ডেকে বলে, "তুই ওর চাটা বরং দিয়ে আয়। হয়তো লজ্জা পাচ্ছে আসতে।"

লতা চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে সুলক্ষণের টেবিলে রাখে। মন দিয়ে কি বই পড়ছে সে। লতাকে দেখে বলে, "ঐ যা ভুলেই গিয়েছি তোমাদের ওখানে যেতে।"

লতা কথা শুনে একটু হাসে। বোঝে সে, এ শুধু অজুহাত। সুলক্ষণ চায়ে চুমুক দিয়ে একটু ভাল করে দেখে লতাকে। চোখেমুখে ভারী সুন্দর একটা মিঠে আমেজ। চোখের পাতায় একটা ঘুমো ঘুমো ভাব।

লতা ঠাকুরমার ঘরে একটু ঘুরে আসে। "কি করছো ঠাকুরমা। এখন বুঝি আমাদের কথা আর মনেই পড়ে না নাতিকে পেয়ে।" থোড় কাটতে বসেছে বৃদ্ধা। হেসে উত্তর দেয়, "তাই তোরে আমার নাতবৌ করার ইচ্ছে।"

লাল হ'য়ে ওঠে লতা, বুড়িদের মুখে কিছু আটকায় না। ঠাকুরমা মনে মনে ভাবে, সুলক্ষণের সঙ্গে মানাত ভাল। রূপে গুণে লক্ষ্মী।

লতা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিতে আসে—সুলক্ষণ জিজ্ঞেস করে, "কোন ক্লাসে পড়।"

"এবার ম্যাট্রিক দেবো।" লাজুক কণ্ঠে উত্তর দেয় লতা।

"পড়ার বই ছাড়া বাইরের বই কিছু পড় না ?"

"কিছু কিছু পড়েছি। বঙ্কিম সাহিত্য, রবিঠাকুরের কবিতা।"

"নজরুলের কোনও বই পড়নি ? অগ্নিবীনা ?"

বিস্মিত হ'য়ে সুলক্ষণের মুখের দিকে তাকায় লতা। চোখ দুটো একটু উজ্জল হ'য়ে ওঠে। লক্ষ্য করে সুলক্ষণ। আস্তে উত্তর দেয় "পড়েছি।" বলে একটু অর্থপূর্ণ চোখে হাসে সুলক্ষণের মুখের দিকে তাকিয়ে। পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বাড়ী চলে আসে লতা। সুলক্ষণ বলে দেয়, "কালও চা টা এখানেই দিয়ে যেও।"

কিন্তু পরদিন চা নিয়ে আসার আগেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, উত্তরের বাড়ীতে পুলিশ এসেছে। সুলক্ষণকে ধরে নিয়ে গেছে।

চোখেমুখে একটা পাণ্ডুর ছায়া নামে লতার। থেকে থেকে কানে বাজছে সুলক্ষণের শেষ কথাটা—"কালও চা টা এখানেই দিয়ে যেও।"

ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে আসে সে। সুলক্ষণের টেবিলটা খালি পড়ে রয়েছে। মাত্র সাতদিন থেকে গেছে সে। তবু মনে হয়, তার অভাবে সারাটা বাড়ী কাঁদছে। ঠাকুরমা চোখের জল মুছে বলে, "সাতদিনের জন্য এসে আমাকে আরও পুড়িয়ে রেখে গেল ছোঁড়া।" লতাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কতকগুলো কাগজপত্র হাতে দিয়ে বলে, "তোকে এগুলো দিয়ে গেছে। বলে গেছে কেউ যেন না জানে।" কতকগুলো লিথোকরা কাগজ। সঙ্গে সম্বোধনহীন ছোট একটা চিঠি—"এই চিহ্নিত কাগজ নিয়ে যে আসবে দিদিমার কাছে তাকে দিয়ে দিও এগুলো। এ দায়িত্বের মর্যাদা রাখবে আশা করি।"

সদর থেকে দুঃসংবাদ নিয়ে আসে কুঞ্জ মাঝি—নন্দনপুরে সাতজন স্বদেশী ডাকাত ধরা পড়েছে। তার মধ্যে পার্থও আছে। নন্দনপুরের জমিদারী সরেস্তায় রাত দুপুরে পিস্তল দেখিয়ে ডাকাতী করে পালাচ্ছিল তারা খাল পার দিয়ে। খাল পারে টেঁটা নিয়ে সজারু মারতে বসেছিল চাষীরা। গোলমাল শুনে সেই টেঁটা দিয়েই তাড়া করে তাদের। একজনের নাকি এফোঁড় ওফোঁড় হ'য়ে গেছে। পার্থরও নাকি পায়ে বিঁধেছিল একটা হেঁসার। সরকারী হাসপাতালে রয়েছে তারা। যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। হাসপাতালের পাশেই দেওয়ানী কোর্ট। নিজের কানে শুনে এসেছে কুঞ্জ সে চিৎকার।

এ সংবাদ শুনে কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলে মঙ্গলা। আবার ছুটে যায় কুঞ্জর বাড়ী। "প্রাণে বাঁচবে ত? বেঁচে আছে সবাই—শুনেছো ত?"

"প্রাণে বেঁচে আছে সবাই। তবে শুনলাম, কালাপানি নাকি হ'তে পারে।"

সুদাম চুপ করে বসে থাকে দাওয়ায়—হাতে পায়ে ঝিম ধরে আসে—নড়বারও শক্তি নেই যেন। লক্ষ্মণ বলে, "আর ওদেশের চাষীরাই বা কেমন? হেঁসার দিয়ে গেঁথে ধরিয়ে দিল?"

কুঞ্জ উত্তর দেয়, "ওরা নাকি প্রথমে বুঝতে পারেনি যে এরা স্বদেশী ডাকাত। পরে আফসোস করেছে।"

সুদাম দীনবন্ধুর কাছে আসে পরামর্শের জন্য। "আমি যে এখন কি করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ওর মা ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে।"

দীনবন্ধু পরামর্শ দেয়। "তুমি আর পার্থর মা, দুজনেই চলে যাও সদরে। সেখানে আমার এক চেনা মোক্তার আছে। আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি—তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। পার্থর সঙ্গে দেখা করতে কোথায় কি ভাবে দরখাস্ত করতে হ'বে, তিনিই করে দেবেন।"

পাঁচ মাইল দূরে রেল ষ্টেশন। লক্ষ্মণ সুদাম ও মঙ্গলাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসে।

গাড়ী থেকে নেমে দীনবন্ধুর পরিচিত মোক্তারবাবুর বাড়ীতেই ওঠে সুদাম।

সব শুনে চিন্তিত সুরে বলে মোক্তারবাবু। "ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেয় কিনা, বলতে পারি না।"

মঙ্গলা সারাদিন ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে। "দয়াল হরি, দেখা যেন হয় তার সাথে। একটু চোখের দেখা, তাও দেখতে পাব না?"

মোক্তারবাবুর বৌ কলাপাতায় ভাত বেড়ে দেয়, "সারাদিন না খাওয়া। দু'টি ভাত মুখে দিয়ে নিন।"

কিন্তু ভাত কি আর গলা দিয়ে নামতে চায়? দু'চোখ ছাপিয়ে জল পড়ে। মোক্তারবাবু দূর থেকে লক্ষ্য করে কাছে এসে আশ্বাস দেয়, "শেষ চেষ্টা করে দেখবো আমি—আমাদের উকিলবাবুকে দিয়ে। অত মুষড়ে পড়ছো কেন?"

সপ্তাহ চলে যায়। তবু বহু চেষ্টা করেও দেখা করার অনুমতি পাওয়া যায় না। ম্লান সুরে বলে মোক্তারবাবু, "আজ ওদের কোর্টে আনা হবে। তোমরা কোর্টের ধারে মাঠে দাঁড়িয়ে থেকো। তাহ'লে অন্ততঃ চোখের দেখাটা দেখতে পাবে।"

দশটা না বাজতেই কোর্টের মাঠে গিয়ে বসে থাকে সুদাম মঙ্গলাকে নিয়ে। বারোটা, একটা, দু'টো বেজে যায়। কোথায় কে? শুধু চাপরাশীরা ঘুরছে এদিক ওদিক। আর সব সাক্ষী সাবুদ। প্রতীক্ষায় অস্থির দু'জনে। যেন এক অকূল যমুনা পাড়ি দিচ্ছে, কুল আর দেখতে পাচ্ছে না কোথাও। তবে কি দেখা হ'বে না? বুকটা কেঁপে ওঠে। থেকে থেকে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছচে মঙ্গলা। চোখ মোছে সুদামও।

মোক্তারবাবু ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ছুটে আসে, "এখুনি আনা হ'চ্ছে ওদের। তোমরা ঐ গাছটার তলায় এসে দাঁড়াও।"

বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করে মঙ্গলার। হাত পা কাঁপছে। স্বদেশী ডাকাতদের দেখার জন্য লোকে লোকারণ্য রাস্তার দু'ধারে। উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে সুদামের। পুলিশ এসে ভীড় সরিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে দেয়। একদল বন্দুকধারী

পুলিশ আগে আগে চলে। তারপর আসে আসামীরা। দু'জনের হাত এক সঙ্গে করে হাতকড়া দিয়ে আটকানো। পায়েও লোহার কড়া।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় মঙ্গলা—কই, পার্থ কই? সুদাম ঠেলা দিয়ে বলে, "এই যে দেখ দেখ। পার্থ আসছে।"

মঙ্গলাকে টেনে নিয়ে আর একটু এগিয়ে যায় সামনে।

পার্থও দেখতে পেয়েছে তাদের। মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসে একটু। কি যেন বারণ করে মাথা নেড়ে। মঙ্গলার দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। মন চাইছে, ছুটে গিয়ে পার্থকে বুকে চেপে ধরে। শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই জড়িয়ে ধরে ছেলেকে। বুকের ভিতরে হাহাকার বইছে—আহা আমার পার্থরে।

চোখের সামনে থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ছেলে। মনে হয় যেন তার হৃৎপিণ্ডটাই বুক ছিঁড়ে চলে যাচ্ছে। আর একবার ফিরে তাকায় পার্থ। তারপর আর দেখা যায় না। ভিড় ঠেলে আর একটু এগোবার চেষ্টা করে সুদাম মঙ্গলার হাত ধরে। কিন্তু ততক্ষণে কোর্টের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে আসামীরা।

তবে কি জন্মের মত এই শেষ দেখা। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মঙ্গলা। অবশ দেহ দুটো এলিয়ে বসে পড়ে দু'জনে গাছটার তলায়। আবার চোখের জল পড়ে।

মোক্তারবাবু একবার দেখা করে যায়, "দেখতে পেয়ে ছিলে ত?"

"এ দেখায় কি আশ মেটে বাবু।" হু-হু করে কেঁদে ওঠে মঙ্গলা।

সুদাম জিজ্ঞেস করে "এখান দিয়েই ত ফিরে যাবে ওরা, তখন আর একবার দেখা হবে না?"

মোক্তারবাবু ম্লানস্বরে উত্তর দেয়, "ওদের দেখার জন্য এত ভিড় হয় রাস্তায়। তাই অন্ধকার না হ'লে ওদের নেওয়া হ'বে না। তাছাড়া হয়তো অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে নেবে—কাউকে জানতে দেবে না।"

পাটিপত্র হ'য়ে যায় দেবকীর। দীনবন্ধু শিকদার বাড়ীতে সুখদার কাছে মেয়ের বিয়ের শীতলপাটির ফরমাইস দিতে যায়। দীঘির পুবপাড়ে শিকদার বাড়ী। সুখদাই এখন একমাত্র মানুষ সে বাড়ীতে। আর সবাই শিকদার নামের পরিচয় থেকে মুক্ত হ'তে ঘর বাড়ী বিক্রী করে সহরে চলে গেছে। সেখানেই চাকরী বাকরি করে সবাই। কেউ পোষ্টমাষ্টার কেউ কেরাণী। কেউ দোকান দিয়েছে। একমাত্র সুখদা বাপ ঠাকুরদার ভিটার মায়া ত্যাগ করতে পারেনি। নিঃসন্তান সুখদা ডালা কুলো বেঁধে, পাটি বুনেই খোরাকীর সংস্থান করলো সারাটা জীবন। চার পাঁচ গ্রামের মধ্যে তার মত পাটি বুনতে পারে না কেউ।

দীনবন্ধু এসে বসে উঠোনে। সুখদা বসে একটা বেতের ডালা বুনছে। উঠে গিয়ে জলচৌকীটা এনে দেয় বসতে। "দেবকীর নাকি সম্বন্ধ ঠিক হ'য়েছে?" "সেজন্যই ত এলাম। একখানা শীতল পাটি বুনে দিতে হ'বে। পাটি খানা যেন দেখার মত হয়। লেপ তোষক দেবার ত আর ক্ষমতা নেই।"

সুখদা সহাস্যে উত্তর দেয়, "দেবকীর বিয়ের পাটি বুনবার জন্য যখন আজও বেঁচে আছি, তখন বেয়াইয়ের মন ভুলাতে পারবো, এই বুড়ির হাতের এক পাটি দিয়েই।" কথাটা সমর্থন করে দীনবন্ধু মৃদুহাস্যে। ঘরের দিকে একবার লক্ষ্য করে বলে, "ঘরের যে রুয়া আলগা হ'য়ে গেছে। ঝড়বাদলের দিন সামনে। ওটায় বাঁধ দিয়ে নিও।" "দেখছি ত আমিও। কিন্তু এখন কি আর ঘরের রুয়া বাঁধনের ক্ষমতা আছে। না হ'লে এককালে ত কত বেড়া আমিও বাঁধছি ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে।" দীনবন্ধু উঠতে উঠতে বলে, "আচ্ছা, আমিই এসে বাঁধটা ঠিক করে দিয়ে যাবখন, আলিকে বলে।"

মেঘীর মায়ের সঙ্গে দেখা হয় সুবালার মনসা বাড়ীতে। সুবালাকে দেখে জিজ্ঞেস করে কালাঠারাণ, "কি গো দেবকীর মা, দেবকীর নাকি খুব ভাল সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে?" সুবালা মনের খুশি চেপে রেখে বলে, "তালুক আছে

ছেলের মামার। ছেলে মামার বাড়ীতেই মানুষ। মামার ছেলের মত। বছরের খাওয়া পরা হ'য়ে যায়। শুনি বাড়ীতে সাত আটজন মাহিন্দা খাটে।"

"ছেলের ভাইবোন আছে না?"

"বড় এক বোন—তারও বিয়ে হ'য়ে গেছে। কোলকাতায় থাকে।"

"তাইলে ত ভাল পাত্রই ঠিক করছো। তা' তোমার মেয়েওত দেখতে ভাল। গড়নও সুন্দর। তার উপর লেখাপড়াও শিখেছে।"

সুবালা অনুরোধ জানিয়ে বলে, "সামনের সোমবারে হলুদ কোটার দিন ঠিক করেছি। একটু পায়ের ধুলো দেবেন সবাই। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে এখন ভালয় ভালয় কাজটুকু হ'য়ে যায় তবেই হয়।"

বাড়ী বাড়ী হলুদ কোটার নিমন্ত্রণ করে আসে সুখদা কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে। দুপুর বেলা ঘরের কাজকর্ম সেরে পাড়ার বৌ ঝিরা শাশুড়ীদের সঙ্গে আসে দীনবন্ধুর বাড়ীতে হলুদ কুটতে। ঢেঁকি ঘরের সামনেটা মেয়েলী গল্পে মুখর হ'য়ে ওঠে। মেঘীর মাসী তার বিয়ের গল্প আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে সব কটি বৃদ্ধার মনে পড়ে তাদেরও বধূজীবনের কাহিনী। "এখনত বাক্স পোর্টম্যান ছাড়া বিয়েই হয় না। আর আমাদের সময় খান দুই কাপড় হলুদ দিয়ে ছুপিয়ে পুঁটলি বেঁধে দিয়ে দিত কনের সঙ্গে।"

মেঘীর মাসী বলে, "পোটম্যান কি? আজকাল আবার চল হ'য়েছে সুটকেশ।"

সুখদা আলাপ থামিয়ে বৌঝিদের দিকে তাকিয়ে বলে, "একখান বিয়ের গান গা। গা, সীতারে সাজাইতে কি কি লাগে?"

হলুদ কোটা শেষ হ'য়ে গেলে সকলের হাতে হাতে পান বাতাসা দেয় সুখদা। সুন্দর বৌর দিকে লক্ষ্য করে বলে, "বিয়ের জল ভরার গান করতে হবে কিন্তু। আমাদের মেয়ের বিয়েতে ইংরেজী বাদ্য কিন্তু আনবো না।"

মেঘীর মাসী শুনে বলে, "এটা করেছো কি দেবীর মা? ইংরেজী বাদ্য ছাড়া বিয়ে বাড়ীই মনে হয় না।"

"কেন আমাদের সুন্দর বৌর গলা থাকতে আর ভাবনা কি?" উত্তর দেয় সুখদা।

মেঘীর মাসী আবারও বলে, "এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না। প্রথম মেয়েটির বিয়ে। তাছাড়া অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলের মামার মানটাওত রাখতে হবে।" সুবালা বলে, "বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে গিয়ে মেয়ের বাপের এখনই চোখের নিদ্রা ঘুচেছে। সংসারের অবস্থা যে কি, তা'ত জানেনই সবাই।"

বিয়ের দিন সারাদিন দেবকীকে দিয়ে সোহাগ মাপায় সুখদা। সুখদা বার বার এসে বলে যায়, "মনে মনে বলিস কিন্তু—'শ্বশুরের সোহাগ মাপি, শাশুড়ীর সোহাগ মাপি, ভাসুরের সোহাগ মাপি, দেওরের সোহাগ মাপি।' যত বেশী সোহাগ মাপবি, ততবেশী সোহাগ পাবি শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে।"

দেবকী ঝাঁঝিয়ে উঠে, "যাও, আমার আর সোহাগের দরকার নেই।" মা বাবার উপর রাগে, দুঃখে, অভিমানে চোখের পাতা বার বার ভিজে আসছে তার।

উপোস করিয়ে লালপাড় নূতন শাড়ি পরিয়ে রাখা হ'য়েছে দেবকীকে। হাতে দশগ্রন্থীর হলুদ সুতো বাঁধা। মনে হয় দেবকীর, সকলের চোখের আড়ালে পালিয়ে যেতে পারতো যদি সে। কোথায় রয়েছে এখন পার্থদা। সে কি পারতো না তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে কোথায়ও অনেক দূরের দেশে। দেবতার কাছে আকুল হ'য়ে সারাদিন প্রার্থনা করে—বিয়ে ভেঙ্গে দেবার জন্য।

পিছনের দুয়ারের উঠোনে বসে গ্রামের বৌরা, মেয়েরা হলুদ বাটার গান করছে।

"কুর বাট গো অতি সকালে
কুর বাটিতে কি কি লাগে
কাঁচা হলুদ, মুগ লাগে লো।

তোরা আয় লো সকালে
আমার রাম সীতারে স্নান করাবো
সুশীতল জলে।"

দেবতার কাছে এত আকুল প্রার্থনা সত্ত্বেও নির্বিঘ্নে বিয়ে হ'য়ে যায় দেবকীর। বরবৌয়ের পাল্কী কাঁধে বেহারারা হেঁটে চলে ধান ক্ষেতের আল দিয়ে। তাদের পথচলার হুঁশিয়ারী গান মিলিয়ে যায় ক্ষেতের দু' ধারে বন কলমির মৌন নীলায়।

চৈত্র মাস পড়তে না পড়তেই রৌদ্রের কি তেজ। উঠোনে পা দেওয়াই যায় না। এত তেতে থাকে মাটি। উঠে গিয়ে গরুটাকে ফ্যান জল দিয়ে আসে সুখদা। একটু ছায়া দেখে বেঁধে দেয় গরুটাকে। দু' চোখ ভরে ওঠে অপত্য স্নেহে। মায়ের জীব। মানুষের মত কথা বলে যেন গরুর চোখ দুটি। গরুটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে সুখদা, "নে ফ্যান জল খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর।" গরুর চাড়িটা সামনে এগিয়ে এসে বসে পাছ দুয়ারে পাখা বুনতে। গরমের দিনে এই পূবের দিকে উঠোনটুকুতে বসে তবু প্রাণটা জুড়ায়। আম গাছের ছায়ায় ছায়ায় সুশীতল। দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া বইছে। গায়ের কাপড়টা খুলে বসে সুখদা।

কুন্তী এসে বসে রয়েছে অনেকক্ষণ ধরে গল্প শোনার আশায়। "কালকের গল্পটাতে শেষ করনি আজ সেটা বল।"

"দাঁড়া বলছি। কিন্তু তুই আমার একটু ঘামাচী গাল দেখি লক্ষ্মী সোনা। যা আমার শিয়রের কাছ থেকে ঝাপিটা নিয়ে আয়।"

কুন্তী উঠে গিয়ে ঝাঁপিটা নিয়ে আসে। অদ্ভুত অদ্ভুত নানা জিনিষে ভরা বেতের ঝাঁপি। কুন্তী একটা সাদা জিনিষ তুলে জিজ্ঞেস করে, "এটা কি পিসী?" "এটা সমুদ্রের ফেনা। গালে টৌ উঠলে এই সমুদ্রের ফেনা ঘষে ধুতরা পাতার রসের সঙ্গে মিশিয়ে লাগাতে হয়।"

খুঁজে খুঁজে একটা সমুদ্রের ঝিনুক বের করে দেয় কুন্তীর হাতে, "এটা দিয়ে গাল ঘামাচী।" কুন্তী অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে, "এত ছোট ঝিনুক কোথায় পেলে, পিসী?"

"এ হ'ল সমুদ্রের ঝিনুক। একি আর এ দেশে পাওয়া যায়। আমার জ্যাঠা পুরী গিয়েছিলেন, আমি তখন তোর বয়সী। তখন নিয়ে এসেছিলেন, এই সমুদ্রের ঝিনুক, সমুদ্রের ফেনা।" সমুদ্রের ফেনাটা একটু নেড়ে চেড়ে আবার প্রশ্ন করে কুন্তী—"সমুদ্র কেমন দেখতে?"

"আমি কি দেখেছি? জ্যাঠার কাছে শুনেছি, আমাদের সেই বড় যমুনার চাইতেও দশ বিশগুণ বড় হ'বে। এপারে দাঁড়ালে ওপার দেখা যায় না।"

কুন্তী অবাক হ'য়ে ভাবে, যমুনার চাইতেও বড়! এপার ধূ ধূ, ওপারে ধু ধু সেই সমুদ্রের ধারেই ত নিয়ে রেখেছিল শঙ্খ কুমারকে।" কুন্তী ঝাঁপিটা রেখে এসে বলে, "এবার গল্প বল।"

সুখদা পাখা বুনতে বুনতে প্রস্তাব বলা শুরু করে।

চৈত্রের দুপুর খাঁ খাঁ করছে চার দিক। কিন্তু এই আমগাছের তলায়, শিকদার বাড়ীর এই পাছ দুয়ারের উঠোনে বসে কুন্তীর চোখের সামনে এখন জ্যোৎস্না থৈ থৈ করছে। আর সে জ্যোৎস্নায় মতির পাহাড়, মুক্তোর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ক্ষীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছে রাজকুমার গজমোতি হারের সন্ধানে।

আবার নূতন গল্প আরম্ভ করে সুখদা। একটা কাঠ-ঠোকরা পাখী এসে বসে আমের ডালে। একটা গুই সাপ ছুটে চলে যায় বেত ঝোপের মধ্যে। কুন্তীর চোখে এখন অচিন দেশের গা ছম ছম—রাত্রির নিঝুম। মালঞ্চমালার গল্প বলে চলেছে তার সুখী পিসী। "পতি হাসে, মালঞ্চ হাসেন, পতি কাঁদে মালঞ্চ কাঁদেন। পতি কথা কয়, মালঞ্চ কথা কন, পতি হাত পা নাড়ে, মালঞ্চ আদরে খেলা দেন। চোখের জল দিয়ে মালঞ্চ পতিরে নাওয়ান, মাথার চুল দিয়ে পতিরে মুছান।" নিঃশ্বাস না ফেলে যেন গল্প শুনছে কুন্তী

চোখের পাতা পড়ে না। চোখের তারা নড়ে না। গল্প বলতে বলতে সুখদার পক্ষহীন চোখের তারায় গভীর স্নেহ উথলে উঠেছে সেই ধৈর্যবতী মালঞ্চমালার কষ্টসহিষ্ণুতায়। আহা কি মায়াবতী কন্যা।

"চলতে চলতে সেই নিলক্ষ্যের চড়ায়, শিশু স্বামীর মুখে রৌদ্র লাগে, মালঞ্চ তাঁর আঁচল দিয়ে ঢেকে নেন, বৃষ্টি মাথায় পড়ে, মালঞ্চ তাঁর বুক দিয়ে আবরে নেন।"

রোদ ঝিমিয়ে আসছে আমগাছের ডগায়। ছায়া পড়ছে দক্ষিণের উঠোনে। কুন্তী বাড়ী ফেরে আমবাগানের ভেতর দিয়ে। রূপকথার এক মায়াবতী কন্যার স্নেহ, মায়া, ধৈর্য, সহিষ্ণুতায় ছোট্ট বুকখানা ভরে উঠেছে তার। ঘরে এসে পুতুলের বাক্স খুলে বসে।

হঠাৎ ঢাকের শব্দে খেলা ফেলে বাইরে ছুটে আসে। মনসাডাঙ্গার নীল এসেছে।

খই বাছতে বসেছে সুবালা। উঠে হাত ধুয়ে জল ঢেলে দেয় উঠোনে। সেই জলের উপর সিঁদুর লেপা শিবের ত্রিশূলটা বসিয়ে নীলের সন্ন্যাসীরা ঢাকের তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচে সে ত্রিশূল প্রদক্ষিণ করে। নাচ থামিয়ে গান করে। তারপর আবার কিছুক্ষণ নাচে।

লক্ষ্মণ, অর্জুন, অমূল্য—সন্ন্যাসীরা সবাই লাল রঙের কাপড় পরা। মাথায় তেল না দেওয়া রুক্ষ চুলগুলি লাল কাপড় দিয়ে বাঁধা। রোদে ঘুরে ঘুরে চোখমুখ লাল।

সুবালা বাটায় করে আতপ চাল, তরমুজ, ফুটি সাজিয়ে এনে দেয়। দীনবন্ধু একটা ডাব এনে রাখে সামনে শিবকে স্নান করাতে। সুদাম বালা হ'য়েছে এবছর। ডাবটা কেটে সে জল দিয়ে শিবকে স্নান করায়। তেল সিঁদুরে লেপা শিবের মূর্তি থেকে কোনও আকৃতির হদিস পাওয়া যায় না। তবু সসম্ভ্রমে সশ্রদ্ধায় দেখে সবাই শিবের স্নান। সে জল দিয়ে ভক্তিভরে চরণামৃত গ্রহণ করে সবাই। দীনবন্ধু সতর্ক করে সাথীকে, "দেখিস, পায়ে যেন না পড়ে।"

সুবালা সুদামকে বলে, "সামনের সোমবারে সন্ন্যাসীদের খাওয়াতে চাই। তুমি রাজাকে বল।"

সুদাম বলে, "সোমবারে ত সেনের বাড়ীতে রামচন্দের প্রসাদ নিতে বলেছে। আপনার এখানে বুধবারে হোক।"

অমূল্য ঝুলির মধ্যে চালগুলি ঢেলে নেয় বাটা থেকে। দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করে, "শিববাড়ীতে গিয়েছিলে না? সরকার বাড়ীতে যাওনি?"

"সরকার বাড়ীতে মার দয়া হ'য়েছে শুনলাম। তাই সে বাড়ীতে যাওয়া হয়নি।" উত্তর দেয় অমূল্য।

দীনবন্ধু চিন্তিত হয়, সরকার বাড়ীতে মায়ের দয়া হ'ল কার? রাত্রিতে তামাক খেতে উঠে আবারও চিন্তা করে দীনবন্ধু, কার হ'ল বসন্ত?

সুবালা মৃদু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ঘুমের ঘোরে, "তোমার আবার বেশী চিন্তা। দেবকীদের বাড়ীতে কারও হ'লে নিশ্চয়ই সংবাদ দিত।"

বুধবার সকাল থেকে হাঁড়ি কড়াই সব মেজে ঘর দোর লেপে রাখে সুবালা। সন্ন্যাসীরা মাছের ছোঁয়া হাঁড়িতে খাবে না। হবিষ্যি ঘরের কাঠের উনুনটা গোবর মাটি দিয়ে লেপে ঠিক করে রাখে। দেবকী, কেতকী নেই—একা হাতে সব করতে হ'বে। তাই সুখদাকে বলে আসে, হাতে হাতে একটু সাহায্য করে যেন এসে।

বিকেলে নদী থেকে স্নান করে এসে উনুন ধরায়। সুখদা তার গরুর দুধটুকু নিয়ে আসে সন্ন্যাসীদের জন্য। দুঃখ করে বলে সে, "এক সন্ধ্যা যে খাওয়াব সন্ন্যাসীদের তারও সাধ্য নেই আমার। এই দুধটুকু জ্বাল দিয়ে দিও তাদের।"

দীনবন্ধুর কানে যায় কথাটা। সামনে এসে বলে সে, "ভক্তি ভরে' যে যা' দিয়ে সেবা করে, তা'তেই পুণ্যি।"

সুখদা তরকারি কুটতে বসে। "লাবরার আনাজ কুটবো ত?"

হবিষ্যি ঘরে ভিতরে পায়েস বসিয়েছে সুবালা। পায়েসের দুধ নাড়তে নাড়তে উত্তর দেয় ঘর থেকেই, "ঐ কুমড়োটা কাটুন। আমার বাড়ীর কুমড়ো।"

সাথীকে ডাক দিয়ে বলে, "দোকান থেকে এক শিশি তেল কিনে আন ত বাকিতে।"

সাথী দারুণ খুশি আজ। ছুটে ছুটে মায়ের ফরমাশ খাটে। দিদিরা না থাকায় তার উপর অনেক কাজের ভার। কলাপাতা কেটে গুছিয়ে রাখে, হারিকেনে তেল ভরে রাখে। সুবালা হবিষ্যির ঘর থেকে ডাক দিয়ে বলে, "সাথী এই লাকড়িটা একটু চেলা করে দিয়ে যা'ত। আকুর কাজ? এত মোটা লাকড়ি কি আর উনুনে ঢোকে?'

দীনবন্ধু একবার খোঁজ নিয়ে যায়, "হরীতকী আছে ত? সন্ন্যাসীরা ত পান তামাক খাবে না। মুখশুদ্ধি করতে কি দেবে?"

সন্ধ্যার পর গোবর দিয়ে লেপে উঠোনের চারদিকে কলাপাতা পেতে আসন করা হয়। সন্ন্যাসীরা স্নান করে এসে বসে। সুবালা আর সুখদা দু'জনে পরিবেশন করছে। দীনবন্ধু দাঁড়িয়ে তদারক করে, "কেমন হয়েছে রান্না বিশেষ কিছু করতে পারি নি।"

"এর চাইতে আবার কি করা লাগে?" সুদাম মুখ তুলে বলে, "খুব ভাল হ'য়েছে রান্না।" বার বার সুখ্যাতি করে সবাই রান্নার। কুন্তী দূরে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখছে সন্ন্যাসীদের খাওয়া। দেখছে লাল কাপড় পরা, তেল না দেওয়া রুক্ষ চুল সন্ন্যাসীদের। সুখদা একবার সামনে এসে বলে, "কি লো, তোর শ্বশুরকে দেখতেছিস?" সুবালা পায়েসের খাদা নিয়ে আসে।

সুখদা বলে, "দেবকী থাকলে এতক্ষণে মেতে উঠতো বাড়ী।"

সুদাম সায় দেয়, "সত্যি, আপনাদের পাড়াই অন্ধকার হইয়া গেছে।"

লক্ষ্মণ বলে, "আর আমাদের পাড়া অন্ধকার করে গেছে পার্থ। আমাদের গ্রামের সেরা ছেলে।"

দীনবন্ধু উত্তর দেয়, "শুধু মনসাডাঙ্গার নয়, এ অঞ্চলেরই সেরা ছেলে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুদাম। দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করে, "চিঠিপত্র আসে পার্থর? আর কতদিন থাকতে হ'বে জেলে।"

"তিন বছরের মাত্র ত ছয় মাস গেল। চিঠি আসে মাঝে মধ্যে। তবে এত কাটাকাটি করা থাকে সে চিঠি। কোনও চিঠির অর্দ্ধেকটাই কাঁচি দিয়ে কাটা থাকে।"

মুখ ধুয়ে হরীতকী মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করে। দীনবন্ধু জিজ্ঞেস করে, "এবার কাঞ্চনপুর যাবে না নীল নিয়ে?"

লক্ষ্মণ উত্তর দেয়, "সেখানে যেতে নাকি নীলের সন্ন্যাসীদেরও পাস লাগে। দারোগার কাছ থেকে পাস আনতে হয়।"

অমূল্যর ভাই ঢাকটা কাঁধে তুলে নিয়ে সুর টানে,

"সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে—
ছিল না মা পাস।
হ'ল একি সর্বনাশ
মা—মা—মাগো।
নন্দীরে কয় যাও কৈলাসে
নীল হ'বে না বিনা পাশে
রেখো মা তোর চরণ তলে
তোমার অনন্ত নীলে।"

মনসাডাঙ্গার পথে হেঁটে চলে সন্ন্যাসীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে। ঢাকের শব্দ অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে ভেসে চলে যায় বহু দূর গ্রামে।

রোজার মাস মাটি কাটতে কাটতে গলা শুকিয়ে আসে। দিন যেন আর শেষ হয় না। মনসাডাঙ্গার আল্লাবক্স কামলাদের সঙ্গে ঝুড়িতে করে মাটি টানছে পুকুর থেকে। চৌধুরী বাড়ীর বোজা পুকুরটা কাটা হ'চ্ছে। ঝুড়ি ভর্তি ভর্তি মাটি এনে পাড়ে ফেলছে কামলারা। পুকুর কাটা প্রায় শেষ হ'য়ে

এসেছে। এই ঘামঝরা মেহনতের শেষেই জলে ভরে উঠবে দীঘিটা, কলজে ঠাণ্ডা হবে মানুষের সে জলে গা ডুবিয়ে। আলাবক্স ঝুড়ির মাটিটা ঢেলে রেখে নীচে নামতে নামতে লক্ষ্য করে সবাই ভীড় করে কি দেখছে। "এই তোরা কি দেখছিস।"

আল্লাবক্সের ছেলে উত্তর দেয় নীচ থেকে, "একটা নাওয়ের গলুই পাওয়া গেছে। পেতলের গলুই। আর একটা কলসী।"

মন দিয়ে কি লক্ষ্য করে বলে সে, "হিন্দুগো কোনও ঠাকুর দেবতার মত লাগছে যেন।" সতর্ক হ'য়ে কোদাল চালায়। সত্যি, এক কালো পাথরের নিটোল নিখুঁত লক্ষ্মী মূর্তি—বাড়ীর লোকজন সবাই ভীড় করে আসে পুকুর পাড়ে। লক্ষ্মী মূর্তি দেখতে। গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে কথাটা। চৌধুরী বাড়ীর বোজা পুকুর থেকে লক্ষ্মী প্রতিমা বেরিয়েছে।

কামলারা গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। আল্লাবক্স গল্প করে, "সারা দক্ষিণ পাড়ই নাকি আগে জলের তলায় ছিল। এ সব অঞ্চল ছিল ডাকাতদের ঘাঁটি। এই যেখানে বসে তারা গল্প করছে, এই আমতলা দিয়েই ডাকাতদের ছিপ আসতো, যেতো। সেই ডাকাতদের নৌকোরই গলুই হবে ওটা। আল্লাবক্সের ছেলে অবাক হ'য়ে ভাবে, কতবড় বিশাল নদী, চর পড়তে পড়তে এতগুলো গ্রাম হ'য়ে গেছে। নদীর চরে এত গাছ-গাছালি বন-জঙ্গল হ'য়ে গেছে। আবার আরেক দিকে ভাঙতে ভাঙতে কত গ্রাম যে খেয়ে ফেলেছে তার শেষ নেই। নদীর যে কখন কি মতলব হ'বে, মানুষের বোঝার সাধ্য নেই।

উত্তর পাড়ের নীল এসেছে বাড়ীর মধ্যে। কামলারা উঠে যায় সে নীলের গান শুনতে। সন্ন্যাসীরা, হিন্দুগো, শিবের গান করছে। শিব বলছেন—

"ভাইগনা আমি ভাঙা ঘরে শুইয়া থাকি
চাহিয়া দেখি দু'টি আঁখি
উশি পুশি করে রাত্রি কাটাই
চক্ষের জলে বক্ষ ভাইসা যায়।

ভাইগনা যদি উপকারী হও
তবে বিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।"
তখন নারদ মুনি হেঁকে কয়,
শুন মামা মহাশয়;
আমি নারদ হইলাম ঘটক
তোমার বিয়ার কিসের আটক।"

সংক্রান্তির মেলার জন্য পাখা বুনছে সুখদা। চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে পর পর সাতদিন মেলা বসে গঞ্জের হাটে। লক্ষ্মণকে বলে রেখেছে সে, তাদের জিনিসের সঙ্গে তার পাখা ক'খানা ও নিয়ে যাবে বেচতে। পাখার আঁটি ঘরে তুলে রেখে দেবকীদের বাড়ী আসে। দেবকীর মায়ের কিছু খই বেছে দিতে হ'বে। বড় মেয়েরা কেউ সামনে নেই—একা হাতে সংক্রান্তির কাজ কর্ম সেরে উঠতে পারেনা সুবালা। সুখদা এসে কিছু কিছু সাহায্য করে দিয়ে যায়। সুবালা চালনিতে করে খই বাছছে, সুখদা আরেকটা চালনি নিয়ে বসে। কুন্তী এসে বসে গা ঘেঁষে, "পিসী, শীত বসন্তের সেই গল্পটা আজ শেষ করতে হ'বে।"

"কতখানি বলেছিলাম?"

"সেই যে—সোনার টিয়া বল্‌তো আমার আর কি চাই!"

সুখদা গল্প বলা শুরু করে—"সোনার টিয়া উত্তর দেয়—'সাজতো ভাল কন্যা যদি সোনার নুপুর পাই'।"

রাজকন্যা কৌটো খুলে সোনার নুপুর পায়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, "সোনার টিয়া বলতো আমার আর কি চাই?" টিয়া বল্ল—"সাজতো ভাল কন্যা যদি ময়ুরের পেখম পাই।" রাজকন্যা পেটরা থেকে ময়ুরপেখম শাড়ি খুলে পরলেন। এমনি করে রূপবতী রাজকন্যা একে একে হীরার হার

পরলেন, মোতির ফুলের নোলক পরলেন, সিঁথিতে মনিমাণিক্যের সিঁথি পরলেন।

তখন টিয়া বল্ল, "না আনিলে গজমোতি, কেমন এল বর
রাজকন্যা রূপবতীর ছাইয়ের স্বয়ম্বর।"

অমি রাজপুত্রদের সভায় খবর গেল, রাজকন্যার পণ, যে রাজপুত্র গজমোতি এনে দিতে পারবেন, রাজকন্যা তাঁর হ'বেন।

"এদিকে বসন্ত মুনির বনে আছে এক পাতার কুঁড়েতে। সে পাতার কুঁড়েয় এক শুক আর এক সারী থাকে। শুক সারীর মুখে রূপবতী রাজকন্যার এ পণের সংবাদ শুনে বসন্ত চল্ল সেই গজমোতির সন্ধানে। যেতে যেতে বসন্ত কত পর্বত, কত বন কত নদনদী—দেশবিদেশ ছাড়িয়ে বার বছর তের দিনে ধবল পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌছালেন। ধবল পাহাড়ের গায়ে দুধের ঝরণা বয়ে চলেছে। বসন্ত সেই পাহাড়ে উঠে দেখলেন

"ঢেউ থই থই সোনার কমল, তার মাঝে কি
দুধের বরণ হাতীর মাথে গজমোতী।"

কুন্তীর চোখের পাতা পড়ে কি পড়ে না—নড়ে কি নড়ে না। চোখের তারায় সেই ক্ষীর সাগরের ঢেউ থই থই করছে। বসন্ত গজমোতী নিয়ে ক্ষীর সাগরের বালুর উপর দিয়ে চলেছে; এমন সময় নিতান্ত অরসিকের মত গল্পের রস ভঙ্গ করে একটা হুলো বেড়াল মুখ চাটতে চাটতে ঘরে ঢোকে। সুবালা দেখেই চেঁচিয়ে উঠে, "মাছগুলো খেয়ে এল বুঝি রাক্ষসে।" তাড়াতাড়ি ছুটে যায় সে পাক ঘরে। "যা ভাবছি ঠিক তাই। এমন দস্যি বেড়াল। এত বড় ধামাটা, তার উপর পাটা দিয়ে রেখেছি—তাও ঠেলে মাছ খেয়ে গেল। আলি খেতে দিয়ে গিয়েছিল ওনাকে খলসেগুলি। সুন্দর সরষেবাটা দিয়ে পাতরী করে' রেখেছি, বিকেলে মশুরী ডাল দিয়ে খাবে, তা' খাওয়াল ভালই রাক্ষসে। এই হোলাটার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠলাম।" কিন্তু এত বকুনিতেও হুলোটার গ্রাহ্য নেই। দিব্যি চৌকীর তলায় বসে গোঁফ চাটছে।

আলির কথায় সুখদা এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে ফিসফিস করে' বলে, "আলিরে কিন্তু বড় সুবিধার' লাগছে না আমার চোখে। মেঘীর সঙ্গে যেন একটু কেমন কেমন লাগছে।"

"মেঘী? কালাঠারানের মেয়ে মেঘী!" সুখদার কথার ইঙ্গিতে চমকে উঠে সুবালা। কি দিন কালই পড়লো। তবু সার সার করে দেবকীর বিয়েটা দিতে পেরেছ যে, রক্ষা।

"তারপর কি হ'ল, বল?" কুন্তী অধৈর্য হ'য়ে বলে।

সুখদা সুবালার দিকে তাকিয়ে বলে "তোমার এই মেয়েও হয়েছে একটি। সুখী পিসীর জানা গল্পও শেষ হ'য়ে এল।"

"কেন শঙ্খকুমারের গল্প বাকি আছে। তারপর দুইযার পিঠে খাওয়ার গল্প।"

সুখদা আবার আরম্ভ করে, "গজমোতী আনার সংবাদ পেয়ে রাজকন্যা দাসীকে বলেন—দাসীলো দাসী, কপিলা গাই-এর দুধ আন, কাঁচা হলুদ বেটে আন, আমার সোনার টিয়েকে নাইয়ে দেবো।" টিয়াকে নাওয়াতে নাওয়াতে টিয়ার মাথার ওযুধবড়ি খসে পড়লো। অমনি টিয়ার অঙ্গ ছেড়ে দুয়োরাণী সুয়োরাণী হ'লেন। এই দু'য়োরাণীই শীত বসন্তের মা।"

সুবালার খই বাছা শেষ হ'য়ে যায়। সুখদা উঠে পড়ে "কাল আবার শুনিস বাকিটা। গরু আনতে যেতে হবে মাঠে।"

সুবালা কুন্তীকে বলে, "যা তোর পিসীর ঘরে এই খইয়ের মণ্ডর কটি রেখে আয়।"

সুখদার বাড়ীর পেছনেই কুমোর পটি। কুন্তী সুখীপিসীর বাড়ী থেকে কুমোর বাড়ীতে একটু ঘুরে আসে। সংক্রান্তির মেলার জন্য আহ্লাদী বানিয়ে রেখেছে সারি সারি। কেষ্ট কুমোর বসে বসে তুলি দিয়ে চোখ মুখ আঁকছে মাটির আহ্লাদীগুলির। কুন্তীর তন্ময় চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে খুশির সুরে বলে কেষ্ট, "কি গো পছন্দ হয়?" দু'জনের চোখেই মেলার স্বপ্ন।

ঝাঁকাভর্তি মাটির পুতুল কলসী কাঁখে নীলাম্বরী পরা রাধা, নাড়ুগোপাল, সিংহ, ঘোড়া—খেলার হাঁড়ি, কড়াই, ঝাজুর ছাপনি।

সকাল থেকে নীলপূজোর আয়োজনে ব্যস্ত সুদাম। আগের দিন গেছে হাজরা পূজো। বিয়ে করতে চলেছেন শিব, হাজার দেবতাকে বিয়ের সভায় উপস্থিত থাকার নিমন্ত্রণ জানিয়ে।

অমূল্য ঢাকটা কাঁধে নিয়ে গান ধরে—

"শুন সবে মন দিয়ে
হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হ'বে অধিবাস।"

গোবর দিয়ে লেপা উঠোনের মাঝখানে পূজোর সাজ তৈয়ার করছে মঙ্গলা। আতপ চাউলের নৈবেদ্য কলার মাইজে, বাটাতে তেল সিঁদুর।

উঠোনের আরেকদিকে আম গাছ তলায় বসে হরগৌরী সাজছে লক্ষ্মণ আর অমূল্যর ছোট ভাই কানাই। লক্ষ্মণ সর্বাঙ্গে খড়িমাটি মেখে শিব সেজেছে। ভস্মমাখা দেহে রুদ্রাক্ষের মালা। লক্ষ্মী কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখে। কি সুন্দর মানিয়েছে—সত্যি যেন শিব।

আলিদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। মফির মা রগড়ের সুরে বলে, "কিলো লক্ষ্মী, সোয়ামীরে ত সতীনে লইয়া চল্ল।"

পার্বতী মুখে হর্তেল মেখে সোনার বর্ণ হ'য়েছে। পরনে জামদানী শাড়ি, হাতে বালা উপর হাতে অনন্ত, গলায় পিতলের সাত লহরী। সারা দিন ভরে গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী ঘোরে হরপার্বতী নীল নিয়ে। পথে বিলাসখানের হরগৌরীর সঙ্গে দেখা হয়। তাদের হরপার্বতীর সঙ্গে সখীরাও চলেছে। এ অঞ্চলের সবচাইতে জমকালো দল। জয়ঢাক, ব্যাগপাইপের শব্দে গম গম করে ওঠে সারা গ্রাম। দীঘির জলে ছায়া পড়েছে সখীদের রঙ বেরঙের ঘাগরার। পায়ের মল ঝম ঝম করছে পথে পথে। কুন্তী ইতিকে কোলে

নিয়ে ছোটে পাঁচানীর মণ্ডপের দিকে। সেখানে বিলাসখানের হরপার্বতীর নাচ হ'চ্চে—হরপার্বতীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচছে সখীরা।

চারদিকে দর্শকের ভীড়। একজন মুসলমান ফকির সেজে গাজীর পট দেখাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর মনসাতলার মাঠে কালীনাচ শুরু হয়। ঢাকের তালে তালে কাগজের মুখোস আঁটা বাঘ, ভাল্লুক ও হনুমানের প্রবেশ। সবশেষে মুণ্ডমালিনী মা কালী—লকলকে রক্তবর্ণ জিহ্বা, হাতে রক্তাক্ত খড়্গ। শিশুদের চোখের পলক পড়ে না। মনসাডাঙ্গার একটি মনে রাখার মত সন্ধ্যা। বছরের শেষ দিন। চৈত্রসংক্রান্তির এ রাত।

পরদিন ভোরে উঠে গঞ্জের মেলায় যায় লক্ষ্মণ, সুদাম। সারাদিন পর বিকেলের দিকে বাড়ী ফেরে। একই পথে ফিরছে কেষ্ট কুমার। চোখে মুখে সারাদিনের শ্রান্তি—মাথায় মাটির পুতুলের ঝাঁকা।

সুদাম ডেকে জিজ্ঞেস করে, "কেমন বিক্রী হ'ল ?"

কেষ্ট ম্লান সুরে উত্তর দেয়, "এবার জাপানী পুতুলের দিকেই নজর সকলের।" কেমন একটা পরাভবের বেদনা ধরা দেয় বৃদ্ধ কেষ্টর গলার স্বরে। চোখে ভাসছে—জাপানী পুতুলগুলির জ্যান্ত মানুষের মত হাত, পা—গোলাপী গাল। "আর পুতুলও কি, অবিকল মানুষের মত। আবার পেটে টিপি দিলে ক্যাঁ ক্যাঁ করে ওঠে। তার কাছে আমাদের এ মাটির আহ্লাদী !" করুণ হতাশার সুর স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে কেষ্টর কণ্ঠে। সুদামের মনের তলায়ও একই বিষণ্ণ সুর। তাদের কাঁঠাল কাঠের লাট্টু একটিও বিক্রী হ'ল না এবছর। রঙচঙা জাপানী লাট্টুর কাছে এই কাঁঠাল কাঠের লাট্টু কারও চোখেই পড়ার কথাও নয়। একমাত্র খেলার ঢেঁকিগুলো দিয়ে কিছু রোজগার হ'ল এবছর—আসছে বছর তাও হয় কিনা কে জানে। সমব্যথার চোখে তাকায় সুদাম কেষ্টর মাথার ঝাঁকা ভর্তি আহ্লাদীগুলির দিকে। শেষ বেলার রোদ এসে পড়েছে মাটির আহ্লাদীগুলির গায়ে। যেন খুশিতে ডগমগ করছে পুতুলগুলি।

সুদাম সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে, "জাপানী পুতুলই আসুক আর ফানুসই আসুক, তোমাদের জাত ব্যবসা কেউ খোয়াতে পারবে না। হাঁড়ি, কলসী, ঝাঁজুর, ছাপনি, গরুর গামলা, চারি—মিঞাদের ভাত খাওয়ার মাটির সানকি সব কিছুর জন্যই তোমার দরকার।"

"তাই বা আর কতদিন টেঁকে দেখ। এলোমেনিয়ামের বাসন যে আন্দাজে আসছে বাজারে।"

লক্ষ্মণ প্রতিবাদের সুরে বলে, "কাঁসা, পিতল, এলোমেনিয়াম যাই আসুক না কেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা কার্ত্তিক, গণেশ এঁরা কিন্তু তোমাদের হাত দিয়েই পৃথিবীতে আসবেন। কাজেই হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই।"

হাটবার। মঙ্গলা ভোরে উঠে এক ধামা ঝিঙা তুলে রাখে হাটের জন্য। এক পাঁজা ডাঁটাও কেটে রাখে। সুদাম ডাক দিয়ে বলে, "লঙ্কাগুলো আজ ছিঁড়ো না। আর একটু বাড় হোক, সামনের হাট পর্যন্ত।"

ঘরে বসে একটা কই মাছের জাল বুনছে সুদাম। দুপুর বেলা সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতেই জালবোনা ক্ষান্ত রেখে উঠে পড়ে সে। লক্ষ্মণ বাড়ীর সামনে বেগুন ক্ষেতের জন্য জমি তৈরি করছে। অর্জুনকে ডেকে বলে সুদাম, "যা'ত; লক্ষ্মণকে ডাক দে। এখন রওনা না হ'লে হাটে যেতে যেতে বেলা কাবার হ'য়ে যাবে। আর অমূল্যকে ডাক দে। গামছা বিক্রী করতে যাবে বলেছিল।" হাটের জিনিষপত্র গুছিয়ে দেয় মঙ্গলা। লক্ষ্মণ মিঠ কুমড়োর ঝাঁকাটা মাথায় তুলে নেয়। খালপাড় দিয়ে যেতে যেতে আলিকে ডাক দেয়, "হাটে যাবে না আলি?'

আলি ঘর থেকে বের হয়। চোখভরা ঘুমের আমেজ। "তোমরা যাও, আমি একবার কালাঠারানের বাড়ী হ'য়ে যাব। একছড়া কলা বিক্রী করে দিতে বলেছিলেন।"

লক্ষণ শ্বশুরের অলক্ষ্যে একটু চোখঠারানী দেয় বন্ধুর দিকে তাকিয়ে। লাল হ'য়েই সামলে নেয় আলি। যেন কৈফিয়ত দেবার সুরে আবার

বলে, "রোজগারী মানুষ কেউ নেই—এটা সেটা বিক্রী করেই কোনমতে চলে। তাই আমি বল্লাম, কলাছড়া হাটে নিয়ে বিক্রী করলে কিছু বেশী পয়সা পাওয়া যাবে।"

সুদাম মৃদু হাস্তে বলে, "শুধু কালাঠারাণ কেন, আলির ত পরের সওদা বিক্রী করাটাই বাঁধা কাজ। নিজের সংসারের ত কোনও চিন্তা নেই। চাচাই আছে।"

পথ চলতে চলতে কথার জের টেনে বলে সুদাম, "আমিনুদ্দি আর যখন বিয়ে করলই না, আর এ ঘরেও ছেলে পুলে হ'বার আর আশা নেই, তখন আলিকেই জমিজমাটুকু লিখে দিলে পার তো। সারাজীবন এভাবে পরোপকার করে দিন কাটিয়ে আর কি কোন দিন জোগান খাটতে পারবে আলি? আজ ত চাচার আদরে আছে, দুদিন পর সে চোখ বুজলে চাচী যদি আবার নিকে করে, তখন আলির অবস্থা কি হ'বে?"

নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে বাপ, ছেলে, জামাই—মাথায় হাটের সওদা। পশ্চিমান্তের সূর্যের রোদ এসে পড়েছে চোখেমুখে। আধাপথ যেতেই ঘামিয়ে উঠে সুদাম। লক্ষ্মণ তাকিয়ে বলে, "আমার কাছে দিন ডাঁটার পাঁজাটা।" "অর্জুন, তুই এই জলকচুটা নে।" বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত থেকে বোঝা নিয়ে নেয়। জেলেরাও চলেছে একই পথে। কই মাগুড়ের হাঁড়ির ভার কাঁধে। সুদাম ডেকে জিজ্ঞেস করে, "কত করে কইয়ের কুড়ি?"

"সাত আনা।" জেলেরা দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যায়। দীনবন্ধু মাষ্টারও চলেছে হাটে, সুদামকে দেখে জিজ্ঞেস করে, "পার্থর চিঠি পত্র আসে? কোথায় আছে সে?"

"বক্সা পাহাড়ে। ঠিকানায় লিখেছে কি দুর্গ—না জানি কি। একদিন যাব আপনার কাছে একখানা দরখাস্ত লিখে আনার জন্য। ছোট দারোগার কাছে শুনলাম, সাত আট দিনের জন্য নাকি বাড়ী আসতে দেয়।"

"কালই যেও। সকাল সকাল যেও পাঠশালায় যাবার আগে।"

পথ চলতে চলতে একবার জিজ্ঞেস করে, সুদাম, "আপনি কি কিনতে চললেন ?"

"মেয়েদের জন্য দু'খানা তাঁতের কাপড় কিনবো। আর কিছু সওদা-পত্রও কিনতে হ'বে।"

অমূল্য শুনে বলে, "তাঁতের কাপড় কিনবেন ত আমার কাছ থেকেই নেবেন। জাম রঙের এক জোড়া কাপড় এইত দু'তিনদিনের মধ্যেই তাঁত থেকে নামবে। আশি নম্বরের সুতো।"

"সুতোর নম্বর টম্বর আমরা বুঝিনা। কাপড় টিকসই হ'লেই হ'ল। আর রঙ জাম রঙই হোক আর কাঁঠালের রঙ হোক কিংবা আমের রঙ হোক।"

দীনবন্ধুর কথায় হাসে অমূল্য, "আপনার কাছে রঙ না হ'লেও কিছু নয়। কিন্তু যারা শাড়ি পরবে, তাদের মন বুঝেই আমরা টানার সুতোর রঙে রঙ মিলিয়ে পড়েন টানি। আপনি দু'দিন সবুর করুন, আমি নিজে নিয়ে যাব শাড়ি জোড়া আপনার বাড়ীতে।"

নদীর গা ঘেঁষে গ্রামের হাট। বাঁশ বিক্রী হ'চ্ছে এক ধারে।

সুদাম দু'টো বাঁশ দর করে। গরুর ঘরের বেড়াটা উইতে শেষ করে রেখেছে —এবছরে না বদলালেই নয়।

আলি এরই মধ্যে এসে বসেছে একছড়া কলা আর কিছু মুরগির ডিম নিয়ে। লক্ষ্মণ পাশে এসে বসে। সহাস্যে প্রশ্ন করে, "ডিমগুলো আবার কোন ঠারানের নিয়ে এলে।"

"কোনও ঠারানের নয়। দেখছো না মুরগির ডিম।"

"তবে কোন চাচীর ?"

"মফির মায়ের। নিঃসম্বল মানুষটার জমিটুকু কেমন করে নিয়ে গেল দেখলে ত। ছেলে ছাওয়ালও নেই যে খেটে খাওয়াবে। যা পারি সাহায্য করি।"

হাটের কেনাবেচা শেষ হ'তে সন্ধ্যা নামে। হাটুরেরা বাড়ীমুখে ফিরছে। সুদাম বলে, "তোরা হাঁট, বৃন্দাবনের দোকান থেকে আমি একটু রাবগুড়

কিনে নিয়ে যাই তামাক মাখার জন্য। আলিও ত ওদিকেই যাবে, চল একসঙ্গে যাওয়া যাক। কলা ছড়ায় কত উঠলো?"

"দু' টাকা দশ পয়সা।"

"তা ত উঠবেই। কি খাসা কলা—একেবারে বাটা হলুদের রঙ। কালা ঠারানের বিধবা মেয়ে বুঝি বাপের বাড়ীতেই থাকে?"

"হিন্দুদের বিধবা, তা ছাড়া আর থাকবে কোথায়?" উত্তর দেয় আলি। খানিক দূর গিয়ে বলে, "আপনিত দোকান যাবেন, আমি এই মাঠের মধ্য দিয়ে চলে যাই। টাকাটা দিয়ে আসি। আর এই আনাজগুলোও ওনরাই কিনতে দিয়েছিলেন।"

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথে ঢুকে পড়ে আলি। দীঘির ওপারেই কালা ঠারানের বাড়ী। বেত বনের আড়ালে মিলিয়ে যায় আলির গায়ের ফর্সা কাচা সার্টটা। সুদাম সম্ভ্রমভরা চোখে একটু তাকিয়ে থাকে। সব বাড়ীতেই আলির খাতির। সত্যি খাতির পাওয়ার মতই ছেলে সে।

কালাঠারান খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, "দু' টাকা দশপয়সা পেয়েছ কলাছড়া দিয়ে? আর দুধওয়ালা দেড় টাকা দর করে গেল সেদিন। হাটে নিয়ে বেচলে সব জিনিষের দাম পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ভদ্রলোকদের মধ্যে এমনি বিপদ, না-খেয়ে মরলেও হাটে বাজারে জিনিস নিয়ে বসা চলবে না কোন ছেলের। আর আমার ত সেই বালাই নেই। একটা মেয়ে, তা'ও কি কপাল করে এসেছিল—বিয়ের বছরেই কপাল পুড়ে এল।" আলি বিনয়ী হ'লেও স্পষ্টবাদী। উত্তর দেয় সে, "কপালের আর দোষ কি? এক ষাট বছরের বুড়ের সঙ্গে আঠার বছরের মেয়ের বিয়ে দিলেন।"

কালাঠারান মেয়েকে ডাক দেয়, "ও মেঘী, নে এই সওদাপাতিগুলি নিয়ে যা ঘরে। বাতের বেদনায় আমার হ'য়েছে আরেক কাল।"

মেঘী একটা ধামা নিয়ে আসে ঘর থেকে। আলি পকেট থেকে কয়টা পেয়ারা বের করে। "আমার এক বন্ধুর গাছের এই পেয়ারা কয়টা। মেঘীর

মুখখানার দিকে আড় চোখে তাকায় আলি। আলির সে দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলে মেঘীর। মাত্র একবার। কিন্তু ঐ একটি নিমেষের দৃষ্টিতে কত কথা যে কওয়া হ'য়ে যায়—তা জানে শুধু আলি।

আবার বাড়ীর পথে অন্ধকারে হেঁটে চলে আলি। বুকের মধ্যে কিসের ব্যথা ঠেসে ধরেছে। মেঘীর উপবাসক্লিষ্ট মুখখানা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। মেঘীর মনের সংবাদ অজানা নেই তার। কিন্তু বামুন ঘরের মেয়ের মুসলমান ছেলের সঙ্গে পিরীতের কথা জানা জানি হ'লে আর রক্ষা নেই। কিন্তু এত ভয়ই বা কিসের। মেঘীকে নিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যায় যদি সে। কি এক অনাস্বাদিত সুখের আস্বাদ।

রাতে ঘুমন্ত মায়ের পাশে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদে মেঘী। চোখের জলে চুল ভিজে যায়। উঃ, ভগবান কেন মুসলমানের ঘরে জন্ম হ'ল আলির?

নিজের গর্ভধারিণী মায়ের চোখেও তার দুঃখ কোনদিন ধরা পড়ে না। আর আলি? তার চোখে কিছুই এড়ায় না। সে যে সারাদিন উপোসী তা'ও আজ লক্ষ্য করে গেছে সে। অথচ তার জন্য এত করে সে, তবু মুখ ফুটে একটা কথা বলার সাধ্য নেই তার।

গর্ভধারিণী মা ত নয়, যেন সৎমা। বাপ মায়ের স্নেহ কি জিনিস জীবনে টের পায় নি সে। ঐ মুসলমান ছেলেই একমাত্র ব্যথার ব্যথী তার।

খাল পাড়ে বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে বসেছে মফির মা। ভরা বর্ষার স্রোতের সঙ্গে পানা ভেসে চলেছে খাল দিয়ে নদীর দিকে। ওপারে ধান ক্ষেতের পরিতৃপ্ত বিস্তৃতি। আমিনুদ্দির বাড়ী থেকে রসুন পেঁয়াজ ভাজার কড়া গন্ধ ভেসে আসছে। আলির চাচী ঘাটে আসে জল নিতে। মফির মা বঁড়শির ফাৎনায় নজর রেখে জিজ্ঞেস করে, "কি রান্না বসায়ে এলে। বড় সুঘ্রাণ বের হ'চ্ছে।"

আলির চাচী কলসীটা কাঁকে তুলে নিয়ে বলে, "বাড়ীর মানুষ গেছে তহশীলদার বাবুর সঙ্গে নৌকা নিয়ে। আমি আমার জন্য চারটি কাজির চাল

বসিয়ে এলাম, তারপর আলির জন্য ভাত রাঁধবো। তার ত আবার কাজির রোচে না। হিন্দুদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আধা হিন্দু হ'য়ে গেছে সে। বলে, ওসব পচানি চাল তার সয় না।

মনসা বাড়ী চলেছে মেঘী সুখদার সঙ্গে। কুন্তীও চলেছে সঙ্গে কোলের রোগা বোনটাকে কোলে নিয়ে মনসা বাড়ীর মাটিপড়া নিতে। "দইরায়" ধরেছে মেয়েটাকে—মফির মা একটু লক্ষ্য করে দেখে বলে বিড় বিড় করে।

প্রতি মঙ্গলবারই মনসাবাড়ী আসে মেঘী—জানে আলি। সময় নির্দ্দিষ্ট। নমাজ ঘর থেকে বেরও হয় মোল্লাসাহেব, সাঁকোর উপর মেঘীদের আওয়াজও পাওয়া যায়। একদিনের জন্যও ভুল হয় না আলির সময়ের হিসেবের। তাদের বাড়ীর সামনেই খালপাড়ে একটা পোড়ো মাদ্রাসা ঘর। এককালে মুসলমান ছেলেরা পড়তো সে মাদ্রাসায়। এখন চালাটাই শুধু পড়ে রয়েছে। দরজা জানালা বেড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। আলি একটা মাদুর বিছিয়ে বই নিয়ে বসে সে চালার নীচে। "আন্ধা বন্ধুর" গাথা। এক নিঃশ্বাসে পড়ে যায় আলি। অন্ধ ভিখারীর রাজকন্যার প্রেম, তাও যদি ছাপার অক্ষরে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকতে পারে, তবে, হিন্দুর মেয়ের মুসলমান ছেলেকে ভালবাসা কি অসম্ভব।

কুন্তীর গলার আওয়াজ সাঁকোর উপরে। "কি নড়বরে সাঁকো, এর উপর দিয়ে মেয়ে কোলে কি করে যাই ?"

"আমার কোলে দে তুই ইতিকে।" মেঘী কুন্তীর বোনকে কোলে নিয়ে সাঁকোতে পা দেয়। "বা বাঃ, যা ঠক ঠক করে নড়ছে সাঁকোটা, পড়ে যাবো না ত!"

আলি বই রেখে উঠে আসে। "দাঁড়ান, আমি ধরছি বাঁশটা।" শক্ত করে বাঁশটা ধরে আলি। মেঘী পা টিপে টিপে সাঁকোর উপর দিয়ে হাঁটে। সুখদা মাঝপথে ক্ষেতের ধার থেকে কি শাক তুলে নিচ্ছে।

কুন্তী চেঁচিয়ে ডাকে, "ও সুখী পিসী, শীগগীর এস। আলি ভাই, আর একটু দাঁড়ান, সুখী পিসী এসে নিক।"

মেঘী বলে, "এখনত পার হলাম। যাবার সময় কি উপায় হ'বে। তখন ত অন্ধকারও হ'য়ে আসবে।"

"যাবার সময়ও আমি এখানেই থাকবো।"

মৃদু হেসে উত্তর দেয় আলি। ছোঁয়াচে সে হাসি। মুহূর্তের জন্য চোখে মুখে একটা লাল রক্তের ঢেউ খেলে যায় মেঘীর। কুন্তী আবার ডাক দেয় বিরক্ত স্বরে, "ও সুখী পিসী। তুমি তবে শাকই তোল—আমরা চল্লাম।"

"ওলো এইত আসলাম। কয়টা কলমী ডগা তুলে নিলাম। কালকের রান্নার জোগাড় হ'য়ে যাবে 'খন।"

মেঘীরা মনসা বাড়ীর দিকে চলে যায়—আলি আবার এসে বসে বইখানা খুলে। পল্লীগাঁথার সেই রাজকন্যার চাইতেও অপরূপ হ'য়ে চোখে ভাসছে বার বার মেঘীর এই হঠাৎ রাঙা মুখখানা। তার হাত ধরে যদি সাঁকোটা পার করে দিতে পারতো সে। না জানি কি নরম ঐ বামুন কন্যার রাঙা হাত।

এ পথ দিয়েই যাবে মেঘী। মনসাবাড়ী রয়েছে সে—কিন্তু তার মন বাঁধা রয়েছে এই সাঁকোর ধারে। বই বন্ধ করে ঘরে থেকে একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসে। কোলের উপরের গীতিকাব্যখানার কলিগুলো আওড়াতে আওড়াতে পেনসিল দিয়ে লেখে,

"শাওনিয়া মেঘ শিরে—বজ্র ধরি মাথে
বউ কথা কও বলে কাঁদে পথে পথে।"

ফেরার সময় সাঁকোতে উঠবার সময় মেঘীর দিকে তাকিয়ে বলে ইঙ্গিতভরা দৃষ্টিতে, "কি জানি একটা পড়ে গেল আঁচল থেকে।" মেঘী তাকিয়ে দেখে, ছোট্ট এক টুকরো কাগজ। চোখ তুলে একবার তাকায় সে আলির দিকে। এক সঙ্গে আনন্দ, ভয় ও কৌতুকের বিদ্যুৎ ঝলকে উঠে দৃষ্টিতে। নীচু হ'য়ে কুড়িয়ে নেয় কাগজটুকু—এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে ঢুকিয়ে নেয় সেমিজের মধ্যে।

একটি সপ্তাহ ধরে সহস্রবারও বুঝি আওড়ায় মেঘী ঐ একটি মাত্র ছত্র "বউ কথা কও বলি কাঁদে পথে পথে।" এদিকে খাঁচার পাখীর যে প্রাণ বেরিয়ে এল "আন্ধা বন্ধুর" বাঁশীর স্বরে, সে খবর কেমন করে জানায় সে তার প্রাণের বন্ধুকে। উত্তর লেখে মেঘী একই ভনিতায়।

"বিনোদিনী রাই পাগলিনী প্রায়
শয্যায় দীঘল কেশ জলে ভেসে যায়।"

জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে উঠোনের উপর। পূর্ণিমা আসছে। ঘরে বসে মায়ে ঝিয়ে সুতো কাটছে—পৈতের সুতো। পৈতে বিক্রী ক'রে মাসে দু'টো টাকাও রোজগার হয়। হঠাৎ চমকে উঠে মেঘী—আলির গলার আওয়াজ বাইরে। "কালোঠারান ঘুমিয়েছেন না কি?"

তাদের উঠোনের উপর দিয়েই মনসাডাঙ্গার যাওয়ার সোজা পথ। দুয়ারে এসে বসে আলি।

জ্যোৎস্না ঝলমল করছে তার সর্বাঙ্গে। রাত ত নয়, যেন দিনের আলো। দু' চোখ ভরা ভালবাসা নিয়ে দেখে মেঘী—যেন কোন রূপকথার রাজপুত্র এসে বসেছে তার দুয়ারে।

কালোঠারান সপ্রশ্নে তাকায়, "আজ যে এত দেরি হ'ল বাড়ী ফিরতে?"

"বিলাসখানে গিয়েছিলাম বল খেলা দেখতে। সেখানে শুনে এলাম—দীনবন্ধু মাষ্টারের পদাবলী কীর্তন হ'বে ঝুলনের সময়। আপনারা যাবেন নাকি শুনতে? যদি যান আমি নৌকোর ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমাদের গ্রামের অনেকে যাবে—পার্থর বাবা, মা, লক্ষ্মণের বৌ, পিসী।"

"না বাপু, বিলাসখানে এই বয়সের মেয়ে নিয়ে কীর্তন শুনতে গেলে মানুষে নিন্দা করবে।"

আলি একটু ম্লান হ'য়ে যায়। আর বসে না। উঠে পড়ে সে। "এ খবর দিতেই এসেছিলাম, তবে চলি।"

মায়ের সঙ্গে সুতো কাটছে মেঘী। কিন্তু বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকির

পাড় পড়ছে তার। হঠাৎ কি গরম তাপ বের হচ্ছে ছু' কান দিয়ে। চারদিকে যেন থলথল করছে জ্যোৎস্না। চারদিকের ঝোপ জঙ্গলগুলোও যেন তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। আর আলির চোখের পাতায় এ অপরূপ রাত্রির আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে। মেঘীর দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়ে আলি। একটি কথাও উচ্চারণ করা চলবে না তার। কিন্তু সহস্র কথার তুফান উঠেছে বুক ঠেলে ঠোঁটের প্রান্তে। কত কথা। সারাদিনের কথা। সারা রাতের কথা। সারা সপ্তাহের কথা। সারা মাসের কথা।

ছুয়ারে খিল দিয়ে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে মেঘী। কিন্তু আজ বুঝি সারা রাত জেগে থাকলেও ঘুমের দরকার নেই তার। এতক্ষণে মনসাবাড়ীর সাঁকো পর্যন্ত হয়তো গিয়েছে আলি…পাট ক্ষেতে জ্যোৎস্নার বান নেমেছে…সে জ্যোৎস্নায় ধব ধব করছে তার সাদা সার্টটা, মাথার কালচুলগুলি।……

বিকেলে উঠোনের রোদ সরে গেছে—দিঘিতে স্নান করতে যায় মেঘী। কালোঠারান বলে দেয়, "তাড়াতাড়ি ছু'টো ডুব দিয়েই চলে আসবি। মেয়ে ত নয়, এ আমার ঘরের কালসাপ। রাঁড়ী মানুষের শোকে তাপে কোথায় শরীর ঝরে পড়বে, তা' না, এ যেন দিন দিন কলাগাছটার মত থন থন করে উঠছে শরীর।"

স্বাস্থ্যবতী মেয়ে মেঘী। আঠার বছরের সুঠাম দেহের গড়ন। মাজা পর্যন্ত পিঠ ছাওয়া চুল। গায়ের রঙ কাল হ'লেও নিটোল মুখখানায় সুন্দর একটা স্বাস্থ্যের শ্রী রয়েছে। কিন্তু মেয়ের এত বাড়ন্ত শরীর রুগ্ন মায়ের চোখের বিষ। "অলক্ষুণে মেয়ে। এই মেয়েটা হ'তে হ'তেই বাপকে খেয়েছে। তারপর স্বোয়ামীকে খেল। তা'ও একটু নরম তরম হয় না শরীর।"

মেঘী দিঘিতে নেমে ডুব দিয়ে উঠে। সারাদিনের গুমট গরমের পর দিঘিতে নেমে শরীরটা জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে হয় আরো কিছুক্ষণ জলে থাকে। কিন্তু উপায় নেই। ভিজে গামছাটা গায়ে জড়িয়ে কলসী নিয়ে উপরে উঠেই

হঠাৎ চমকে উঠে মেঘী—জগাই বাড়ুজ্যেটা আবার কখন এসে বসেছে সিঁড়িতে। চুলে পাক ধরেছে, তা'ও কি অসভ্যের মত চাউনি।

মেঘী গম্ভীর হ'য়ে বলে, "যেতে দিন, সরে বসুন।"

"সরে বসতে পারি, রাতে যদি ঘরের কপাটটা খুলে রাখিস।" চটুল কটাক্ষে উত্তর দেয় জগদীশ।

"বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। শীগগীর পথ ছাড়ুন।" ধমকে উঠে মেঘী। কার গলার স্বরে হঠাৎ সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে জগদীশ।

ছাগল খুঁজতে বেরিয়েছে সুখদা। "ছাগলটা যে আবার কোথায় গেল। না কেউ খোঁয়াড়েই দিল।" বিড় বিড় করতে করতে দিঘির পাড়ের দিকে আসে সুখদা। জগদীশ তাড়াতাড়ি বঁড়শির ধারে গিয়ে বসে ভালমানুষের মত।

রাত্রিতে দুয়ারে খিল দিয়ে একটা পাটা এনে ঠেকা দিয়ে রাখে মেঘী। জোরে জোরে বলে, "যা চোরের উৎপাত আরম্ভ হ'য়েছে চারিদিকে।"

কালোঠারানও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না। ঐত কয়খানা কাঁসার বাসন, তাও যদি চোরে নিয়ে যায়। আর এই বর্ষার দিনেই যত চোরের আমদানি হয়। পাট ক্ষেতে লুকিয়ে থাকে চোর।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন বেড়ার বাঁধ কাটছে। কালোঠারান চেঁচিয়ে উঠে, "মেঘী, ওঠত। চোর ত আসছে।"

গলার স্বরে উঠোনের উপর দিয়ে দুপদাপ শব্দ করে চলে যায় চোর—মেঘীও স্পষ্ট শোনে।

ভোরে আলি এসে বেড়ার বাঁধটা শক্ত করে বেঁধে দিয়ে যায়। "বলেন ত অর্জুনকে বলতে পারি, রাতে এসে শোবে ঘরের বারান্দায়।" চিন্তিত সুরে বলে আলি।

মেঘী লক্ষ্য করে বেড়ার সামনে একটা সিগারেটের টুকরো রয়েছে। এক মুহূর্তে বুঝে নেয়, কে এসেছিল রাতে। মায়ের আড়ালে আলিকে বলে, "যে চোর এসেছিল রাতে, সে আমাদের স্বজাতি চোর।" বলে সিগারেটের

টুকরোটা তুলে দেখায়। হঠাৎ লক্ষ্য করে, বেড়ার সঙ্গে দু'টো টাকার নোটও গোঁজা রয়েছে। গম্ভীর হ'য়ে প্রশ্নকরে আলি, "কাকে মনে হয়?"

"জগাই বাঁড়ুজ্যে।"

চমকে উঠে আলি, "তার দেখি ঘর ভর্তি নাতিপুতি ছেলে বৌ।"

"ঐ বয়সেই ত ভীমরতি ধরে পুরুষদের।" ঘেন্নার সঙ্গে উত্তর দেয় মেঘী।

শ্রাবণ মাস। চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। বিলের জল ছাপিয়ে খানাডোবা সব ভরে গেছে। খেতে খামারের কাজ নেই। সারাদিন ঘরে বসে জাল বোনে সুদাম। রাতে মনসা পাঁচালী পড়ে। পূর্ব পুরুষের আমলের জীর্ণ পাঁচালীখানা খুলে বসে। চারপাশে ঘিরে বসেছে বাড়ীর সবাই। পাড়ারও দু' চারজন—অমূল্য, অমূল্যর খুড়ি। সুদাম সুর করে পড়ে চলেছে—

"কিন্তু চাঁদ বলে, মোর প্রভু ভোলানাথ
আর কোনও দেবী নাঞি করি প্রণিপাত।"

নিঃশব্দ নীরব শ্রোতা চারদিকে। ভক্তি ভরে পুঁথির পাতা উল্টায় সুদাম। হারিকেনের পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে পড়ে যায়—

"মনসার সঙ্গে এইরূপ বিবাদ করিয়া
চান্দ সিংহলে বাণিজ্যে চলিল ছয় পুত্র লইয়া—
যখন বাণিজ্যে যায় চান্দ সদাগর
পাঁচ মাস গর্ভে ছিল বালা লখীন্দর।"

সেদিনের মত পাঁচালী পড়া সমাপ্ত হয়। পুঁথিখানা কপালে ঠেকিয়ে তাকে উঠিয়ে রেখে আসে সুদাম। অমূল্য খুড়িকে নিয়ে বাড়ী ফেরে। চারদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। কোথায় কে যে কখন মা মনসার মাথায় পা দেয়। মনে মনে "অস্তিকস্য মুনের্মাতা" মন্ত্র জপতে জপতে পা চালায় অমূল্য। মঙ্গলা হারিকেনটা নিয়ে লক্ষণের পিসিকে সাঁকো পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ তালগাছে একটা মড় মড় শব্দ করে পাতা পড়ে। পর পর দু'টো তাল পড়ারও শব্দ হয়।

"দু'টো তাল পড়লো গো মা।" চেঁচিয়ে বলে লক্ষ্মী। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে অর্জুন, "যাই তাল দু'টো কুড়িয়ে নিয়ে আসি। হারিকেনটা কে নিয়ে গেল?"

সুদাম ডাক দিয়ে বলে, "হারিকেন নিয়ে তোর মা গেছে লক্ষণের পিসিকে এগিয়ে দিতে। হারিকেনটা আসুক তারপর যা। এই অন্ধকারে অমনি যাস না। চারিদিকে এখুন 'লতা'রা ঘুরছে।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে। অর্জুন তালতলার দিকে ছুটে চলে। "হারিকেন আনতে আনতে তাল আমার জন্যে বসে থাকবে না।"

সুদাম ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, "যা'ত লক্ষ্মী। কুপিটা ধরিয়ে নিয়ে সঙ্গে যা। দু' দু'টো ছেলে একই রকম একরোখা। ডর ভয়ের লেশ মাত্র নেই মনে।"

লক্ষ্মী কুপি ধরিয়ে তালতলায় যায়। "একটাত পেলাম। কিন্তু শব্দ হ'ল ত দু'টো। আর একটা কি এরই মধ্যে নিয়ে গেল? কাল থেকে খেজুর কাঁটা দিয়ে রাখবো আমি তালতলায়—দেখি কে তাল চুরি করতে আসে।"

তালগাছটার মাথায় একটা মস্ত পাখীর ডানার ঝটপটানির সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তাল পড়ে। "আর একটু হলে তোর মাথায়ই পড়তো অর্জুন।" দুটো তাল হাতে করে উঠে আসে ছাড়া ভিটা থেকে। চারদিকে বড় বড় পাগলা ঢেকি। সন্তর্পণে পা ফেলে লক্ষ্মী। ঘরে ঢুকতেই লক্ষ্মীর পায়ের দিকে চোখ পড়ে মঙ্গলার, "লক্ষ্মী তোর পায়ে জোঁক ধরেছে—শীগগীর টেনে বের কর।"

অর্জুন জোঁকটা টেনে বের করে দেয়, "ইস কতখানি রক্ত খেয়েছে।"

সুদাম তামাক খেতে খেতে বলে, "যা একটু চুন লাগিয়ে রাখ।"

ভোর বেলা তালগুলো গুনতে বসে মঙ্গলা। অর্জুন একটা তালের আঁঠি নিয়ে বসে সামনে, "মা, তালের বড়া ভাঁজ না।"

"বড়া যে ভাজবো, তেল ত নেই ঘরে। পাত পিঠে করি বরং।"

দুপুর বেলা রান্না সেরে পাত পিঠে করতে বসে মঙ্গলা। তালের গোলার সঙ্গে চালের গুঁড়ো আর গুড় মেখে কলাপাতায় লাগিয়ে লাগিয়ে তাওয়ায় সেঁকে তোলে। কিন্তু মনটায় মায়ায় মোচড় দেয়, তালের বড়া খেতে চাইল অর্জুন। লক্ষ্মীকে ডেকে বলে, "যা'ত লক্ষ্মী, লক্ষ্মীবিলাসের সিসিটা নিয়ে অমূল্যদের বাড়ী থেকে আধসিসি তেল ধার নিয়ে আয়।"

একছড়া কলা পেকেছে—হাটবারের আগেই নামাতে পারবে গাছ থেকে। কলাছড়া বিক্রী করে ধার শোধ করে দেবে। ছেলেমেয়েদের কার অদৃষ্টে যে কি লেখা আছে, কে জানে? পার্থর জন্য মনটা হু হু করে, একটা কিছু ভালমন্দ করতে বসলেই। পার্থও কত ভালবাসতো তালের বড়া। গরীবের সন্তান। জন্মদুঃখী জীবন। কোনদিন ভাল কিছু খেতে দিতেও পারে নি তাকে। বিদেশে পরের কাছেই বড় হ'য়েছে সে। দূর বিদেশেই থেকেছে সে—তবু অসুখ বিসুখে একটা খবরাখবর হ'ত। কোর্টের দুয়ারে শেষ দেখা পার্থর মুখখানা চোখে ভাসে। লক্ষ্মী তেল নিয়ে আসে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে উনানে কড়াই বসায় মঙ্গলা। বড়াভাজার গন্ধে খুশি হ'য়ে রান্না ঘরে একটু ঘুরে যায় অর্জুন, "তেল কোথায় পেলে?"

"অমূল্যদের বাড়ী থেকে ধার নিয়ে এলাম। দেখ দেখি মিষ্টিটা ঠিক হ'ল কিনা?"

সন্ধ্যার পর পাঁচালী খুলে বসে সুদাম। কাজকর্ম সেরে মঙ্গলাও এসে বসে। দেবদেবীর কাহিনীর মধ্য দিয়ে নিজেদেরই জীবনের শোক, তাপ, সুখ, দুঃখ, আশা নিরাশার প্রতিধ্বনি তন্ময় হ'য়ে শোনে সবাই।

কালীনাগ লখীন্দরের বাসরে প্রবেশ করেছে। কালীনাগের কামড়ে সোনার বরণ লখার কালীয়া বরণ হ'ল। বেহুলার নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল। চাঁদ বেহুলাকে ভৎর্সনা করে বলে,

"উচ্চ কপালী বেহুলা লো চিরুণ চিরুণ দাঁতী
বাসরে খাইলা স্বামী না পোহাল রাতি।"

ছয় ছয়টি পুত্র শোকাতুরা সনকার বিলাপে চোখের বান ছুটে চলে মঙ্গলারও। বেহুলা কলার মান্দসে লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে গাঙ্গুড়ির স্রোতে ভেসে চলেছে। পথে শ্বেত কাক, ধোনামোনা ভাকুর মৎসের সব বাধা অতিক্রম করে চলেছে বেহুলা—কোলে মৃত স্বামী।

নিতাই ধোপানীর ঘাট। শ্রোতারা এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এইবার বেহুলার দুঃখের রাত প্রভাত হ'ল। কিন্তু সব দেবতাদের নাচে তুষ্ট করেও মনসার রাগ কমাতে পারে না।

সুদাম সুর করে পড়ে যায়। মনসা অভিমান করে বলছে :—

"মোর সাধ্য নাঞি কন্যা বাঁচত্যে তাহারে
চেঙ্গমুড়ী কাণী বলে তোমার শ্বশুরে।
আমি কোন দেবতা আমারে মানে কে
যথা মন কন্যা তুমি যাহ সে তথাকে।"

পুঁথি বন্ধ করে সুদাম। লক্ষণের পিসি চিন্তিত সুরে জিজ্ঞেস করে, "পদ্মাপুজোর আগে শেষ হবে ত, বেয়াই ?"

"শেষ করতেই হবে। দেবতার পুঁথি পড়া, এত খেলা নয়। সারা রাত জেগে পড়লেও শেষ করতে হ'বে। লখীন্দরের মরা শুনলে, বাঁচন শুনতেই হয়। না হ'লে পাপ হয়।"

"এখন থেকে তবে দুপুর বেলায়ও পড়। শেষে যদি শেষ করতে না পার।" চিন্তিত সুরে স্বামীকে উপদেশ দেয় মঙ্গলা। সেই কোন্ ছোট বয়সে বাল্য শিক্ষা ও বর্ণপরিচয় পড়তে শিখেছিল সুদাম। সেই বিদ্যেটুকুর উপর নির্ভর করে এই দীর্ঘ পাঁচালী পড়ে উঠা। সময় তাই কিছু বেশী লাগে। সুদাম মঙ্গলাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "না, শেষ হয়ে যাবে। এখনওত কয়দিন আছে।"

ভোর বেলা তামাকের বীজ বোনার জন্য উঠোনের এক ধারে হাপোর ঠিক করে সুদাম। গোবরের সার ও ছাইয়ের সঙ্গে একটু হলুদের গুড়ো মিশিয়ে বীজতলার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। লক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, "আর কিছুদিন পরে বীজ বুনলে ভাল হোতো না ?"

সুদাম হাপোরের মাটিতে হাত দিয়ে একটু চাপ দিতে দিতে বলে, "এখন বীজ না লাগালে কার্তিক মাসে চারা লাগাব কেমন করে ? চারা উঠতে অন্ততঃ মাস দুই ত লাগবে।" আকাশের দিকে চোখ বুলিয়ে জামাইকে ডেকে বলে, "একটা হোগলার ছাউনি করে রাখ। মেঘলা মেঘলা লাগে আকাশ।"

শ্রাবণ মাসের শেষ দিন। মনসা সংক্রান্তি। মঙ্গলী স্নান করে এসে পদ্মা-পূজোর আয়োজন করে। কুলোর মধ্যে চাল দিয়ে লখীন্দরের মৃতদেহের প্রতিকৃতি গড়ে' একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। সুদাম পুঁথি নিয়ে বসেছে। আজ লখীন্দরের বাঁচার দিন। ঘটের উপর আমের পল্লব। পল্লবে সযত্নে তেল সিঁদুরের ফোঁটা দেয় মঙ্গলা। ঢাকী এসেছে ঢাক নিয়ে। ছেলে বুড়ো সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে লখীন্দরে বাঁচা দেখতে। ঢাক বেজে ওঠে। কুলোর উপর লখীন্দরের প্রতিকৃতির উপর থেকে মড়ার কাপড়টা সরিয়ে নেয়। সুদাম পড়ে চলেছে। ছয় ভাসুর, স্বামী লখীন্দরকে নিয়ে বেহুলা আবার শ্বশুরের কাছে ফিরে এসেছে। কিন্তু চাঁদ তবু প্রতিজ্ঞায় অটল।

"চাঁদ বলে, কি বলিলি আমার নন্দন
চেঙ্গমুড়ীর কেমনে সে পুঁজিব চরণ
যদি মোর সর্বনাশ পুনর্বার হয়,
তথাপি না পুঁজি আমি কহিল নিশ্চয়,
দুর কর ওরে বাছা বলি এ তোমারে
উহাকে দেখিয়ে ক্রোধ দহিছে শরীরে।"

চাঁদের এ তেজে মনে মনে সম্ভ্রম জাগে অল্প বয়সের ছেলেদের মনে। সুদাম পাতা উল্টায় :—

"দেবী বলে শুন বেউলা কহি এ তোমারে
অপমান করিতে বেউলা আসিলে আমারে
বেহুলা বলিল মাতা না কর ক্রোধমন
অবশ্যসেবিবে শ্বশুর তোমার চরণ।"

দম বন্ধ করে যেন শ্রোতারা সবাই শুনছে। এমন গোঁয়াড় শ্বশুরকে কেমন করে বেহুলা দেবী পূজোয় রাজী করায়।

শেষ পর্যন্ত বেহুলার ধৈর্যেরই জয়। চাঁদ মনসা পূজোয় রাজী হ'ল।

"শিবের সেবা করি আনন্দিত মন
চান্দ বলে পূঁজি এবে চেঙ্গ মুড়ীর চরণ,
পূর্ব্ব দিকে মনসার করিল আসন
পশ্চিম মুখেতে চান্দ বসিল তখন।
জয় ভেবী বল্যে বেহ্যা দেই পুষ্প পানী
তা' দেখয়ে হাসে মাতা জগৎ জননী॥"

শ্রোতারাও একসঙ্গে হেসে উঠে, "তবু দেবী মুখে আসে না। ভেবী।"

"দৈবের নির্ব্বন্ধ ভাই কে করে খণ্ডন
ভেবী বলিতে দেবী বাইরায় চান্দের বদন
পুষ্পজল ধূপ দীপ দিল সদাগর
তুষ্ট হ'ঞে মনসা মা তারে দিল বর।"

মনসা দেবীর উদ্দেশ্যে সবাই ভক্তিভরে প্রণাম করে। লক্ষণের পিসি সবার হাতে হাতে প্রসাদ দেয়—চাল কলা, বাতাসা, আখ, শশা।

লক্ষ্মণ প্রসাদ মুখে দিতে দিতে একবার সুর করে বলে উঠে,

"দেবী কত করবি কর
তবু না কাতর হ'বে চান্দ সদাগর।

পুলিশের কাছে আমাদেরও হ'ল সেই দশা। হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি তবু না ধরি দাস খড়ি।"

মঙ্গলা জলের ঘটি, গাছু গুছিয়ে রেখে বলে, "শুতে যা' লক্ষ্মী। আমি দুয়ার বন্ধ করি।"

সুদাম বারান্দায় তক্তপোষ থেকে উত্তর দেয়, "ও একা ঐ ঘরে শুতে যাবে কি? লক্ষ্মণ না গেল গাজীর গান শুনতে আমিনুদ্দির বাড়ীতে। ও বরং এ ঘরেই শুয়ে থাকুক এখন।"

ঘরের মধ্যে মেঝেতে হোগলার উপর পুরু কাঁথায় রাত্রির শয্যা। বালিশের উপর পাড়ের সুতো দিয়ে কাজ করা বালিশ ঢাকনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক্ষণ ঘুম আসে না মঙ্গলার। লক্ষণ এলে লক্ষ্মীকে তুলে দিতে হ'বে। রাত্রির অন্ধকারে নিশাচর প্রাণীর নানা রকমের আওয়াজ। বাদুড়ের খুটখুট শব্দ।

মুসলমানপাড়া থেকে গাজীর গানের সুর ভেসে আসছে। মঙ্গলা স্বামীকে ডেকে বলে ঘর থেকে, "এ বছর পৌষে একদিল্ পীরের পূজো দিলে পারি আমরা। গরুগুলি কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। একদিল পীড়ের পূজো দিলে নাকি গরুর মঙ্গল হয়।"

"তাত' হয়। কিন্তু খরচ ত কম না। গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান সবাইকেই সিন্নি দিতে হ'বে।"

কি একটু চিন্তা করে বলে সুদাম, "আচ্ছা দেখি, আমিনুদ্দিকে বলে রাখবো ত।"

ভোর বেলা গরুগুলিকে বের করে চারি দিয়ে আসে মঙ্গলা। আর দু'মাস পরই একটা গরু বিয়াবে। মঙ্গলা সস্নেহে একটু হাত বুলায় গরুটার গায়। মনে মনে আবারও মানত করে রাখে, একদিল পীড়ের। গরুই হ'ল চাষীর ডান হাত, বা হাত। গৃহস্থের শ্রী।

উঠোনে বসে তামাক কাটছে সুদাম। ভাত না খেয়ে তবু থাকতে পারে, কিন্তু তামাক না হলে এক দণ্ড থাকা যায় না। লক্ষ্মণ গেছে ধান কাটতে।

উঠোনের উপর দিয়ে জেলে পাড়ার নগা আর তার ভাই চলেছে—কাঁধে ইলিশ মাছের জাল।

খুশির সুরে প্রশ্ন করে, "এবার নাকি নদীতে ইলিশের ঝাঁক আসছে শুনি।"

"কিন্তু মাছ কিনতে গেলেত চার গণ্ডা পয়সার কমে একটা মাছ পাই না।" মুখ তুলে বলে সুদাম। কাঁধে ভেজা জালের ভার, তাই দ্রুত পায়ে হেঁটে যেতে যেতে উত্তর দিয়ে যায় নগা, "আমরা জাল বাই—কিন্তু নদী ত আর আমাদের না। নদী আমাদের হ'লে চার পয়সায় জোড়া ইলিশ কিনতে।"

নগা, নগার ভাই চলে যায়।

সুদাম নিজেই উত্তর দেয়, "আমরা সস্তায় মাছ পাব কি করে'। সব মাছ চালান যায় শহরে। সেখানে নাকি সের দরে মাছ বিক্রী হয়। পালা পানসারায় মাপা হয় মাছ।"

সুদামের কথা শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে লক্ষ্মী। ঘরের পিঁড়ে লেপতে বসেছে সে। গতরাতের ঝড়জলে পিঁড়েটা শেষ হ'য়ে রয়েছে। একটা 'রুয়ার' বাঁধও ছুটে গেছে—সুদাম তামাক মাখা শেষ করে' বাঁধটা শক্ত করে বাঁধে। এই বর্ষাটা পাড়ি দিতে পারলে হয়—ঘরের চালও বদলাতে হ'বে। জায়গায় জায়গায় জল পড়ে। আমন ফসলটা যদি ভাল হয়, ইচ্ছে আছে চার বাঁধ টিন কিনেই চালটা পালটে ফেলবে।

অর্জুন কোথা থেকে এক জোড়া ইলিশ হাতে করে উঠোনে দাঁড়ায়। জেলে পাড়ার কার সঙ্গে 'বন্ধালি' আছে অর্জুনের। সে খেতে দিয়েছে।

লক্ষ্মী খুশির সুরে বলে, "ইলিশের নাম করতে করতেই ইলিশ এসে হাজির।" অর্জুন একই সুরে বলে, "পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও নাকি এ বছরের মত মাছ আসেনি ঝিনাই নদীতে।"

মঙ্গলা সুতৃপ্ত চোখে দেখে মাছগুলো। রুপোর মত ঝকঝক করছে। ছেলেমেয়েদের চোখে ঝরে ইলিশ মাছের তৈলাক্ত আস্বাদ। রান্না ঘরের পেছন থেকে, পাট পচা গন্ধ ভেসে আসছে থেকে থেকে। পাট জাগ

দিয়ে রাখা হয়েছে খালের জলে। মুসলমান পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পাট নিতে বসেছে মফির মা। মঙ্গলা ভাত বসিয়ে খালপার থেকে একটু ঘুরে আসে। "মফির মা নাকি, এই না সেদিন জ্বর থেকে উঠলি, আবার এর মধ্যেই এসেছো পাট তুলতে ?"

"পেটের ব্যবস্থাটাত করা চাই। পাট কয় গাছা নিয়ে রাখতে পারলে সামনের শীতকালে পাটশলা বেচে কিছু পয়সা তবু মিলবে বাবুদের বাড়ী থেকে।"

ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে শীর্ণ দেহ। পাট ছাড়াতে ছাড়াতে বলে সে,

"রথ ভাতার রথ পুত
রথ না থাকলে অদ্ভুত।"

বুড়িরা সবাই এক বাক্যে সমর্থন করে উঠে কথাটা। "ঠিকই বলছো। রথ না থাকলে অদ্ভুত।"

ভাল করে ভোর হয়নি। চারদিকে আবছা অন্ধকার। এখনও চাঁদ রয়েছে আকাশে। দেবকী মাটির গামলায় গোবর গুলে নিয়ে গোবর ছড়া দেয় উঠোনে। দু' চোখভরা শীতের রাতের ঘুম। কনকনে হাওয়া আসছে নদী থেকে। যেমনি ঠাণ্ডা হাওয়া, তেমনি ঠাণ্ডা মাটি। মনে হয় পায়ের তলাটা যেন কেটে যাচ্ছে।

এ অন্ধকার থাকতে থাকতেই স্নান করে' আসতে হ'বে মামী শাশুড়ী উঠবার আগে। এক 'থাদা' খেসারি ডাল ভিজিয়ে রেখেছে বড়ি দেবার জন্য। রোদ উঠার আগে সেগুলো বেটে না রাখলে ফেনানো যাবে না। গোবরছড়া দেওয়া শেষ করে' দুয়ারে জল দিয়ে আন্ধার পুকুরে নাইতে আসে দেবকী। সোমত্ত বয়সের বউ—তাই ঘরের পেছনের অন্দরের পুকুরেই স্নানের ব্যবস্থা।

চারদিকে ঝোপ জঙ্গল। আবছা আবছা অন্ধকার। পাতা পচে পচে সব জেটে হ'য়ে উঠেছে জল। আর তেমনি "কাল্" জল। এক ডুব দিলে দোষ হয়। দেবকী একদমে ছ'টো ডুব দিয়ে উঠে আসে রান্নাঘরের পেছনে। হাতপা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। শুকনো শাড়ীখানা গায়ে জড়াতে জড়াতে আকাশের দিকে তাকায়। সূর্য ঠাকুর একটু রোদ দাও এই ঘরের 'ছঞ্চাতলায়'।

নদীর ঘাট থেকে কুয়াসার উপর দিয়ে মাঘমণ্ডলের ব্রতকথা ভেসে আসছে।

"উঠ উঠ সূর্য ঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া
ইয়লের পঞ্চকাটি শিয়রে থুইয়া
উঠিবেন সূর্য কোনখান দিয়া
উঠিবেন সূর্য গোয়ালবাড়ীর ঘাট দিয়া।"

দেবকী মনে মনে ভাবে কুন্তীও নিশ্চয় এখন তাদের ঘাটে বসে মাঘমণ্ডলের ব্রত করছে। মনের অন্তস্রোত দিয়ে ব্রতকথার সুর বয়ে চলেছে। চুল ঝাড়তে ঝাড়তে গুন গুন করে দেবকী :—

"আসবেন সূর্য বসবেন ঘাটে
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে
পা মেলাইবেন রূপার খাটে
ভাত খাইবেন সোনার থালে।"

চোখের কোণায় কোন দূরের এক কুমারী কন্যার স্বপ্ন নামে। দেবলোকের অঞ্জন লাগে সে চোখে। আচমকা ছিড়ে যায় সে স্বপ্ন কুহেলী। অগ্নিমূর্ত্তি নিয়ে মামী শাশুড়ী এসে দাঁড়ায় রান্নাঘরের পেছনে। "এই তোমার চুল ঝাড়ার জায়গা? ঘরের বৌ না তুমি? বাপ মা কি চলন বলন কিছুই শেখানি?"

দেবকী নিঃশব্দে উঠে এসে বসে হবিষ্যি ঘরের বারান্দায়। ঠানমামীর বকুনি তখনও থামেনি। "চলন বলন শিখবেই বা কোথা থেকে? যেমন ঘরের মেয়ে, তেমনি ত তার স্বভাব পাবে। তা না হ'লে শুধু শাঁখা সিঁদুর

দিয়ে মেয়ে পার করে বাপে ? ভূমালি নাপিতের মেয়ের বিয়েতেও সোনাদানা দেয় আজকাল। খালি শাঁখাপরা হাতগুলো যেন শিকদার বাড়ীর বৌ-ঝিদের মত দেখায়।"

দেবকী তার পিঠছাওয়া ভেজাচুলের উপর একগলা ঘোমটা টেনে ডাল বাটছে। মামী শাশুড়ী সামনে এসে আবার মুখ ঝামটা দেয়। "আরও মিহি করে বাট। গায়ে গতরে ত মর্দের মত। কাজের বেলায় ফুলফুলুনি শহুরে বিবিটি। এমন ফুলবিবির মত কাজ করলে বাপকে বলো একটি দাসী যেন পাঠিয়ে দেয় মেয়ের জন্যে।"

ঘোমটার তলায় বার বার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। আবার ঘোমটার তলায়ই শুকিয়ে যায় সে জল। তার গরীব 'বাবা এদের কাছে প্রতি মুহূর্তের তামাসার পাত্র। সারাজীবন শুধু মুখ বুজে মায়ের গঞ্জনাই সইছে মানুষটি। আবার এখানেও সেই।

দীনবন্ধুর শুকনো মুখখানা ছায়ার মত সামনে এসে দাঁড়ায় যেন বারে বারে। বুকের মধ্যে কি একটা দুর্বোধ্য ব্যথায় মোচড় দেয়। আহা এই পৃথিবীতে কত দুঃখী—তাদের দুঃখ কেউ জানে না। না, ভগবানও জানে না। দাঁতে দাঁত চেপে ডাল বাটে দেবকী। গরীব হওয়া যদি অপরাধ, তবে সবাইকে কেন সমান টাকা দেয় না ভগবান। দেবকী তার মামী শাশুড়ীর হাতের মোটা মোটা অনন্তগুলির দিকে তাকায় ঘৃণা ভরা চোখে। অনন্ত ত নয়, যেন একটা সাপ জড়িয়ে রয়েছে উপরহাতে। হাতে অমৃতি ছাদের বালা, কানে লাল পাথর বসান ফুল, নাকে সাদা 'ওপেল' পাথর, গলায় বিছে হার। কমপক্ষেও দশ পনের ভরি সোনা। পার্থদারা কোন জোতদার বাড়ীতে ডাকাতী করে জেলে গেল। আর এই শাশুড়ী শূর্পনখার গয়নাগুলি ছিনিয়ে নিতে পারতো না।

শুধু কি পার্থদা? এই মামা শ্বশুরেরই আগের পক্ষের ছেলে রয়েছে জেলে। এমন বাপমায়ের কাছে থাকার চাইতে বুঝি সে জেলে থাকাও ভাল। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, এ বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় সেও। কাঞ্চনপুরের স্কুলের

ঘরগুলি অনবরত হাতছানি দিয়ে ডাকে যেন তাকে। স্কুলের ঘর। ঈয়ানী মায়ের আশ্রম—তাঁত……। আর সেই তাঁতঘরে আশ্রয় নেওয়া ফেরার পার্থদা।… স্কুলের বাড়ী… সুপারী গাছের সারি… ব্রহ্মপুত্র… খেয়াঘাট… থানাঘর… চৌকীদার, দফাদার, পুলিশ, দারোগার সঙ্গে কোথায় চলেছে পার্থদা?

আচমকা কেঁপে উঠে দেবকী। যেন হঠাৎ সর্বাঙ্গে আগুন ঢেলে দেয় কে। মামী শাশুড়ী চীৎকার করছে, "খানকীর মেয়ে খানকী, মাথায় কাপড়টা একটু টান। শ্বশুর ভাশুরে আসে যায়। তা'ও লজ্জা সরমের বালাই নেই।"

ডাল বাটা শেষ করে রান্নঘরে এসে মসলা বাটতে বসে দেবকী। ছোট ননদ টুসী মসলার বারকোসটা রেখে যায় সামনে, "বৌদি, বাসী মাছগুলো সরষে বাটা দিয়ে রাঁধতে বল্ল মা।"

বড় ননদ হাসি একটা কাঁসার বেলি নিয়ে বসে, "ভাত হ'য়েছে নাকি? দু'হাতা ভাত দাও ত বেলিটাতে।"

টুসীর মা ভাঁড়ার ঘর থেকে ডেকে বলে, "হাসি একটু ঘি নিয়ে যা।"

বড়লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছে হাসির। তাই তার আদর কিছু বেশী। দেবকীরই সমবয়সী। কিন্তু দেবকী গরীবের ঘরের মেয়ে। তাই খিদেতে পেট জ্বলে গেলেও আড়াইটে তিনটের আগে একমুঠো চাল দিয়েও জলখাবার নিয়ম নেই।

হাসির মা আবার ডাক দিয়ে বলে, "তোর বৌদিকে বল, কয়টা মাছের তেলের বড়া ভেজে দিক তোকে। গরম গরম খা।"

'দো-আখা'র একটা উনুনে ডাল, আরেক উনুনে কড়াই বসায় দেবকী। ননদের জন্য তেলের বড়া ভেজে মাছ বসাতে হ'বে। এক্ষুনি স্কুলের ছেলেরা খেতে আসবে। মামী শাশুড়ীর নিজের ছেলে নেই—বোনের ছেলেরা এখানে থেকে স্কুলে পড়ে।

পাকস্পর্শের দিন থেকে দেবকী এই রান্নাঘরে ঢুকেছে। দশ বারজন

কামলা খায় বাড়ীতে। দশ সের চালের ভরা ডেগ। মাড় গালতে হিমসিম খেয়ে উঠে।

হাসি খেয়ে চলে গেছে এঁটো কাঁটা ছড়িয়ে রেখে। দেবকী এঁটোটা কাঁচিয়ে ঘাটে যায় মাজতে। কামলারা গাছ কাটছে। দেবকীকে দেখে বলে, "বৌঠারান, একটু আগুন দেবেন? এই টিকেটা ধরাতাম। একটু আগুনের জন্য সেই সকাল থেকে তামাক খেতে পারছি না।"

দেবকী কাঠের উনুন থেকে কয়টা জ্বলন্ত কয়লা এনে দেয় আগুন তোলার মাটির হাতা করে'। এদের দেখে মনে হয়, এরা যেন তালপুকুরেরই লোক সব। মনে হয়, এরাই যেন তার আপন জন।

ঢেকির ঘরের সংলগ্ন একটা ধান সেদ্ধ করার ঘর। দেবকীর বিধবা জা আন্না ধান সেদ্ধ করছে। একাদশী গেছে আগের দিন। এতখানি বেলা, মাথার উপরে সূর্য উঠেছে, এখনও ধান সেদ্ধ করছে সে। তারপর কখন বা তার রান্না রাঁধবে, কখন বা খাবে। দেবকীর চাইতে বছর দু'য়েকের বড় হ'বে। মুখখানা শুকিয়ে রয়েছে। মায়া লাগে দেখে। দেবকী এক ফাঁকে এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে কাপড়ের আঁচলে লুকিয়ে দু'টো কলা নিয়ে আসে। "নাও— চুপি চুপি খেয়ে ফেল। আমি পাহারা দিচ্ছি। খোসা দু'টো উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিও।"

আন্না সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে, "কি সর্বনাশ, কোথা থেকে আনলি। মা যদি জানতে পারেন, কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না।"

"ঠানমামী জানতে পারলে বলবো, আমি খেয়েছি।"

"তুই খেয়েছিস জানলেই যেন সাতখুন মাপ হ'বে। এখন শীগগীর সর এখান থেকে। শ্বশুর ঠাকুররা নাইতে গেছেন। তুই তোর রান্নাঘরের কাজ সেরে নে।"

খাবার জায়গা করে রেখে বড় ঘরে এসে পান সাজতে বসে দেবকী। পরিবেশন করে মামী শাশুড়ী নিজে। কার পাতে কি দিতে হয়, ছোট ঘরের মেয়ের নাকি সে বোধ নেই।

কিন্তু আন্নাদি ত কলা হু'টো খেল না। এখন এগুলো ত আর কলার ছড়ায় জুড়ে রেখে আসা যায় না। আর এমনি রেখে এলেও রক্ষা থাকবে না। দেবকী এদিকে ওদিকে লক্ষ্য রেখে পান সাজতে সাজতে কোন মতে গিলতে থাকে কলাগুলো। খোসাগুলো সেমিজের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে। কিন্তু কি সর্বনাশ। কার পায়ের শব্দ! মুখভরা মর্তমান কলা, আর বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবে আজ বাড়ীর কর্ত্রী। মনে মনে মা কালী, মা কালী জপছে আর ঘোমটার ভিতরে আধা চিবান কলা গিলছে দেবকী। কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে আন্না। "কেমন আগেই বলেছিলাম না?"

আন্নার গলার স্বরে প্রাণে জল আসে। "বড়দি তুমি?"

"বড়দি তুমি?" গলার স্বর নকল করে বলে আন্না "বল্ আর কোনদিন এ রকম কাজ করবি না।"

"আমি কি নিজের জন্ম করেছিলাম। কাল থেকে এক ফোঁটা জল পড়েনি তোমার মুখে।"

"এখন টের পেলি ত, এ ভাবে চুরি করে কলা গেলা কেমন লাগে।"

হুয়ারে খড়মের শব্দ। আন্না তার কাপড় গামছা নিয়ে নাইতে চলে যায়। মামা শ্বশুর ঘরে ঢোকে। দেবকী মাথার কাপড় টেনে পানের খিলিটা হাতে দেয়। দূর থেকে লক্ষ্য করে হাসির মা। শ্বশুর চলে যেতেই রণরঙ্গিণী মূর্তি নিয়ে ঘরে ঢোকে, "কতদিন তোমাকে বলেছি না, হাতে হাতে পান দেবে না শ্বশুরকে।"

একই মূর্তি নিয়ে স্বামীর ঘরে ঢোকে। এ ঘর থেকেও মামীশাশুড়ীর সবগুলো কথাই কানে আসে দেবকীর। একই সুরে বলে চলেছে, "এখন বুঝতে পারছি, কেন এমন হাভাতের ঘরের মেয়ে এনেছ ভাগ্নের জন্ম। বেশ্যা মাগী,—শ্বশুরের সঙ্গে পর্যন্ত......" বাকী কথাটা আর শুনতে পারে না দেবকী। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে সে ঘর থেকে। রান্নাঘরের খুঁটিটা ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেবকী। কি লজ্জা। কি ঘেন্নার কথা। কামলারা সব খেতে

বসেছে উঠোনে কলাপাতা বিছিয়ে। এখুনি ভাত দিতে যেতে হ'বে তাদের। দেবকী যেন অবশ হাতে ভাতের গামলাটা নিয়ে বের হয়। তবু এ সংসারে এই একমাত্র কাজ, যা করে আনন্দ পায় সে। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পরিবেষণ করে সে লাল চালের ভাত, খেসারি ডাল আর কুচোপুটির চচ্চরী। একটি অবধি ভাত খুঁটে খায় কামলারা। সস্নেহে তাকিয়ে দেখে দেবকী। দিনভর গতরখাটান ক্ষুধা যে কি জিনিষ, জানে সে। ঘোমটার তলায় দু'চোখে উপছে পড়ে তার সে প্রীতির ধারা। এই খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গেই তার মনের গাঁঠছড়া বাঁধা।

কামলারা আড়ালে বলাবলি করে, "এ বাড়ীর রাজেন বাবুর বৌ বড় মায়াবতী।"

"কিন্তু রাজেন বাবুকে ত দেখি না কদ্দিন হ'ল?"

"তা'ও জান না। তিনি গেছেন দাঁড়িয়া বান্ধা খেলতে কাঞ্চনপুরে।"

দেবকী এঁটো বাসনের পাঁজা নিয়ে চলেছে ঘাটে। কামলারা মমতার চোখে দেখে। বড়লোকের বাড়ীর বৌ হ'লে কি, তাদের চাষীর ঘরের বৌ ঝিদের থেকে খাটুনি কোন অংশে কম নয়। তার উপর বিধবাদের ত দুঃখের আর শেষ নেই।"

আন্না তার বোথনা আর বাউলি নিয়ে ঘাটে যায়। দুই জায়ে বসে বাসন মাজতে মাজতে নিরিবিলি দুঃখের আলাপ করে। কর্ত্রী পান দোক্তা নিয়ে বসেছে এখন পশ্চিমের বারান্দার রোদে। আন্না বোথনাটা মাজতে মাজতে বলে, "আজ ত ঠাকুরপোর বাড়ী আসবার কথা। সাতদিন পর বাড়ী আসবো, আজ রাতে আর ঘুমাতে দেবে না তোকে। বাসন মেজে রেখে তোর ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে। মা ওঠার আগেই ডেকে দেবো আমি।"

কথার ইঙ্গিতে লাল হ'য়ে উঠে দেবকী। সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনার ছায়া ফেলে যায় মুখের উপর দিয়ে। হঠাৎ প্রশ্ন করে, "বড়দা তোমাকে খুব ভালবাসতেন, তাই না বড়দি?" দেবকীর এ মধুর জিজ্ঞাসায় দুটি চোখ জলে ভরে উঠে আন্নার। পুকুরের উত্তর পাড়ে একটা ডাহুক পাখী ডুকরে কাঁদছে।

যেন তারই বুকের কান্না ভেসে চলেছে ঐ অন্ধকার ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে।

চোখ মুছে আন্না। "এই হাড় ভাঙ্গা খাটুনি আর সৎ শাশুড়ীর গঞ্জনা—সব জুড়িয়ে দিত ঐ একটি মানুষ। বিশ্বাস করতে পারবি না—এমন বাড়ীতে কি ছেলে জন্মেছিল। যদি দেখতিস। আমার শাশুড়ীও নাকি ছিলেন মা-লক্ষ্মীর মতন। ঠাকুরপোও ঠিক বড় ভাইয়ের স্বভাবটি পেয়েছে। সে জন্যইত টিকতে পারলো না এ বাড়ীতে। মানুষ কথায় বলে না, দ্বিতীয় পক্ষ—শ্বশুরের হ'য়েছে সেই দশা।"

গলার স্বর আরও নামিয়ে বলে, "এই এক বছর হ'য়ে গেল জেলে রয়েছে সুলক্ষণ ঠাকুর পো, এর মধ্যে একদিনের জন্যও দেখতে গেল না ছেলেকে।"

ব্যথায় করুণ হ'য়ে উঠে কাল চোখ দু'টি। গল্পের মত মনে হয় দেবকীর। এই মামী শাশুড়ী আর তিন কন্যার মাঝে সুদর্শন, সুলক্ষণ—যেন শীত বসন্ত দুটি ভাই। হাসি, পুসি, টুসি, তিন বোন পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়ায়। হাতে চালতে, টোপরে পাকাকুল, কাচা লঙ্কা, ধনে পাতা।

"তোমরা কি আজ রাত পর্যন্ত বাসন মাজবে নাকি?" একটু ফোঁড়ন দেওয়া সুরে বলে হাসি। মায়ের ঘর থেকে এক ঘুম দিয়ে এল সে।

পুসি খুশির সুরে বলে, "উত্তরের বাড়ীর ছাড়া ভিটের চালতে। ছোট বৌদি বাসন মাজুক। বড় বৌদি, তুমি চল।"

ঢেকির ঘরে বসে চালতে কেটে, ঢেকিতে পাড় দিয়ে পাথরের 'খাদায়' ডলে ডলে লঙ্কা দিয়ে মাখে আন্না। কলাপাতা হাতে ঘিরে বসেছে তিন ননদ। "আর একটু ঝাল দাও, বৌদি।"

"বাবাঃ, কি ঝাল খেতে পারে বড়দি।" টুসি শিসাতে শিসাতে বলে। আন্না উত্তর দেয়, "ঝাল খাবে না বড়দি? ওর বিয়ে হ'য়েছে লঙ্কার কারবারীর সঙ্গে।"

দেবকী বাসনের পাঁজা রান্নাঘরে রেখে আসে। আন্না ডাক দেয় "আয়লো দেবী, একটা কলাপাতা নিয়ে আয়।"

চালতে মাথা খেতে খেতে হঠাৎ সবাই ছুটে চলে মধ্যের উঠোনে—বহুরূপী এসেছে।

কোলকাতার বাইজী সেজে এসেছে বহুরূপী। আম্না, দেবকী দালানের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখে। বহুরূপী ব্যাটার রুমাল নেড়ে নেড়ে নাচের কি বাইজীওয়ালী ঢং। কামলারা নিড়ানি হাতে উঠে এসেছে বাগান থেকে। হেসে কুটিপাটি হয় তারা। আবার চোখেরও কত টেরচা চাউনি।

রাত্রিতে আবার ঝমঝম করে মল বেজে উঠে উঠোনে। এবার শ্মশান-কালী। মিশকাল কালীমূর্তি।

"না ভালই সেজেছে বহুরূপী।" তারিফ করে কর্ত্রী ঠাঁরান।

আবার আরেক গ্রামের দিকে চলে যায় বহুরূপীর দল। অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায় শ্মশান কালীর পায়ের মলের ঝমঝম শব্দ। দেবকী উঠে আসে রান্নাঘরে। বসে বসে ভাতের জালানি ঠেলে। পেতলের ডেগে ভাত ফোটার শব্দ। ঘরের কোণায় কুপির পলতেটা নড়ছে। সে আবছা আলোয় তার নিজের শরীরের ছায়াটাই কেমন অদ্ভুত দেখায়। একটা বেড়াল কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রয়েছে আরেকটা উনুনের গা ঘেসে। ঘুমভরা চোখে দেখে দেবকী বেড়ালটাকে—তার বাপের বাড়ীর রঙ্গি বেড়ালটার মতই দেখতে। চোখ ঠেসে ঘুম আসছে। বারবাড়ীতে দাবা খেলতে বসেছে বাবুরা। কতরাত পর্যন্ত তাদের খেলা চলবে, ততক্ষণ এই একঠায় বসে থাকতে হ'বে উনুনের পাশে। দেবকী উঠে গিয়ে তার বাক্স থেকে পার্থর দেওয়া "চলার পথে" খানা নিয়ে এসে বসে। তার ছোট্ট পোর্টম্যানটিতে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছে বইখানা। কাঠের উনুনে গরুর ভাত ফুটছে। আউস ভাতের গন্ধ। মাদার কাঠের দাউ দাউ শিখা। আর কোলের উপর চলার পথের জলন্ত অক্ষর। চোখের ঘুম কেটে যায়—চোখের পলক পড়ে না। ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলে। যেন দম না নিয়ে পড়ে চলেছে সে।...খাদের দিকে মটর চালিয়ে চলেছে তারই বয়সী এক কলেজেপড়া মেয়ে।...তারপর? চোখের

তারানড়া থেমে গেছে দেবকীর। যেন চোখের সামনে দেখছে—সেই পাহাড়ের খাদের অতল তলায় চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে মটরটা···আর···

হঠাৎ কার ছায়া দেখে চমকে উঠে দেবকী। একি রাজেন কখন এসেছে—কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে!

একটা বিড়ি ধরাতে এসেছে সে উনুন থেকে। একটু মুরুব্বীর সুরে বলে, "কি লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল পড়া হ'চ্ছে বুঝি?"

রাজেন বিড়িটা ধরিয়ে নিয়েই বেরিয়ে যায়। বন্ধুরা সব বসে রয়েছে তাসের আসরে। বইটা সেমিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে দেবকী। একটা মস্ত ফাড়া কাটলো যেন তার। ভাত ফুটে গেছে। ডেগটা নামিয়ে উনুনে গোবর দিয়ে রাখে। চলার পথের সেই দুঃসাহসী মেয়ের আত্মবলির রেশ ঘিরে রয়েছে তাকে।

গভীর রাতে একঘুমের পর জেগে দেখে, রাজেন টর্চ-দিয়ে তার বাকসো ঘাটছে। দেবকীর মাকড়ি জোড়া আত্মসাৎ করার মৎলব ছিল। কিন্তু শাড়ি সেমিজ ঘাটতে ঘাটতে শাড়ির ভাঁজ থেকে একখানা বই বেরিয়ে পড়ে। যেন ভূত দেখার মত হঠাৎ থমকে উঠে রাজেন। নাটক নয়, নভেল নয়, কবিতাও নয়—সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বই 'চলার পথে'! এ বইই তবে রান্নাঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছিল কাল। কি দুঃসাহস! এ বাড়ীর উপর যে পুলিশের নজর আছে তা'ও অজানা নেই ওর। সুলক্ষণদা রয়েছে জেলে। যে কোনও মুহূর্তে খানাতল্লাসী হ'তে পারে ঘরদোর। এ বই তাদের চোখে পড়লে, একদিনের জন্যও এ বাড়ীতে স্থান দেবে না মামামামী।

দেবকী উঠে বসেছে বিছানায়। কঠিন হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি। গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, "আমার বাকসো খুলেছো কেন?"

দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করে রাজেন, "এ বই কোথায় পেলে, বল। কে এনে দিয়েছে?"

"বিয়ের আগেই আমার ছিল। আমার এক দাদা পড়তে দিয়েছিল।"

"তা'ত দেবেই। যত ভ্যাগাবণ্ড স্বদেশীওয়ালার চাঁইত তোমাদের গ্রামেই।" মুরুব্বীর সুরে বলে' চলে রাজেন, "ব্রিটিশদের তাড়াতে চায় স্বদেশীওয়ালারা, কিন্তু এই ইংরেজরা না আসলে আমরা আজ কুয়োর ব্যাঙ হয়েই থাকতাম। আজ দু'পাতা লিখতে পড়তে যা কিছু শিখেছ, তা ঐ ইংরেজদের কৃপায়ই।" এক দারোগার কাছে শোনা কথা হুবহু মুখস্ত বলে রাজেন স্ত্রীর কাছে।

দেবকী অদ্ভুতভাবে তাকায় রাজেনের মুখের দিকে। এসব কি বলছে সে? এগার বার বছরের ছেলে সাথীও জানে ইংরেজরা যে দেশের শত্রু। আর আই, এ পড়া ছেলের মুখে শুনছে সে—ইংরেজরা না আসলে কুয়োর ব্যাঙ হ'য়ে থাকতো ভারতবাসী। প্রতিবাদের সুরে উত্তর দেয় দেবকী, "ইংরেজরা যদি দেশের বন্ধুই হবে, তবে গান্ধীজীর মত অতবড় একজন মানুষ তাদের বিরুদ্ধে বলতেন না।"

স্বামীর মুখের উপর এভাবে জবাব দেবে ঘরের বৌ, কল্পনাও করতে পারে না রাজেন। যুক্তিতে হেরে গিয়ে আহত পৌরষ আরও গর্জে উঠে। টিটকারীর সুরে উত্তর দেয়, "ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েই এত গুমর? আই, এ, বি, এ পাশ করলে যে আর মাটিতেই পা দেবে না।" দেবকী আর উত্তর দেয় না। তার এই চুপ করে থাকায় আরও জ্বলে উঠে সর্বাঙ্গ। বৌ মানুষের এত তেজ সহ্য করার মত ছেলে নয় রাজেন সরকার।

পরদিন রাতে বসে বসে একই নিয়মে ভাতের 'জাল' ঠেলছে দেবকী, বাবুরা দাবা নিয়ে বসেছে, কর্ত্রী সুপুরী কাটছে মধ্যের ঘরে, আম্মা সলতে পাকাচ্ছে আর ছেলেরা পড়তে বসেছে হারিকেনের সামনে। তাদের পড়া শেখার সুর রান্নাঘর পর্যন্তও ভেসে আসছে। আর মাঝে মাঝে একটা নিম পেচার ডাক। জানলার বাইরে হিমেল অন্ধকার। হঠাৎ আজও ঘরের বেড়ায় দীর্ঘ ছায়া দেখে চমকে উঠে দেবকী। পিছন ফিরে দেখে রাজেন দাঁড়িয়ে—হাতে তার 'চলার পথে'খানা। দেবকী অনুরোধের সুরে বলে, "বইটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি সাথীর কাছে পাঠিয়ে দেবো—এখানে রাখবো না।"

"ফিরিয়ে দিচ্ছি।" গম্ভীর স্বরে ব্যঙ্গোক্তি করে রাজেন। "এই নাও।" বলে জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় বইটা।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে দেবকী। "এ কি করলে?" সঙ্গে সঙ্গে সেও হাতটা ঢুকিয়ে দেয় উনুনের মধ্যে। কিন্তু ধরবার আগেই আগুনের দাউ দাউ শিখায় কাল হ'য়ে উঠে চলার পথের কাল অক্ষরগুলো।

দেবকীর কাণ্ড দেখে ধমকে উঠে রাজেন, "এ সব কি ঢং হচ্ছে। হাতটা পুড়বে না?"

কিন্তু ততক্ষণে হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। রাজেন আরও অগ্নিমূর্তি হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, "দেখি এ হাত নিয়ে কেমন করে কাজকর্ম কর তুমি?"

নিশ্চল হ'য়ে দেখে দেবকী—উনুনের জ্বলন্ত অঙ্গারের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার পার্থদার দেওয়া এত সাধের বইখানা। দু' চোখ জলে ভরে উঠে। চারদিকে নিথর নিস্তব্ধ অন্ধকার। একা ঘরে ফুপিয়ে কাঁদে দেবকী। উঃ পার্থদা, তোমার জেলখানা থেকে কি শুনতে পাচ্ছ দেবকীর এ দিনে রাতের ডাক। পার্থদা, একটুও মায়া হ'ল না তোমার?

ভাত ফুটে গিয়েছে, মাড় গালতে হবে। কিন্তু হাত যে জ্বলে যাচ্ছে। অতি কষ্টে ভাতের মাড় গেলে উনুন লেপে রাখে। পরদিন উনুনের ছাই তুলবার সময় টপ টপ করে চোখের জল পড়ে ছাইয়ের উপর। যেন চলার পথের সেই কাল মেয়েটিও রয়েছে এ ছাইয়ের মধ্যে।

দুপুর বেলা বাসন মাজতে বসে কট কট করে জ্বলে উঠে পোড়া ঘা। আন্না দেখে চমকে উঠে, "এ কি, করেছিস কি? ভাতের ফ্যান পড়ে গিয়েছিল বুঝি হাতে? তুই বোস, আমি মেজে দিচ্ছি বাসনগুলো। তারপর একটা ডুব দিয়ে উঠবো। রাজু ঠাকুরপো'কে দেখিয়েছিস?"

রাজু ঠাকুরপোকে দেখাব! মনে মনে বিদ্রূপের স্বরে প্রতিধ্বনি করে কথাটা। তবু কিসের আবেগে কৃতজ্ঞতায় চোখের পাতা ভিজে আসে দেবকীর। "বড়দি, আগের জন্মে তুমি বোধ হয় আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে।"

আন্না সস্নেহে হাসে। "রাত্রে শোবার আগে আমার কাছে আসিস। আমি একটা ওষুধ বানিয়ে রাখবো তোর জন্য।"

দেবকী অভিভূত সুরে প্রশ্ন করে, "বড়দি তোমার বাপের বাড়ীতে কে কে আছে ?"

"কেউ থাকলে কি আর এই কপাল নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছি। মা বাবাকে জ্ঞান বয়সে দেখিনি। আর একটি ভাই ছিল। সেও তিন বছরের হ'য়ে মারা যায়।" আন্নার বাসন মাজা শেষ হয়। "নে তুই কলসীটা নিয়ে যা কাঁখে। আমি একটা ডুব দিয়ে আসি।"

শীতের বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। একটু দয়া হয় বুঝি সূর্য ঠাকুরের। ঝোপজঙ্গলে ঘেরা আধা অন্ধকার এই পুকুর পাড়েও এক ফালি রোদ এসে পড়ে এক হিজল গাছের ফাঁক দিয়ে। রোদটুকুতে বসে চুল শুকায় আন্না। দেবকী দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। একটা গাভীর ডাক ভেসে আসছে মাঠ থেকে। আকুল অন্তস্পর্শী সে ডাক। "আহা গরুটা নিশ্চয় বাছুরটাকে খুঁজছে।" কি ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠে আন্নার বুকের ভিতরে। চোখের পাতাদুটিতে কোন হারানো দিনের সুর যেন জন্ম জন্মান্তরের বেদনা নিয়ে জমাট বাঁধছে ধীরে।

দোলপূর্ণিমা। পাঁচ আনিদের দোলমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। হাতে সোনার বাঁশী, মাথায় সোনার চূড়া, গলায় সাত লহরী, হাতে রতনচূড়। বানারসীর আঁচলে জড়ির মনোরম কারুকার্য। আবিরে লেপা দোলমঞ্চ। ফাল্গুনী আকাশে জ্যোৎস্নার প্লাবন। অদূরে কোন কুঞ্জশাখে "কোকিলা ডাকিছে কুতুহলে।" যেন চিরযুগের মধুর মূর্তিমতী হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এ মিলন মূর্তির অন্তরাল দিয়ে বয়ে চলেছে চিরযুগের বিরহ সঙ্গীত।

কীর্তন পাগল এ দেশ। কীর্তনের নামে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ছুটে এসেছে ছেলেবুড়ো, স্ত্রী, পুরুষ। মণ্ডপের সামনে সামিয়ানা টাঙান। দিঘিরপাড়, তাল

পুকুর, মনসাডাঙ্গা, শ্যামগঞ্জ আরও বহু দূর দূর গ্রাম থেকে ভক্ত শ্রোতারা এসেছে দীনবন্ধু দাসের কীর্তন শুনতে। রাত ভরে লীলাকীর্তন হ'বে।

শ্রীখোলে মালাচন্দন দিয়ে প্রণাম করে আসরে উঠে দাঁড়ায় দীনবন্ধু।

সরকার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেবকীও এসেছে কীর্তন শুনতে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দু' চোখ ভরে দেখছে সে তার বাবাকে। সাদা পাঞ্জাবীর উপর সাদা মালা। শুদ্ধ, সমাহিত মূর্তি। গৌরচন্দ্রিকা শুরু করে দীনবন্ধু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রের মধ্য দিয়েই কৃষ্ণলীলা অনুভব করার যোগ্যতা লাভ হয় ভক্তের।

ভাবে বিভোর আজ দীনবন্ধু। ধ্যানী শিল্পীর দৃষ্টিতে অপার্থিব তন্ময়তা। তার চারপাশে এ শ্রোতৃমণ্ডলীর মাঝে সেই ব্রজরাখাল, ব্রজ গোপীদেরই দেখছে সে। সেই গোষ্ঠ সখীদেরই কাছে রাধার বেদনা সুর মূর্ছনায় ভেঙে পড়ছে,—

"কুসুম ত্যজিয়া অলি মহীতল লুঠত,
কোকিলা না কর তহি গান।
সোহি যমুনা জল অনল সমান,
বাঁশী স্বরে না বহে উজান।
সখাগণ, ধেনুগণ বেণুরব বিসরণ।"

প্রিয় বিধুরা বাংলার আকাশে বাতাসে আজ মাথুরেরই সুর বয়ে চলেছে। সেই ব্রজপুরীরই বিলাপাশ্রু আজ বাংলার শূন্য প্রান্তরে। তাই বিরহ-কাতরা রাধার বিলাপে চোখ মুছছে সুদাম, চোখ মুছছে মঙ্গলা। দীর্ঘ ঘোমটার তলায় দেবকীর চোখদুটিও রাঙা হ'য়ে উঠেছে একই সঙ্গীত মূর্চ্ছনায়। গেয়ে চলেছে দীনবন্ধু,—

"সই কে যাবে মথুরাপুর
এ হেন যাতনা, তারে নিবেদিয়ে
তবে পরিহর দূর।"

অমনি করে কাঁদতে পারতো যদি দেবকী। "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

কাঁদে বুঝি দেবকীরও প্রতি অঙ্গ। তারই বুকের তলার জমাট বাঁধা বেদনাগুলিই বুঝি বয়ে চলেছে এ সুরের স্রোতে—এ রাগ তরঙ্গে।

"শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরি।"

চারদিকে জ্যোৎস্নাস্নাত বন বনানীও বুঝি এ সংগীত আসরের বিমুগ্ধ শ্রোতা। কোকিলের স্বর থেমে গিয়েছে। বুঝি মুগ্ধ হ'য়ে শুনছে সেও রাধার কাহিনী। দীনবন্ধুর রেশদার সুরেলা কণ্ঠস্বরে কি ঐন্দ্রজালিক মাধুরী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিটি পদে এক অপরূপ লাবণ্য ঢেলে দিয়ে চলেছে গায়ক। নির্ভুল উচ্চারণ আর গম্ভীর স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে কোন এক অবিস্মৃত যুগের বেদনার রেশ।

"সই কে যাবে মথুরাপুর। এ হেন যাতনা তারে নিবেদিয়ে তবে পরিহর দূর।"

আত্মবিস্মৃত শ্রোতৃমণ্ডলী। দু নয়নে অশ্রু বয়ে চলেছে। গেয়ে চলেছে দীনবন্ধু। কণ্ঠস্বর ত নয়, যেন একখানি দেহরূপী ক্রন্দন, যেন একখানি সুরবতী বিরহ ভেসে চলেছে লীলাকীর্তনের সকরুণ মাধুরীতে ভর করে।

যেন শ্রীরাধিকাই গাইছেন। আপনার সুরস্রোতে ক্ষণিকের জন্য বিবশ হ'য়ে আবার সুরমণ্ডলে বিদীর্ণ হ'য়ে চলেছে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা।

"ললিতা লহ কঙ্কণ, বিশাখা লহ অঙ্গুরী, চিত্রা লহ নীলমণিচূড়।"

অশ্রুমতী গাঁথা। কিন্তু রাধার এ বেদনা এ ত পার্থিব বেদনা নয়। এ যে সাধক চিত্তের মরমিয়া অনুভব।

"মরম না জানে, ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।"
"আমি কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপেছি তিল তুলসী দিয়া।"

তিল তুলসী দিয়ে যে দান, তা' যে আত্মবিলুপ্ত সর্বস্বদান। কিন্তু এমন

সর্বস্ব সমর্পণ করেও মাঝে মাঝে বুঝে উঠে না রাধা, যার জন্য তিনি কুলমান সব ত্যাগ করেছেন, তিনি কে?

"পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।"

ভগবানের লীলাই ত এই। দেখা দেন দেন, আবার হারিয়ে যান। এমনি করে যুগ যুগ ধরে তিনি ভক্তকে কাঁদিয়ে চলেছেন। রাধাকে কাঁদিছেন, মীরাকে কাঁদিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যকে কাঁদিয়েছেন। গণ্ডস্থল বেয়ে নয়নাশ্রু পড়ছে দানবন্ধুর। আকুল হ'য়ে কাঁদছে শ্রোতারা কি এক দুর্বোধ্য ব্যথায়। জীবনও ত এই বিরহ মিলনেরই গীতিময় দর্শন। এ চকিৎ বিদ্যুৎ প্রভা যুগ যুগ ধরে পথ দেখিয়ে চলেছে ভক্তকে। রাধাতত্ত্ব সেই জ্ঞানমার্গেরই পথপ্রদর্শক।

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না
চিহ্নয়ে তারে,
প্রেমের আরতি যে জন জানায়
সেই সে চিনিতে পারে।"

কীর্তন শুনে বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত শেষ হ'য়ে আসে। দেবকী বাড়ী এসে গোবর ছড়ার গামলা তুলে নেয় হাতে। দু' চোখভরা কীর্তনের রেশ। মনের মধ্যে এখনও আকুলি বিকুলি করছে কীর্তনের সুর। থেকে থেকে গর্বে ভরে উঠছে বুকখানা। এত ভাল গেয়েছে তার বাবা। কতজনে যে সুখ্যাতি করছিল গানের। আবার তিন আনি থেকেও বায়না করে রেখেছে—সামনের বৈশাখী পূর্ণিমায় তিন পালা গাইতে হ'বে সেখানে। মানভঞ্জন, প্রবাস আর দান।

বাসনের পাঁজা নিয়ে ঘাটে চলে দেবকী। মনের তলায় মৃদু খুশির সুর। এত কাছে এসে বাবা নিশ্চয় তার সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না।

আচমকা সে খুশির সুর ছিঁড়ে যায় রাজেনের কর্কশ কণ্ঠস্বরে। "বাস

থেকে নেমেই শুনলাম, আমার শ্বশুর নাকি কাল রাতে কীর্তন গেয়ে গেছে জমিদার বাড়ীতে। বন্ধুদের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার। এক কীর্তনীয়ার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে না দিলে চলতো না তোমাদের? ভদ্রলোকে কখনও এমন বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে রুজি রোজগার করে? ছি ছি!"

আগুনের হল্কার মত কানের পাশটা গরম হ'য়ে উঠে দেবকীর। কীর্তন গেয়ে রুজি রোজগার করাটা এতই ঘেন্নার? আর তাস পাশা খেলে বসে বসে মামার বাড়ীর ভাত গিলতে ঘেন্না হয় না।

বাবুদের খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেছে। কর্তা মুখ ধুয়ে এসে পান মুখে দিয়েছে—ছোট দেওর সুখময় এসে সংবাদ দেয়, "দেবী বৌদির বাবা এসেছেন।"

আনন্দে ঝলমল করে উঠে দেবকী। রান্নাঘরের বারান্দা থেকেই দেখে দেবকী—এই রোদে এতখানি পথ হেঁটে এসেছে দীনবন্ধু, ঘামে ভিজে গেছে গায়ের জামাটা। রোদে চোখমুখ লাল। এক বছর পর দেখা। ইচ্ছে হয় ছুটে যায় সে বাবার কাছে।

মামাশ্বশুর একবার এসে বলে যায়, "বিশ্রাম ক'রে স্নান করুন। নিশ্চয়ই স্নান খাওয়া হয় নি।"

সরল হাস্যে উত্তর দেয় দীনবন্ধু, "না, আমি বেরিয়েছি সেই অন্ধকার ভোরে। আটানীদের সেরেস্তায়ই এতক্ষণ দেরি হ'য়ে গেল। কিছু টাকা পাওনা ছিল।"

হাসির মা লক্ষীর আসন দিচ্ছে, হাসি এসে জানায় "মা, সব থালাত এঁটো হ'য়ে রয়েছে। রান্নাঘরে ত আর থালা নেই। একখানা থালা বের করে দাও তাঐ মশাইকে ভাত দিতে।"

হাসির মা লক্ষীর কপালে তেলসিঁদূর পরাতে পরাতে উত্তর দেয়, "তাঐ-মশাইর জন্য সিন্দুক থেকে থালা না, রূপোর থালা বের করে দিতে হবে। যা একখানা কলাপাতা কেটে এনে দে।"

দেবকী পান সাজতে বসেছে পাশের ঘরে। মামীশাশুড়ীর উত্তরটা শুনতে

পায় সেও। এক মুহূর্তে সব আনন্দ চুপসে যায়। খেয়াল হয়, এদের চোখে কতখানি তাচ্ছিল্যের তার গরীব বাবা।

দীনবন্ধু খেতে বসেছে—কলাপাতার উপর ভাত ঢেলে দিচ্ছে হাসি। দেবকী হেঁসেল থেকে দেখে, কত তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠছেন সাদাসিধে মানুষটি। একবার টেরও পাচ্ছে না কতখানি অবজ্ঞায় আজ কলাপাতায় ভাত দিয়েছে এরা এই নূতন কুটুম্বটিকে।

ইচ্ছে হয়, বাবাকে বলে দেয় সে, আর যেন কোনদিন এ বাড়ীতে না আসেন।

দীনবন্ধু খেয়ে উঠে পান মুখে দেয়। বাড়ীর চারদিকে তাকিয়ে দেখে, সুন্দর লেপাপোছা বাড়ী ঘর দোর। গোয়ালঘরে গরু, কামলারা কাজ করছে বাগানে। মনে মনে ভাবে, "মেয়েটা সুখেই আছে।" কিন্তু মুখখানা বড় শুকনো দেখলাম দেবীর। হয় তো ভাইবোনদের জন্য পরাণ পোড়ে এখনও। বড় মায়াবতী মেয়েটা। তাছাড়া রক্তের বন্ধন, এ বন্ধন ছেঁড়া কি আর সহজ ব্যাপার। তামাক খেতে খেতে একা একাই বসে বসে ভাবে দীনবন্ধু। আবার প্রসন্ন চোখে বাগানের দিকে তাকায়। এই চৈত্র মাসেও কপি রয়েছে বাগানে। যাক, মেয়েটা সুখেই আছে।

রান্নাঘর থেকে খেয়াল করে দেবকী উঠোনে কিসের গোলমাল হচ্ছে। রাজেনেরই গলা। কাকে ধমকাচ্ছে এমন অভদ্র ভাষায়। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, রাজেন পায়ের জুতো খুলে মারছে তাদেরই বাড়ীর কামলা, গজেন বাগদীকে। ঘৃণায় কাঠ হ'য়ে দেখে দেবকী—রাজেনের বাবার বয়সী গজেনের কঙ্কালসার মেরুদণ্ডটার উপর জুতোর কাদার ছাপ। দুঃখে, অপমানে জলে ভরে উঠেছে তার চোখ—আর চারপাশে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে বাড়ীর ছেলেগুলি।

দেবকী অস্ফুটে বলে উঠে, "পশু।" আকণ্ঠ নীল হ'য়ে উঠেছে যেন তার

ঘৃণার গরলে। এমন অপদার্থকে জীবনে ভালবাসা সম্ভব নয় তার। রাতে শুতে গিয়ে রাজেনের কাছে জবাব চায় দেবকী, "গজেন বাগদীকে মারলে কেন? সে ত কোনও অন্যায় করে নি। তোমাদের বাড়ীর পায়খানা বিনা পয়সায় সাফ করবে কেন সে?"

রাজেন নভেল পড়ছে শুয়ে শুয়ে। কাত হ'য়ে শুয়েই উত্তর দেয় সে ঠোঁট বেঁকিয়ে, "বাগদীকে মারার কৈফিয়ত দিতে হবে কীর্তনীয়ার মেয়ের কাছে।"

"নিশ্চয়ই দিতে হ'বে।" ঝলসে উঠে দেবকী।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে রাজেন, "যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।" প্রচণ্ড রাগে চড়মারে দেবকীর গালে, "এই নাও তার উত্তর। আর কোনদিন যদি আমার মুখের উপর কথা বলতে আস তবে দেখবে—।"

রাগে, ঘৃণায়, বিদ্বেষে বুকের ভিতরে থর থর করে কাঁপছে দেবকীর। আগুনের হল্কা বের হ'চ্ছে কান দিয়ে। হাতদুটো শক্ত মুঠি করে টান হয়ে দাঁড়ায় সে, "কি দেখাবে, দেখাও না? আবারও জিজ্ঞেস করছি, কেন মারলে গজেনকে।"

"ঘরের বৌয়ের এতবড় আস্পর্দ্ধা। এতবড় বেয়াদপী।" ঘুষির পর ঘুষি মারে রাজেন দেবকীর মুখে। একটা বন্য পশু খেপে উঠেছে পুরুষ দেহে। রক্তে ভেসে যায় নাক মুখ। তবু আক্রোশ কমে না।

"ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেবো।" বলে শুয়ে পড়ে রাজেন।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দেবকী মেঝের উপর। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। এরই সঙ্গে ঘর করতে হবে আজীবন। একটা পশুর সঙ্গে। আর এই পশুরই সন্তান বুঝি আসছে তার পেটে। এরই নাম সন্তান পেটে আসা? ধর্মের ষাড়টার মত···!

বিছানার উপর নাক ডাকছে রাজেন। যেন একটা গোয়ার শুয়োরের ঘোঁত ঘোঁত ডাক। বাইরে অন্ধকারে কার হাতছানি—কোন বিদ্রোহী চলার

পথের ডাক ভেসে আসছে দূর—বহুদূর থেকে। পাহাড়ের অতল অন্ধকার খাদ থেকে কার প্রেতাত্মা উঠে এসে ডেকে ডেকে চলেছে দুয়ারে দুয়ারে।··· খিড়কির দুয়ার দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দেবকী। ধানক্ষেতের বুক থেকে হিম উঠছে···কিছু দেখতে পাচ্ছে না যে সে। লাল পাড় খদ্দরের শাড়ির তলায় ব্লাউজের ভিতরে পার্থদার দেওয়া পিস্তলটা। কিন্তু পার্থদা যদি না এসে পৌছায়। ঐ ত দাঁড়িয়ে রয়েছে খাকি সার্ট গায়ে। এইটুকুত মাত্র পথ। হাঁটছে, হাঁটছে, হাঁটছে, তবু সাঁকো পর্যন্তই যেতে পারছে না। পথ আর শেষই হ'চ্ছে না—হাঁটছে তবু একজায়গায়ই যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু আকাশ যে ফর্সা হ'য়ে এল।···হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে দেবকী। এ কোথায় সে? ঘরের মেঝেতে? বিছানার উপর চিত হ'য়ে ঘুমাচ্ছে রাজেন। স্বপ্ন দেখছিল সে? স্বপ্ন? আকাশের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসে। ভোর হ'য়ে আসছে। মাটির গামলায় গোবর জল গুলতে গুলতে আবার একটু ভাবে স্বপ্নটা। স্বপ্নের মধ্যেও কত সুন্দর পার্থদা।

গোবর ছড়া দিয়ে ঘাটের দিকে যায় দেবকী—একটা কড়াই ভিজিয়ে রেখেছিল কাল রাতে। আম্মা ঢেকির ঘর লেপছে—চিড়ে কুটতে হবে। দেবকীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, "কিরে তোর মুখটা এত ফুলেছে কেন? নাকটাও নীল হ'য়ে রয়েছে।" দেবকী উত্তর দিতে পারে না। চোখের পাতা ভিজে আসে। আরও অবাক হয় আম্মা।

"পড়ে গিয়েছিলি?"

ঠোট চেপে মাথা নাড়ে দেবকী।

"তবে কি ঠাকুরপো—" আর্তস্বরে জিজ্ঞেস করে আম্মা। লজ্জায় মুখ তুলতে পারে না দেবকী। বুক ঠেলে কান্না আসে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে' চেপে রাখতে চায় সে কান্না। কিন্তু পারে না। সমস্ত দেহ দিয়েই যেন কান্না আসছে তার। কিন্তু কার জন্য? কার জন্য কাঁদছে সে,—একমাত্র জানে সে। আর কেউ নয়। তবু আম্মার চোখদুটিও ভিজে আসে। "এ

বাড়ীর শিক্ষা যাবে কোথায় ? কেঁদে আর কি করবি ? মেয়ে হ'য়ে জন্মানর অর্থই ত দুঃখের বেড়ি পরে জন্ম নেওয়া। তুই এককাজ কর—তোর বাবাকে চিঠি দে, কিছুদিনের জন্য ঘুরে আয় বাপের বাড়ী থেকে। কিন্তু চিঠি ডাকে দিবিই বা কার হাত দিয়ে ? অশোক বনে সীতার মতই যে আমাদের অবস্থা। চারদিকে চেড়ীর দল। সীতা তবু রামের অপেক্ষায় দিন গুণতেন। উদ্ধারের আশা ছিল। আমাদের উদ্ধারেরও কোনও আশা নেই।"

সস্নেহে মাথায় হাত রাখে আম্না, বড় বোনের আশীর্বাদ সে হাতে। "যা ডুব দিয়ে আয়। মা উঠে পড়লে আবার কুরুক্ষেত্র শুরু হ'বে ভোর বেলারই। তোর তেলের সিসিটা নিয়ে আয়, আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি মাথায়। এই সুন্দর পিঠ ছাওয়া চুল ছিল। একবারেই শেষ করেছিস।"

নাইতে এসে ঘাটে বসে আবার কাঁদে দেবকী। করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দক্ষিণের ঘন গাছগুলির দিকে। ঐ ঘন বনের আড়ালে মাত্র তিন ক্রোশ পথের ব্যবধানে তালপুকুর। তবু মনে হয়, কত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে নির্বাসন হ'য়েছে তার। মনে মনে আকুলস্বরে ডাকে দেবকী, 'বাবাগো আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।" তার এ বুকছেঁড়া ডাক কি পৌঁছাবে না তালপুকুরের দাসের বাড়ীর ঘাটে ?

বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সমস্ত বসুন্ধরা। গাছ গাছালি পশুপক্ষী সব যেন রোদের তাপে ঝলসে পুড়ে যাচ্ছে। মেঘীরাণীর ঘট নিয়ে বেরিয়েছে মেয়েরা। "মেঘীরাণী মেঘরাণী, হাত পা ধুইয়া ফালা পানী।"

আশার চোখে তাকিয়ে দেখে চাষীরা, সত্যি যদি দয়া হয় মেঘীরাণীর।

ঘরে বাইরে সেদ্ধ হ'য়ে চলেছে মানুষ। ধান সেদ্ধ বসিয়েছে আম্না। 'দো আখা' জ্বলছে। দু'টো উনুনের উপর দু'টো ধানের ডেগ। শুকনো পাতা দিয়ে 'জ্বাল' ঠেলছে বসে আম্না। থেকে থেকে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠে। ভাবে, উঠে গিয়ে একটু জল খেয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, আজ ত একাদশী। নির্জলা একাদশী করে আম্না। শাশুড়ীর বিধান।

বাবুরা খেতে চলেছে। খড়মের শব্দ উঠোনে। ধান সেদ্ধ ক'রে নাইতে যায় আন্না। শাশুড়ী ডাক দিয়ে বলে দেয়, "দেখো, ডুবে ডুবে আবার জল খেয়ো না একাদশীর দিন।"

আন্না মনে মনে উত্তর দেয়, "স্বর্গে ত আর আপনাদের মত স্পাই নেই।"

কিন্তু দুপুরবেলা তেষ্টায় গলা যে কাঠ হ'য়ে আসে। জ্যৈষ্ঠমাসের বেলা যেন আর শেষই হয় না। আন্না আর থাকতে পারে না। রান্নাঘরের পেছনে গিয়ে একটু জল মুখে দেয় ঘটি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা জামরুল গাছ থেকে চেঁচিয়ে উঠে টুসি, "বৌদি, আমি দেখে ফেলেছি।" হাত তালি দিতে দিতে ছুটে যায় সে 'মার কাছে। মুহূর্তের মধ্যে হাটে হাঁড়ি ভাঙা হ'য়ে যায়। বাড়ী শুদ্ধ লোক ডেকে শাশুড়ী মনের আশ মিটিয়ে কথা শুনায়। এদ্দিনে বৌয়ের ছিদ্র বের করতে পেরেছে।

"পাড়ায় পাড়ায় বৌয়ের খ্যাতি। এই ত কুলবতী বৌ আমার। শেষে কিনা একাদশী দিন ঘরের পেছনে গিয়ে জল খাওয়া। পাঁচ বছর ধরে ও এ ভাবেই একাদশী করেছে কিনা তার সাক্ষী ত নেই। আমার ত আর সাতটা চোখ নেই যে চোখে চোখে রাখবো। আর তার নিজেরও কি ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই। স্বোয়ামীকে খেয়েও ধর্মের ভয় নেই।"

আন্নার পাঁচ বছরের বৈধব্য জীবনে এই প্রথম নিষ্ঠাভঙ্গ। কিন্তু সে কথা কে মানবে? লজ্জায়, ক্ষোভে দুঃখে, কোথায়ও মুখ লুকাতে পারলে বাঁচে। বাড়ী শুদ্ধ লোক ছি ছি করছে। শুধু কি এ বাড়ী? রাত ফর্সা হ'বার সাথেই ঘরে ঘরে আজ তাকে নিয়ে কথা চলবে। ঢেকির ঘরে বসে চোখের জল ফেলে আন্না। দেবকী এক ফাঁকে এসে সান্ত্বনা দিয়ে যায়। "জল খেয়েছ, বেশ করেছ। আমাদের স্কুলের ঈষানীমাকে ত একাদশী দিন রুটি তরকারি খেতে দেখেছি। সত্যি যদি তা'তে অন্যায় হ'ত, তিনি নিশ্চয়ই এ নিয়ম ভাঙ্গতেন না।" বলতে বলতে থেমে যায় দেবকী। লক্ষ্য করে, আন্না কোন কথাই শুনছে না। পাথরের মত স্তব্ধ সে আজ। হঠাৎ কি করুণ কান্নায় ভেঙে

পড়ে। শিশুর মত ফুলে ফুলে কাঁদে। আন্নাকে এমন করে কাঁদতে কোনদিন দেখেনি দেবকী। কি বুক ফাটা বোবা কান্না।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘাটের দিকে চলেছে দেবকী। হঠাৎ একটা আচমকা চিৎকার করে উঠে সে। ঢেকির ঘরের কাঠের সঙ্গে কাপড়ে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে আন্না!

লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যায় বাড়ীর উঠোনে। দারোগা পুলিশ। পাড়ার ভদ্রলোক। সরকারী ডাক্তার।

ঘরের মধ্যে হাসির মায়ের বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ চলছে। "এ জন্মে ত কপাল পুড়েই এসেছিল আবার আসছে জন্মের জন্যও পাপের বোঝা সঙ্গে করে নিয়ে গেল।" পুরুত ঠাকুর এসে সান্ত্বনা দেয়, "কেঁদে ত আর ফিরে পাবেন না তাকে। একটা শিবপূজো স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করুন। না হ'লে আবার কারও অমঙ্গল হ'তে পারে। ওর আত্মা ত বাড়ীর আশে পাশেই ঘুরছে কি না। অপঘাতের মৃত্যু।"

বেলা পড়ে আসছে। বিকেলের ছায়ায় ছম ছম করছে বাড়ীর ঘরদোর। যেন কোন অপদেবতার ছায়া নামছে ঘরের চালে চালে।

পাকশালের হাঁড়ি কড়াই সব বের করা হ'য়েছে। ঘাটে বসে সেগুলো মাজছে দেবকী অবশ হাতে। কেঁদে কেঁদে এক বিন্দু জোর নেই আর তার দেহে। ঘাটে বসে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দেবকী। "বড়দি একি করলে তুমি। এ কি করলে?"

বাড়কির ধান মেপে নিতে আসে বাগদীপাড়া থেকে। গজেনের ভাই ধান মেপে দিচ্ছে। গজেনের সম্বন্ধী গোলাবাড়ীর উঠোনে বসে গরুর বিচালী কাটছে। একটু টিপ্পনীও কাটে সে, "কি গো ধান মাপা কার জন্যে?"

"বাড়কির ধান গো। এ বাড়ীর ধান বামুনী ত গলায় দড়ি দিল। এখন খোরাকীর ধান কে ভানবে।" আন্না এ বাড়ীতে আসার পর থেকে খোরাকীর

ধান আর বাইরে দিতে হয়নি। রাজেন আপত্তি করে, "কেন ঘরের বৌ থাকতে বাগদী পাড়ায় খোরাকী ধান দিতে হ'বে কেন? বড় বৌ গলায় দড়ি দিয়েছে, ছোট বৌ ত আছে।"

"তোমার বৌকে ত এখন বাপের বাড়ী পাঠাতে হ'বে।"

"কেন বাপের বাড়ী পাঠাতে হবে কেন?" বিরক্তি সুরে প্রশ্ন করে রাজেন।

"প্রথমবার পোয়াতী। না দিলে লোকেই বা কি বলবে।"

প্রথমবার পোয়াতী? অবাক হয়ে মামীর মুখের দিকে তাকায় রাজেন। একটু লাল হ'য়ে ঘরে চলে আসে। ঘরে এসে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অ্যাঙ্কলেট, নিক্যাপ পরে। এখুনি রওয়ানা হতে হ'বে তাকে। থানার পুলিসদের সঙ্গে খেলা আজ। রওয়ানা হ'বার সময় গোসা ঘরের দুয়ারে কপাল ঠুকে প্রণাম করে। "শিলড্‌টা যেন আনতে পারি হে মা কালী।"

দুই বৌয়ের কাজ একা দেবকীকে করতে হ'চ্ছে। নিশ্বাস ফেলবারও সময় নেই। দুপুর বেলা ধান ভানছে দেবকী—মামী শাশুড়ী আওটিয়ে দিচ্ছে। ধরণীবুড়ি চলেছে উঠোনের উপর দিয়ে। একটু উঁকি মেরে দেখে যায় ঢেকিঘরে। "ওমা, আজ কর্ত্রীও এসে বসেছেন ঢেকিঘরে। তা' একেবারে পানের বাটা নিয়েই বসেছেন।"

"এখন বুড়ো বয়সে আরও কত কি করতে হ'বে কে জানে। তুমি চলেছ কোন বাড়ী?" একটা পান হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে হাসির মা।

"চলেছি ত আপনাদের বৌয়ের বাপের বাড়ীর দিকেই। মনসাডাঙ্গায়।"

মনসাডাঙ্গায় চলেছে শুনে চোখটা ছলছল করে উঠে দেবকীর। লক্ষ্য করে বুড়ি। একটু মায়ার মোচড় দেয় মনের মধ্যে। পানটা মুখে দিয়ে বলে, "ক'টা মাস, এখন এসময়ে বৌকে ঢেকিতে না দিলেই পারেন।"

হাসির মার মুখটা হঠাৎ কাল হয়ে উঠে। "আমারও ত ইচ্ছে না। কিন্তু ছেলে যে বৌদের শুয়ে বসে থাকাটা পছন্দ করে না।"

"শুয়ে বসে থাকবে কেন? সংসারের আর পাঁচটা কাজ করুক। তবে ঢেঁকিতে ওঠাটা এসময়ে ঠিক না।"

উঠতে উঠতে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে ধরণী বুড়ি, "রাতে আসে টাসে নাকি?"

"বড় বৌর কথা জিজ্ঞেস করছো ত? না আওয়াজ ত পাইনি কোনদিন। তবে হাসি নাকি একদিন সাদা কাপড়ের মত কি দেখেছে—খিড়কির দুয়ার দিয়ে সরে যাচ্ছে।"

ধরণীবুড়ি চলে যেতেই পুসি এসে সংবাদ দেয় "মা, তোমায় বাবা ডাকছেন, স্যাক্‌রা এসেছে।" পুসি আর কথা শেষ করতে পারে না আনন্দে, "কি সুন্দর হয়েছে মা তোমার চুড়ির পাটার্ণ। স্যাক্‌রা বল্ল পাটার্নের নাম নাকি শশার বীচি।"

হাসির মা ঢেঁকিঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় গয়না দেখতে। টুসি আবদারের সুরে বলে, "পর না মা, দেখি কেমন দেখায়।"

"না, আজ শনিবার, আজ পরতে নেই।" স্যাক্‌রার দিকে তাকিয়ে বলে, "চুড়ি ত হ'ল। এবার আমার গলার মফচেন কবে হ'বে? আমার বোনের মেয়ের বিয়েতে যাব আষাঢ় মাসের শেষাশেষি। তার আগে কিন্তু চাই।"

ঢেঁকিঘর লেপে রেখে হাত ধুতে যায় দেবকী ঘাটে। পশ্চিম আকাশ থেকে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে রান্নাঘরের পিঁড়েতে। রোদটুকুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন বুকের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে ওঠে—আন্নাদি এই কেমন সেদিনও ঘরের পিছনে বসে রোদে চুল শুকাচ্ছিল।

রোদ পড়ে আসে। চার পাশের গাছের ছায়ায় থমথম করে পুকুর পাড়টা। কে যেন খুঁট খুঁট করে জঙ্গলের মধ্যে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বয়ে যায় তেঁতুল গাছের মগডাল দিয়ে। দেবকী দম বন্ধ করে তাড়াতাড়ি চলে আসে রান্নাঘরে।

রাত্রিবেলা একলা ঘরে ভাতের 'জাল' ঠেলছে দেবকী। চারিদিকে নিঝুম অন্ধকার। ভয়ে ছম ছম করে শরীর। হঠাৎ বাড়ীর উঠোনে সাড়া পড়ে যায়। "রাজেনদারা খেলায় জিতে এসেছে।" কান পেতে শোনে দেবকীও, দূরের সড়ক দিয়ে ব্যাণ্ড বেজে চলেছে। সুখময় উচ্ছসিত কণ্ঠে খেলার বর্ণনা দেয়। "এস, ডি, ও, সাহেব রাজুদাদার খেলা দেখে খুশি হ'য়ে একটা বেষ্ট প্লেয়ার মেডেল দিয়েছে। রাজুদা আজ রাতে আর বাড়ী ফিরছে না নিশ্চয়। আটানীতে আজ মহাভোজ। একটা খাসি কাটা হয়েছে।"

মনে মনে বিদ্রূপ করে দেবকী—এস, ডি, ও, সাহেব মেডেল দিয়েছে, তা' নিয়ে আবার এত গরব।

গভীর রাতে বাড়ী ফেরে রাজেন। চমকে উঠে দেবকী, যেন মদের গন্ধ পাচ্ছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রাজেনের মুখের দিকে তাকায়। রাজেন দেবকীর দিকে কদর্য রসিকতার সুরে বলে, "জমিদার বাবুদের পোষা বাঈজী রয়েছে বাজারে। কিন্তু গরীব অভাগাদের এই ঘরের বাঈজীই সম্বল।"

দেবকী ভুরু কুঁচকে গর্জে উঠে, "অসভ্য।" বিছানাটা দেখিয়ে বলে, "নাও এবার শুয়ে পড়। অনেক কিছুইত ত খেয়ে এসেছ দেখছি।"

রাজেন একটা চুরুট ধরিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে একই কদর্য সুরে উত্তর দেয়, "এত খানাপিনার পর কি এত অবুঝ হ'লে কি চলে ঘরের বাঈজী ?"

ঘা মারা বাঘিনীর মত টান হ'য়ে উঠে দাঁড়ায় দেবকী, "মেরে খুন করে ফেল্লেও তোমার মত ইতরের সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া চলবে না আমার।"

হঠাৎ যেন একটা সিংহ গর্জে উঠে ঘরের মধ্যে। "কি ইতরের সঙ্গে শোওয়া চলবে না। এতদূর ? তোকে আজ কিছুতেই রেহাই দেবো না।"

সমস্ত দেহের শক্তি দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দেবকী জানালার সিক ধরে। মুখে একটা শব্দ করে না। জানে সে, এ বাড়ীতে খুন হয়ে গেলেও একটা সাহায্য পাবে না সে কারও কাছ থেকে।

গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সে—দেহে শক্তি কম নয় তার। কিন্তু

রাজেনের খেলোয়াড়ী দেহের সঙ্গে কতক্ষণ পারবে। মেঝের উপর শুইয়ে মুখের জলন্ত চুরুটটা চেপে ধরে তার বুকের উপর। কোমল স্তন—মুহূর্তের মধ্যে ফোস্কা পড়ে যায়। রাজেন বীভৎস কুটীল হাস্তে তাকিয়ে দেখে বলে, "তোর বেয়াদপীর এই উপযুক্ত সোহাগ। এর পর থেকে একগাছা বেতের ছড়ি এনে রাখবো ঘরে।"

একটা শব্দ করে না দেবকী। এক ফোটা জলও নেই তার চোখে। শুধু মনে মনে আর্তনাদ করে বলে, "পার্থদা, তোমাদের পুলিসী অত্যাচার কি এর চাইতেও নির্মম? এর চাইতেও নিষ্ঠুর?"

পার্থ ওয়েটিংরুমের বারান্দায় ইজি চেয়ারটায় গা এলিয়ে দেয়। সঙ্গের কনেষ্টবল দু'জন খইনি খাওয়ার আয়োজন করছে সামনেই একটা বেঞ্চিতে বসে। গাড়ী আসতে অনেক দেরি। কোথায় নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে তাকে, এখনও জানে না। অনুমান, হয়তো পাহাড় অঞ্চলের কোনও গ্রামে।

সঙ্গের আই, বির ভদ্রলোকটি চা খেতে যায়

ফুলঝুরি ঘাট জংসন,।

ওয়েটিংরুমের সামনে একদল কুলী গাড়ীর অপেক্ষায় পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। পার্থ ইজিচেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে প্রাণভরে দেখছে যাত্রীদের আসা যাওয়া।

বিভিন্ন লাইনের গাড়ী, ষ্টীমার, কুলীদের ব্যস্ততা, যাত্রীদের লটবহর, চেঁচামিচি…হট্টগোল…কয়লার কুচি…ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দম নিচ্ছে ইঞ্জিনটা।

ত্রস্ত পায়ে হেঁটে চলেছে আসাম যাত্রী একদল মুসলমান উদ্বাস্ত—সঙ্গে ঘর ভাঙ্গা ঘটিবাটি, পোটলাপুটলি। মেয়েদের গলায় রূপোর হাঁসুলি, রূপোর পৈছা। চোখেমুখে অজানার ভীতি।

হোটেলওয়ালাদের চিৎকার। "বামুন হোটেল।" "মুসলমান হোটেল।" বাতাসে ভেসে আসছে বাদাম তেলে ভাজা খাবারের গন্ধ।…

কাটিহার মেল প্লাটফর্মে ঢুকলো। আবার একটা ভীড়ের ধাক্কাধাক্কি। কুলীদের মাথায় মালপত্র—যাত্রীর মিছিল।

কাচের বাক্সে খাবার নিয়ে ঘুরছে ফেরিওয়ালা।

দূরে নদীতে নৌকো চলেছে। জেটিতে খানসামারা স্নান করছে। একটা বড় চর পড়েছে মাঝ নদীতে—চরের বুকে সাদা বক উড়ছে চক্রাকারে। দু'বছর জেলজীবনের পর বাইরের সব কিছুই আজ বড় সুন্দর, বড় নূতন লাগছে। আবার একটু আনমনা হ'য়ে পড়ে পার্থ—বকসা পাহাড়ের সেই শান্ত স্তব্ধতা… পাহাড়ের গায়ে গায়ে আটকে থাকা সাদা মেঘ…রাজবন্দীদের তর্কবিতর্ক খেলা-ধূলা…আইরিশ কম্যাণ্ডার, সিপাই, জমাদার।…

আরও একটা ষ্টীমার ভিড়লো। আবার আরেক দল যাত্রীর মিছিল। একটি ছেলে চায়ের ষ্টলের দিকে যেতে যেতে একটু লক্ষ্য করে দেখে যায় তার সুটকেসে আঁটা লেবেলটা।

ছেলেটি ষ্টলের দিকে না গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। কাকে উদ্দেশ করে বলে, "এখানেই নামান হোক জিনিষগুলো।" তারও সঙ্গে কনেষ্টবল, আই, বি। এও তবে ডেটিনিউই,—পার্থ সোৎসুকে তাকায়। উজ্জল গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ, সুন্দর চেহারা। চোখে কাল ফ্রেমের চশমা।

ছেলেটি হাসিমুখে এগিয়ে আসে। "নমস্কার। আমার সাথীদের দেখেই নিশ্চয় আমার পরিচয় জানা হ'য়ে গেছে। আর আপনাকে আমি ভাল করেই চিনি। জেলখানায় বসেই আপনার গল্প শুনেছি। সিলেট থেকে ডিগ্রি পাওয়াত।"

পার্থ হাসে। "সিলেট থেকে ডিগ্রি পাওয়া।" সিলেট কলেজে পড়তে পড়তেই স্বদেশী আন্দোলনে ঢুকে সে।

"আমার নাম সুলক্ষণ সরকার। শিববাড়ীতে আমার বাড়ী।"

আবার সকৌতুকে হেসে বলে সে, "আমি কিন্তু আপনার নাম, গোত্র সব খবরই জানি।"

"গোত্রও ?" অর্থভরা দৃষ্টিতে তাকায় পার্থ। "গোত্রও।" বিদ্যুৎ হাসি ঝলসে যায় কাল ফ্রেমের আড়ালে। "আপনি ত বকসা থেকে চলেছেন। কি খবর সেখানে। বইটই পেতেন ত ?" আবার উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে।

পার্থ লক্ষ্য করে, একটা জীবন্ত উচ্ছ্বাসে থেকে থেকে লাল হ'য়ে উঠছে চোখ মুখ। সারা অঙ্গ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে যেন এক জীবন দীপ্তি।

সুলক্ষণ আই, বির ভদ্রলোকটিকে চায়ের অর্ডার দিতে বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেষ্টুরেণ্টের বয় চায়ের ট্রে রেখে যায় সামনে। টিপট ভর্তি চা, দুধ, চিনি, রুটি মাখন, ডিমের অমলেট।

সুলক্ষণ চা'টা ঢেলে দুধ চিনি মিশাতে থাকে। "নিন।" ট্রেটা একটু সামনে টেনে নিয়ে সহাস্যে বলে। পার্থ সুলক্ষণের কথার জের টেনে বলে, "আমাদের এক অল্পবয়সের আইরিশ কমাণ্ডার ছিল। সে আবার রবীন্দ্র-সাহিত্যের দারুণ ভক্ত। রাশিয়ার বইটইও খুব পড়তো। কাজেই বই আমরা পেতাম।"

কথা আর ফুরায় না। রংপুর জেল থেকে চলেছে সুলক্ষণ আলিপুর জেলে। পরিচিত বন্ধুদের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়।

"জ্যোতিপ্রকাশ দা ত বক্সায়ই আছেন, শুনলাম।"

ম্লান হ'য়ে আসে পার্থ। "তার ত মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

"মাথা খারাপ হ'য়েছে জ্যোতিদার !" সুলক্ষণ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কিছুক্ষণ থমকে থেকে আবার জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা বকসা থেকে নাকি কে পালিয়েছে শুনলাম। কি ভাবে পালাল ?" সপ্রশ্নে তাকায় সুলক্ষণ।

"আমাদের একটা অভিনয় হচ্ছিল সে রাতে। সুপার, এ,সি সবাই সেখানে। সে সুযোগে একটা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে যায়। সে রাতে

কেউ টের পায়নি। পরদিন গুণতিতে টের পেল। তারপর সে কি তছনছ। পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠলো। সব উলট পালট করে, সার্চ করা হ'ল। রাতে সারি সারি হারিকেন নিয়ে তন্ন তন্ন করে' খোঁজা হ'ল পাহাড়ের চারদিকে।"

সুলক্ষণ গর্বের সুরে বলে, "কম ওস্তাদি নয় ঐ কড়াকড়ির ভিতর থেকে পাহাড় বেয়ে পালান।"

সুলক্ষণের গাড়ীর সময় হয়ে আসে। সে তার সুটকেশ খুলে ক'খানা বই বের করে। "নিন, এগুলো আপনার কাছেই রাখুন। আপনি ত অন্তরীণে চলেছেন, বইই একমাত্র সম্বল।"

বিদায় নিয়ে চলে যায় সুলক্ষণ। মাত্র ছ'ঘণ্টার পরিচয়। তবু দারুণ আচ্ছন্ন করে' রেখে যায়। কি ধারাল ছেলে। যেন এক ঝলক স্ফূর্তির আমেজ ছড়িয়ে রেখে গেল সে এ জনারণ্যের নির্জনতায়।

পার্থরও গাড়ীর সময় হ'য়ে যায়। একঘণ্টার জন্য গাড়ীতে উঠে বসে। তারপর বাস। বাস থেকে নেমে নৌকোয়। পার্থ মনে মনেই হাসে—এ তেপান্তরের যাত্রা কি আর শেষ হ'বে না। কোন জনবিরল সাইবেরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে তাকে, তার খসড়া রয়েছে ইলিসিয়াম রোডে। দু'পাশে ক্ষেতের বুকে অমাবস্যার অন্ধকার। তারায় ভরা আকাশ আর বনজঙ্গলের আবছা আভাস। তবু অন্ধকার নদী-পথের এ জলো হাওয়ায় এক পরিচিত জীবনের স্পর্শ। কুকুর ডাকছে দূরে কোন বাড়ীর উঠোনে। মনে হয় যেন মনসাডাঙ্গারই একটি উঠোন নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সে উঠোনের কোণায় শশামাচায় কত শশা ঝুলছে এখন? সে মাচার তলায় ভিজে মাটির বুকেও এমনি অন্ধকার ছলছল করছে। জ্বলছে একটি কি দু'টি জোনাকী।

রাতভরে' নৌকো বেয়ে চলেছে গারো অঞ্চলের মাঝি। ঘুম পাচ্ছে না কি তারও আজ এই থমথমে অন্ধকার রাতে। এ রাতজাগা রোজগার দিয়ে নাতির গলার ধুকধুকি গড়িয়ে দেবার স্বপ্ন নেমেছে হয়তো মাঝির চোখে।

নৌকোর একধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আই, বির ভদ্রলোক। কনেস্টবল দুজনও বসে বসে ঘুমুচ্ছে। ঘুমন্ত মুখগুলি কেমন শিশুর মত অসহায়।

মস্তিষ্কের গুহা দিয়ে চলেছে অগণিত, অফুরন্ত চিন্তার অস্পষ্ট মিছিল—ভেসে চলা কবিতার স্রোত। তার ছেলেবেলার সেই কবিতার খাতাটা আজও রয়েছে হয়তো মায়ের পোর্টম্যানের কোনও কাঁথার তলায়—শ্রেণীচ্যুত জীবনের প্রথম স্বাক্ষর।

চাষীর ছেলে মস্তিষ্কের কোন তাড়নায় লাঙ্গল ছেড়ে ধরেছিল কলম। আজ সেই প্রত্যাখ্যাত লেখনীর ব্যথিত বিলাপ শুনতে পাচ্ছে পার্থ এই রোরুদ্যমানা অন্ধকারের বুক চিরে চিরে। অশ্রুমতী কোন নায়িকা এমন করে' বিমূঢ় করে' দিচ্ছে তার চেতনাকে। 'সাবিত্রী', না 'পার্ব্বতী'? কার রুদ্ধশ্বাসে এ অন্ধকারের প্রাণবায়ু বইছে এত ধীরে। অন্ধকারে কার দু'টি ছলছল চোখ? মায়ের, না দেবকীর? তার মাও কি এখন ঠিক এমনি করেই চেয়ে রয়েছে ঐ একই তারার দিকে। কোন শাপভ্রষ্টা ঋষিপত্নী তার মায়ের ভুলেথাকা স্নেহকে উত্তাল করে তুলেছে এ রাতে। ঘুম আসছে না কি বাবারও চোখে?

থানাঘরের পাশে সহস্র লোকের ভীড়ে বৃদ্ধ চাষীর সেই বেদনাব্যাকুল মুখখানা কি করুণ বিষণ্ণ।

…জেলখানার তালাআঁটা কুটুরীগুলিতে বন্ধুরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? না, জেগে জেগে এ রাতের সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে?…

দেবকীও কি আজ এ রাতে এমনিভাবে জেগে জেগে অন্ধকারের বোবা কান্না শুনছে? গৃহবধূর দিনভরা খুঁটিনাটি কাজের ভীড়ে ভুলে গিয়েছে হয়তো সে তার পার্থদাকে। তবু তার চোখে এ কি দুঃসহ স্মৃতির বিবসতা।

নদীর ধারে মাঠের মাঝখানে টিনের ঘর। বাঁশের বেড়া। মাটির মেঝে। ঘরময় কেচো মাটি। স্যাঁত স্যাঁত করছে চারদিকে। ঘরের একধারে একটা তক্তপোষ, একটা টেবিল, একটি চেয়ার।

"এই আমার আস্তানা ?" সকৌতুক হাস্যে প্রশ্ন করে পার্থ। "এখনকার মত ত থাকুন কিছুদিন।" সবিনয়ে উত্তর দেয় আই, বির ভদ্রলোক। জিনিষ-পত্র নামান হ'চ্ছে নৌকো থেকে। সুটকেস, হোল্ডঅল, বইয়ের ট্রাঙ্ক। দারোগা-বাবু অপেক্ষা করছে আগে থেকেই—সঙ্গে দু'জন চৌকীদার। সহাস্যে নমস্কার জানায় দারোগা, "আপনার রান্নার জিনিষপত্র সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা চাকরাণীও ঠিক করে' রেখেছি আপনার রান্নার জন্য।"

দারোগাবাবু আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, তার বাসার সীমানা, "ঐ ফুটবল খেলার পোষ্ট দেখছেন, তার পেছনেই আমার বাসা। আপনি বিশ্রাম করে' থানায় একবার হাজিরাটা দিয়ে আসবেন।"

পার্থর সঙ্গের কনেষ্টবল ও আই, বির ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে থানার দিকে চলে যায় দারোগাবাবু। পার্থ একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। নদীর ধারে ধারে বর্ষার রোদে স্নান করছে ধানের চারাগুলি। বহুদুরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের সীমানা। ছিপের মত লম্বা লম্বা নৌকোয় খেয়া পার হ'চ্ছে ছেলেরা, মেয়েরা।

একদল মেয়ে চলেছে কোথায় মাঠের উপর দিয়ে, পরণে রঙিন 'পাতুন'—বুকের উপর থেকে কাঁধ অবধি অনাবৃত। হাতে গোছাভরা শাঁখা। চেহারায় মঙ্গোলিয়ান আভাস।

পার্থকে দেখে' হঠাৎ অবাক চোখে দাঁড়িয়ে পড়ে সবাই। চৌকীদারটি তাদের একজনের দিকে তাকিয়ে বলে, "সরস্বতী, বাড়ী গিয়ে তোর শাশুড়ীকে পাঠিয়ে দে। এ ঘরটা লেপে দিয়ে যাবে।"

মেয়েটি কি একটা উত্তর দেয়, বুঝতে পারে না পার্থ।

চৌকীদার দু'জন উঠে পড়ে। "আমরা এখন যাই। আপনি ত নূতন মানুষ। আপনার বাজারটা করে নিয়ে আসি।"

পার্থ কাপড় জামা, তোয়ালে বের করে' স্নানে যাবার উদ্যোগ করে। বাইরে এসে দেখে' হাজং মেয়েরা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরস্বতীর মুখটা

চেনা হ'য়ে গেছে তার। লক্ষ্য করে, এরই মধ্যে তাদের চোখে বিস্ময় কেটে গিয়ে আতিথ্যের আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। ভাষা জানা নেই। কথা বলার উপায় নেই। শুধু নম্র হাসি দিয়ে অভিবাদন করে সেও বিদেশী মেয়েদের।

নিজেদের মধ্যেই কি কথা বলাবলি করে, একসঙ্গে হেসে উঠে সবাই। ছোট্ট মেয়েদের মত প্রাণ খোলা সে হাসি। বোঝে পার্থ, তাকে নিয়েই কোনও রহস্য হ'ল। কিছু না বুঝেও নিঃশব্দে হাসে সেও কৌতুকে।

একটি ছেলে নেমে আসে নৌকো থেকে। গামছায় বাঁধা চাল, ডাল শুকনো লঙ্কা, আলু। আধা বাংলায় বলে সে, "চৌকীদার এগুলো দিয়ে দিল আমার সঙ্গে। আমার নাম সারথী। নদীর ওপারে ঐ দূরে আমার ঘর।" পার্থকে একটু ভাল করে দেখে নিয়ে হেসে বলে, "আমি আপনার কথা আগেই শুনেছি চৌকীদারের কাছে।" রান্নাঘরে একটু উঁকি মেরে দেখে বলে "আমি এক্ষুনি আপনার কাঠ নিয়ে আসছি।"

মেয়েরাও চলে যায় সারথীর সঙ্গে। পার্থ সসম্ভ্রমে তাকিয়ে দেখে ছেলেটিকে। খুব লম্বা নয়। তবু তার চওড়া বুকে আর মজবুত কবজি দু'টোয় শুধু দেহের নয় মনেরও বলিষ্ঠতার পরিচয় জানায়। ডিঙ্গি বেয়ে ওপারে চলে যায় সারথী।

পার্থর ঘরের কিছু দূরেই একটা সরকারী বাগান। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা তরিতরকারির খেত। মাঝখানে একটা ইঁদারা। পার্থ স্নান করে এসে দেখে, রান্নাঘর লেপা হ'য়ে গেছে। ঘরের "পৈঠা" লেপছে এক বুড়ি। সরস্বতীর শাশুড়ী।

সারথী ঝাটা দিয়ে ঘরের ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, "এখানে সাবধানে চলবেন। এসময়ে বিষাক্ত সাপ চলে ফেরে।" বলতে বলতেই ঘরের "কার" থেকে একটা সাপ ধুপ করে পড়ে মেঝেতে। বিরাট বিষধর গোখরো। সারথী ঝাটা ফেলে একলাফে বাইরে চলে আসে। দিশে না পেয়ে একটা জালানী কাঠ দিয়ে বাড়ি মারে। আঘাত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফণা তুলে রুখে আসে সাপটা। পার্থ মনে মনে প্রমাদ গুণে। বাইরে একটা কাঠ কাটা কুড়ুল পড়ে

ছিল। সেটা তুলে দ্বিতীয় আঘাত দেয়—ঠিক মাঝখানটায়। বার কয়েকের জন্য ফণা তুলেই নেতিয়ে পড়ে সেই বিরাট বিষধর গোখরা।

"মস্ত একটা ফাঁড়া গেল আজ সারথীর।" এতক্ষণে কথা ফোটে বুড়ির মুখে। সংবাদ শুনে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছে দারোগা। উঠোনের একধারে বন্দুক হাতে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দারোগা—মনে মনে তাজ্জব বনে যায় পার্থর সাহস দেখে। এ ছেলে সহজ পাত্র নয়। কুড়ুল দিয়ে অতবড় সাপ মারার সাহস করে যে ছেলে। থানায় গিয়ে ডায়রীতে লিখে রাখে ঘটনাটা।

বুড়িমা যাবার আগে আরেক বার সতর্ক করে দিয়ে যায় পার্থকে। "সাবধানে থেকো বাছা। ওর সঙ্গী কিন্তু আনাচে কানাচেই থাকবে।"

পার্থ মনে মনে কি উপভোগ করে' একটু হাসে। প্রিয়তমা সর্পিণীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আসবে কোন গোখরো নওজোয়ান। তার সঙ্গে আরেকবার দ্বন্দযুদ্ধে নামতে হ'বে তাকে। দুপুরবেলা সারথী সামনে এসে দাঁড়ায়, "দাদাবাবু হাটে যাবেন নাকি? আজ এখানে বড় হাট।"

পার্থ বই বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ে সারথীর সঙ্গে। আসার পথে থানায় হাজিরাটাও দিয়ে আসতে হ'বে। পথে যেতে যেতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় পার্থ এ পাহাড়পুরের গ্রামবাসীদের পরিচয়। বেশীর ভাগই চাষী। "গণেশ দাসকে চেনেন না? সেও ত জেলে গিয়েছিল, লবণ আইনে।" সরলসুরে জিজ্ঞেস করে সারথী।

পার্থ বুঝিয়ে বলে, "জেল ত আর একটা দু'টো নয়। প্রায় একশ জেল রয়েছে সারা ভারতবর্ষে। আর শ'য়ে শ'য়ে স্বদেশী বন্দী রয়েছে সে সব জেলে। এইত আমি যেখান থেকে এলাম, সে এক পাহাড়ের উপর দুর্গ!" অবাক হ'য়ে শোনে সারথী রাজবন্দীদের গল্প, সাধারণ কয়েদীদের গল্প।

হাটে এসে পৌছায়। নদীর গা ঘেষে গ্রামের হাট। সারথী তার বাড়ীর জিনিষপত্র কিনে গামছায় বেঁধে নেয়। "আপনি কিছু আনাজ কিনে রাখুন। এখানে ত বাজার নেই। আর তিনদিন পরে বসবে হাট। একটা মিষ্ট লাউ

কিছুন, আপনার তিনদিন কেটে যাবে।" সারথী পার্থর কাঁধের ঝোলা থলিটি প্রশংসার চোখে চেয়ে দেখে। "এতে আপনার বাজার করতে খুব সুবিধা হ'বে।"

"জেলখানায় এক আসামী বন্ধু দিয়েছে থলিটা।"

পার্থ বলে, "চল তোমার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।"

সারথী খুশী হয়। "সত্যি যাবেন। আমাদের মাটির ঘর। দেখার কিছুই নেই।" মৃদু সংকোচের সুরে বলে সে।

"আমি ত তোমার ঘর দেখতে যাচ্ছি না। তোমার বাড়ীর লোকদের দেখতে যাচ্ছি।" আত্মীয়তার সুরে বুঝায় পার্থ, "কে কিরকম ঘরে থাকে তা' দিয়ে মানুষের পরিচয় নয়। মানুষের পরিচয় থাকে এই বুকের তলায়।"

খেয়াপার হ'য়ে ওপারে চলে আসে দু'জনে। প্রায় একক্রোশ পথ। পার্থ মনে মনে একটু অভিভূত হয়। এতদূর থেকেও দিনে তিনবার চারবার যাচ্ছে সারথী তার কাছে।

ঘরের দাওয়ায় বসে তাঁত বুনছে এক বৃদ্ধা—অনেকটা মণিপুরীদের মত সে তাঁত।

সারথী পরিচয় করিয়ে দেয়, "এই আমার মা।" সারথীর বাবা তাড়াতাড়ি পিঁড়ি এনে দেয় বসতে। দোভাষীর কাজ করে সারথীই। সারথীরই মত একটি জুয়ান ছেলে এসে সামনে দাঁড়ায়। সারথীর বড় ভাই শঙ্খমান। পাশে তার বৌ রাসুমনি। রঙিন পাতুন পরণে। অনাদৃত স্কন্ধে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য।

পার্থর নম্র হাসিভরা চোখে স্নিগ্ধ অভিনন্দন ঝরে। বুড়িমা উঠে এসে কি নির্দেশ দেয় বৌকে। বোঝে পার্থ, তারই অভ্যর্থনার কোনও আয়োজন।

সারথীর দিকে তাকিয়ে বলে, "আজ আমি এখন উঠি। সন্ধ্যার পর কোথায়ও থাকার নিয়ম নেই আমার। তাহ'লে হয়তো কালই আবার চালান দেবে কোথায়ও।"

ঘর পর্যন্ত আবার সঙ্গে আসে সারথী। কিছুইতে মানা শোনে না।

"আপনি নূতন এসেছেন, এদিককার কোনও খবরত জানেন না। ঐ যে একটা মস্ত গাছ দেখে এলেন নদীর ধারে, ওটাতে ভূত আছে।"

পার্থ একটু হাসে। "কিন্তু ফিরবার সময় ত ও পথেই ফিরতে হ'বে তোমাকে।"

"আমার সঙ্গে মন্ত্রপড়া শিকড় আছে। এ শিকড় সঙ্গে থাকলে ভূতের-বাপেরও সাধ্যি নেই কিছু করে।"

"এখানে বুঝি খুব বেশী ভূতের উৎপাত?"

"সেজন্যই ত আমরা ঘরের জানালা করি না। রাতে সব বন্ধ করে শুই।"

পার্থ বলে, "একদিন দুপুরবেলা যেও আমার ঘরে, ভূতের গল্প শোনাব।"

পার্থ তার ঘরে ফিরে দেখে, চৌকীদার বসে রয়েছে তার অপেক্ষায়। সঙ্গে একটি মেয়ে।

"দারোগাবাবু এই আলাপীকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাজকর্ম করার জন্য।"

পার্থ মেয়েটিকে বলে দেয়, "কাল সকালে এসো। রাতে আর আমার কোনও কাজ নেই। কতদূরে থাক?"

"থানাঘরের কাছেই থাকি।" আলাপী সহাস্যে উত্তর দেয়, "দেখবেন, আপনার ঘুমভাঙ্গার আগেই আমি এসে যাব। একজন মানুষের কাজ, তাছাড়া পুরুষমানুষের কাজ—আমি এক হাতেই হাট বাজার রান্না বাসন ধোওয়া সব করে' দেবো। এ আলাপীর কাজে কেউ কোনদিন খুঁত ধরতে পারেনি ছোট হাকিম সাহেবের বাড়ীতে থাকতাম আগে। আপনি ইংলিস খাওয়া চান, মাংস, চপ—তাও জানি। আবার পায়েস, মিষ্টান্ন চান, তাও জানি।"

পার্থ মেয়েটির দিকে তাকায় একটু মাষ্টারী চোখে। একটু যেন বেশী সপ্রতিভ মেয়েটি, একটু বেশী কথা বলে। পার্থ গম্ভীর সুরে বলে, "কাল সকালে এসে কি কাজ করতে হবে, দেখে নিও।"

পার্থ উঠে এসে হারিকেন ধরিয়ে কলম নিয়ে বসে। প্রহর গড়িয়ে চলে। গভীর রাত্রি। লেখা থেমে আসে। জানালা দিয়ে তাকায় পার্থ কি এক অস্থির কাতর চোখে। চোখের তারায় কোন্ দূরের অম্বেষণ। এ নিথর অন্ধকারে তন্ন তন্ন করে কাকে খোঁজে সে। কাকে খুঁজছে? চারদিকে অথৈ অন্ধকার। নদী বয়ে চলেছে দূরে। এই রূপবতী অন্ধকারের সুরে সুর মিলিয়ে কার নানী কঙ্কাবতীর গল্প বলছে এখন এক প্রদীপ জ্বালা ঘরে। কোন ছোট্ট মেয়ে যমুনাবতী পুতুল খেলা রেখে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আহ্বান শুনছে।

"যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
কাল যাবে সে শ্বশুরবাড়ী কাঁজীতলা দিয়ে।"

সেই ছোট্ট যমুনাবতীর চোখ ছুটি কি এই অন্ধকারের মতই করুণ অন্তস্পর্শী? আহা, যমুনাবতী, তোমার পুতুল খেলা সাঙ্গ হ'ল বুঝি? বোঝে না পার্থ, কেন চোখের পাতা ভিজে আসছে তারও। কার ব্যথায়?

ছুয়ারে কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় পার্থর।

"রান্নাঘরের চাবীটা?" ছুয়ারে দাঁড়িয়ে ডাকছে আলাপী।

ঘুমভরা চোখে ছুয়ার খুলে বের হয় পার্থ। এত বেলা হয়ে গেছে! আলাপী উনুন ধরিয়ে চায়ের জল বসায়।

চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ে পার্থ। নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে হাঁটে। ছু'ধারে গৃহস্থদের বসতি। গায়ে গায়ে লাগা মাটির ঘর। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘনবন। একটা বাড়ীর সামনে গাছভর্তি জবা ফুল ফুটে রয়েছে। অন্যমনস্ক মনেও হঠাৎ চোখে পড়ে। রোদে টুক টুক করছে লাল জবাগুলি। জবা গাছটার সামনেই উঠোন থেকেই নেমে আসে সরস্বতী। ভোরের রোদের মতই খুশির রোদ ঝরছে তার চোখে মুখে।

"এই তোমার ঘর?" প্রসন্ন চোখে জিজ্ঞেস করে পার্থ। উত্তরে কি যেন

বলে, একটু হাসে সরস্বতী। সে হাসিতে মনে হয়, যেন কত কালের পরিচয়। পার্থর কথা বোঝে সরস্বতী—কিন্তু বলতে পারে না। পার্থ সস্নেহ স্বরে বলে, "সারথীকে নিয়ে আরেক দিন আসবো তোমাদের বাড়ী।"

সারথীর উল্লেখে হঠাৎ যেন লাল হয়ে উঠলো সরস্বতী। সন্ধানী চোখে কি একটু তল্লাস করে দেখে পার্থ সরস্বতীর চোখে মুখে। একটা অস্পষ্ট অনুমান আচমকা ডানা মেলে চলে যায় মনের তলা দিয়ে।

বাড়ী চলে আসে পার্থ।

রান্নাঘর থেকে মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে। আলাপী একগাল হাসি নিয়ে দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। "দারোগাবাবুরা একটা ভাগে খাসী কেটেছিলেন। চৌকীদারকে বলে' আপনার জন্যও এক ভাগ নিলাম।"

পার্থ ঘরে এসে বই নিয়ে বসে। সুলক্ষণের দেওয়া বই। রাশিয়ার চিঠিখানা খুলে বসে। বইটা খুলেই চোখে পড়ে প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে "লতাকে—সুলক্ষণ।" বেশ যত্ন নিয়ে লেখা অক্ষরগুলো।

বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে দেখে, একটা, শ্লিপে লতার ঠিকানাও লেখা রয়েছে।

বিস্মিত হয় পার্থ। ঈষানী দেবীর আশ্রমের ঠিকানা। তা'হলে ঈষাণী দেবীর ভাইঝি সেই লতার জন্যই এই বই? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে দেবার কথা ছিল, ভুল করে সব বইয়ের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে তাকে। প্রীতির চোখে আবার পড়ে পার্থ সুলক্ষণের হাতের লেখাটুকু। একটা ভাললাগা সুর জমে উঠে মনের তলায়।

আলাপী এসে স্নানের তাড়া দেয়। "বেলা একটা দু'টোয় স্নান খাওয়া— এ কিন্তু আমি এখানে থাকলে চলবে না, দাদাবাবু। আগে খেয়ে ঘুমিয়ে শরীরটাকে একটু তর তাজা করুন দেখি। আলাপীর রান্নার গুণ লোকে চোখে দেখুক। সারাদিন বই আর বই। কি আছে বইয়ের মধ্যে বলুন দেখি, যার জন্য কোনদিকেই আর চোখ পড়ে না?"

অন্তরঙ্গ হাসিতে গা এলিয়ে দেয় আলাপী।

পার্থ বই থেকে মুখ তুলে একটু তল্লাসী চোখে তাকায়। সরস্বতীর মুখটা আবার চোখে ভাসে। কি অপর্যপ্ত ফুল ফুটে রয়েছে জবাগাছটায়। সারথীর নাম শুনে অমন লাল হ'য়ে উঠলো কেন সরস্বতী? বড় সুন্দর সেই মিঠে লালটুকু। মাঠের উপর দিয়ে সরস্বতীর স্বামী চলেছে। কি নাম যেন? কার্ত্তিক। চৌকীদারের কাজ করে। থানায় হাজিরা দিতে গিয়ে রোজই দেখা হয় তার সঙ্গে। লোকটা ভাল না।

"রসুন খান দাদাবাবু?" আলাপী রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করে। তোয়ালে কাঁধে নদীতে চলেছে পার্থ। মাপা কথায় উত্তর দেয় সে "হ্যাঁ খাই।" এত ঘন ঘন অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দিতেও বিরক্তি আসে। তবু উত্তর না দিলেও চলে না—এমনি সরাসরি প্রশ্ন আলাপীর।

দিনের মধ্যে কতবার যে ঘরে ঢুকবে আলাপী।

"কচুবাটা খান দাদাবাবু?"

বিকেলের দিকে বই রেখে বেরিয়ে পড়ে পার্থ। সারথীর বাবার জ্বর হ'য়েছে। দেখে আসা দরকার।

আলাপী চেঁচিয়ে ডেকে বলে দেয়, "দাদাবাবু, একটু সকাল সকাল ফিরবেন। খিঁচুড়ী রাঁধবো রাতে। দেরি করলে জুড়িয়ে যাবে।"

"নাঃ, একে দিয়ে আর চলবে না।" মনে মনেই বিরক্তি প্রকাশ করে পার্থ। কিন্তু বেশী বকবক করে, শুধু এই অপরাধে ত কারও কাজ ছাড়ান যায় না।

খেয়া পার হ'য়ে দু'মাইল পথ একাএকাই হাঁটে।

সারথী দুর থেকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে।

"কেমন আছেন তোমার বাবা?"

"সকালে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। আবার দুপুর থেকে শীত করে, কম্প দিয়ে জ্বর আসে। কালী কামাখ্যার জলপড়া এনে খাইয়ে দেওয়া হ'য়েছে।"

পার্থ রোগী দেখে বোঝে, পরিষ্কার ম্যালেরিয়া। কুইনাইন ছাড়া ওষুধ নেই। সারথীকে জিজ্ঞেস করে, "এ অঞ্চলে ডাক্তার নেই ?"

"ডাক্তার আছেন, যেখান থেকে বাস ছাড়ে সেখানে। প্রায় পাচ ক্রোশ-পথ। তাছাড়া কাছে আছেন মিশনারী সাহেব ডাক্তার। তাঁরা মাঝে মাঝে আসেন। মায়ের দয়া হয় যখন, সে সময়ে এসে বাড়ী বাড়ী ঘুরে যায়।"

পার্থ সারথীকে বুঝিয়ে বলে, "আমারও ঠিক এমনি জ্বর হ'ত। শুধু আমার নয়, আমার বাবার, মার, বাড়ী শুদ্ধ সকলের। তাই এ জ্বরের ওষুধ আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। তুমি সঙ্গে চল আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, যখনই জ্বরটা ছেড়ে যাবে, ওষুধটা খাইয়ে দিও কালী কামাখ্যার পায়ে ছুঁইয়ে।"

পরদিন ভোরে উঠেই আবার আসে পার্থ। শঙ্খমানকে ডেকে বলে, "সাবুর সঙ্গে একটু দুধ দিতে হ'বে।"

পার্থর ওষুধে কয়দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে ওঠে গজেন। কিন্তু বুড়িমা জ্বরে পড়ে। বুড়ি ভাল হয়ে উঠতেই বড় ছেলে পড়ে। পার্থই চিকিৎসা ক'রে ভাল ক'রে তোলে সবাইকে। সহর থেকে ওষুধপত্র, চিকিৎসার সরঞ্জাম কিনে আনায়। কুইনাইন, অ্যাটাব্রিন থার্মোমিটার, ব্যাণ্ডেজের তুলো, আয়োডিন।

পার্থর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ঘরে ঘরে তার ডাক আসে।

"সাপের বিষের ওষুধ কিন্তু আমার কাছে নেই।" আগেই বলে রাখে সে। "তবে সাপে কাটলে সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে দেওয়াটাই বড় কথা, যা'তে বিষটা সারা শরীরে ছড়িয়ে না পড়তে পারে।"

এক জাতীয় গাছের শিকড় সবসময়ই কোমরে রাখে সারথী। সে শিকড়ের গন্ধে নাকি স্বয়ং শঙ্খচূড়ও সরে যায়। তবু পার্থ তার টর্চটা দিয়ে দেয় সারথীকে। "এটা তোমার কাছেই রাখ।"

জানালা দিয়ে দেখে পার্থ, শঙ্খমান আর রাসমনি কোথায় চলেছে। সঙ্গে সারথীও আছে। সারথী দুয়ারে এসে ডাকে পার্থকে, "বড় জলতেষ্টা পেয়েছে বাবুজর। আপনার কলসীটা কোথায় ?"

পার্থ উঠে গ্লাসে জল ভরে নিয়ে আসে। গ্লাসটা রাস্থমণির হাতে দিয়ে তার পরিপাটি সাজ সজ্জার দিকে একটু চোখ বুলিয়ে দেখে বলে. "কোথায় বেড়াতে যাচ্ছ মনে হ'চ্ছে।"

সারথী সহাস্যে উত্তর দেয়—"বাপের বাড়ী চলেছে।"

আলাপী ইঁদারায় জল আনতে গিয়েছিল। জলের বালতিটা রেখে এসে সামনে এগিয়ে দাঁড়ায়। সরস হাস্যে জিজ্ঞেস করে সে শঙ্খমানকে, "শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছ, শালা-শালীদের জন্য কি নিয়ে যাচ্ছ?"

রাস্থমনি হাতের গামছায় বাঁধা পুঁটলিটা দেখিয়ে খুশির সুরে উত্তর দেয় "বিচীভাত নিয়ে যাচ্ছি।"

শঙ্খমান রাস্থমণিকে বলে, "দাদাবাবুকে চারুটি বিচীভাত দিয়ে যা খেতে।"

রাস্থমণি তার গামছায় বাঁধা শুকনো ভাত থেকে খানিকটা তুলে দেয় বাটিতে। আলাপী বাধা দিয়ে বলে, "থাক, দাদাবাবুর আর বিচীভাত খেতে হবে না।" পার্থ আলাপীর কথার ধরনে মনে মনে বিরক্ত হয়। রাস্থমণির হাত থেকে বাটিটা নিয়ে একটু ভাত মুখে দেয়। "বেশ ত খেতে।"

সারথী বুঝিয়ে দেয় "এ ভাত জলে সেদ্ধ হয় না। ভাপে সেদ্ধ হয়। আপনাদের চিড়ে মুড়ির মত আমাদের এ ভাত অনেক দিন ঘরে থাকে। ঘরে কোনও কুটুম এলে এ বিচীভাত খেতে দেওয়া হয়। ছড়াই আছে—

"বিচীভাত লেবাশাক
ধীরে ধীরে খাইতে থাক।"

শঙ্খমান রাস্থমণিকে নিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে চলে যায়। সারথী ঘরে এসে বসে। একখানা দাখিলা বের করে পকেট থেকে। "দেখুন ত দাদাবাবু, এই দাখিলাটা ঠিক আছে কি না।"

পার্থ দাখিলাটায় চোখ বুলিয়ে বলে, "কাছারিতে কত টাকা দিয়ে এসেছ?"

"তেত্রিশ টাকা। তিন বছরের খাজনা।"

"কিন্তু এখানেত মাত্র একুশ টাকার রসিদ দেওয়া আছে। তার অর্থ বার টাকা গিয়েছে নায়েবের পকেটে।"

"তা হ'লে এখন কি করবো? বছর বছরত আমরা এভাবেই টাকা দেই।"

"পার্থ একটু চিন্তা করে বলে, "আমি একটা দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি দরখাস্তটা তুমি কাছারিতে দিয়ে এসো। একটা রসিদ এনো। আচ্ছা, এ ধরনের দাখিলা এ তল্লাটে আর কতজনকে দিয়েছে বলতে পার?"

"এ পরগণার সব প্রজারই এ দশা।"

"তুমি এক কাজ কর। সবাইকে তাদের দাখিলা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। শীগগীরই এখানে হাকিম আসবে। আমি তার সঙ্গে দেখা করবো।"

পার্থ সুলক্ষণের দেওয়া রাশিয়ার চিঠিখানা নিয়ে থানার দিকে যায়। লতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে বইখানা। থানার পথে সরস্বতীর সঙ্গে দেখা। ডিম নিয়ে চলেছে তার কাছে। পার্থ এখন কিছু ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথাও বলতে পারে আঞ্চলিক ভাষায়। সে সরস্বতীকে বলে দেয়, "তুমি যাও। আমার ঘরে রেখে এসো ডিমগুলো।"

থানাঘরের সামনে চৌকীদারদের ভীড়। মাইনে নিতে এসেছে। সরস্বতীর স্বামী—কার্তিকও এসেছে। মাতাল মানুষের মত লাল চোখ। খোসামুদে চক চক করছে মুখটা। দারোগার তামাকটা সামনে এনে ধরে। বসে বসে সন্দেহভরা চোখে দেখে পার্থ। দারোগার পেয়ারের লোক নিশ্চয়। আর এই সরস্বতীর স্বামী? মনটা খারাপ হয়ে যায়। হাতের বইখানা টেবিলের উপর রেখে বলো, দারোগাকে, "এ বইটা এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন আজই।"

এ, এস, আই বইটায় একটু চোখ বুলিয়ে তুলে রাখে। লক্ষ্য করে পার্থ, তাকেও শকুনদৃষ্টি দিয়ে দেখে রাখছে কার্তিক।

বাড়ী ফিরে এসে দেখে, সরস্বতী তখনও যায়নি। বারান্দায় মুখ নীচু করে বসে রয়েছে। চোখের পাতা ভেজা। সামনেই খুঁটি ধরে দাঁড়ান সারথী।

চোখমুখ থমথম করছে তারও। পার্থ একটু অবাক হ'য়ে ছ'জনকেই তাকিয়ে দেখে। তাকে দেখে সরস্বতী উঠে চলে যায়। ডিমের সাজিটা নিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটে। যেন এক বিদ্রোহিনী নারী পথের বাধা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হেঁটে চলেছে গর্বিত পদক্ষেপে।

সারথী তখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে খুঁটি ধরে। পার্থ স্থির চোখে তাকায় তার আনত মুখের দিকে। "কি ব্যাপার, সারথী?"

"আপনার কাছে একটা কথা বলবো।" ঘরে এসে বসে সারথী। বিনা ভূমিকায় বলে, "আমি সরস্বতীকে বিয়ে করতে চাই।"

পার্থ সপ্রশ্নে মুখের দিকে তাকায়। "স্বামী থাকতে বিয়ে করার চল আছে কি তোমাদের মধ্যে?"

"চল না থাকলেও চল করে নিতে হয়। স্বামী যদি দিন রাত মারধোর করে বৌকে, তাহ'লে সে স্বামীর ঘরে থেকে লাভ কি? পুরুষ মানুষ হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করেছি—মেয়েমানুষের চোখের জল দেখার জন্য নয়।" পার্থ শ্রদ্ধাঝরা চোখে চেয়ে দেখে সারথীর বলিষ্ঠ কবজি ছ'খানা।

বেরিয়ে পড়ে পার্থ। এস,ডি,ওর সঙ্গে দেখা করতে যায় দাখিলাগুলো নিয়ে। হাকিম সাহেব প্রতিশ্রুতি দেয়—এর একটা বিহিত নিশ্চয়ই করবে। ক্লার্ককে নোট করে নিতে বলে।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে পার্থ লঞ্চ থেকে। ডেকে দাঁড়িয়ে আবারও নমস্কার জানায় তরুণ হাকিম। হাজংরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখে বিদেশী হাকিমসাহেবের সুন্দর লঞ্চটি। বিনম্র শ্রদ্ধার চোখে দেখে, পার্থর চোখেমুখের সুতীক্ষ্ণ দীপ্তি। আশার সুরে বলাবলি করে, "একটা কিছু বিহিত না করে' আর আসছেন না ডেটিনিউ বাবু।"

সন্ধ্যা নেমে আসছে। বাড়ী ফিরছে সারথী। পার্থ দূর থেকে দেখে তার ঋজুদেহের গর্বিত বলিষ্ঠতা। মনে মনে আবারও আওড়ায় সারথীর

কথাগুলো :—পুরুষমানুষ হ'য়ে জন্মেছি মেয়েমানুষের চোখের জল দেখবার জন্য নয়।

রাত ঘন হয়ে' উঠেছে। থেকে থেকে পাখীর ডানা ঝাপটার শব্দ আসছে আমগাছটার ডাল থেকে।

হারিকেনের তেল ফুরিয়ে আসে। পার্থ তেল ভরতে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আলাপী তখনও যায়নি। "এ কি তুমি এখনও রয়েছো? এত রাতে এখন একা যেতে পারবে?"

আলাপী ক্লান্তস্বরে উত্তর দেয়, "আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। বোধ হয় জ্বর এসেছে৷ আজ আর বাড়ী যেতে পারবো না। এখানেই শুয়ে থাকি বারান্দার এই তক্তপোষটায়।"

"এখানে শোবে?" একটু বিব্রত বোধ করে পার্থ। কিন্তু আর দ্বিতীয় ঘরও নেই। হারিকেনে তেল ভরে' নিয়ে ঘরে চলে আসে সে।

গভীর রাতে পড়া বন্ধ করে বাতিটা নিবিয়ে আবার খেয়াল হয়, আলাপী শুয়ে রয়েছে বাইরে। জ্বর বেশীই হ'ল নাকি? একটু খোঁজ নেওয়া উচিত। দুয়ার খুলে বের হয় পার্থ। কিন্তু চৌকাঠ থেকে এক পা বেরিয়েই চমকে উঠে পার্থ—সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারটা বন্ধ করে' ঘরে চলে আসে।

স্তম্ভিত হ'য়ে যায় পার্থ। অর্দ্ধনগ্ন হ'য়ে শুয়ে রয়েছে আলাপী তক্তপোষের উপর। দিনের আলোর মত স্পষ্ট জ্যোৎস্না। মনে হল যেন একটা কদাকার অজগর পড়ে রয়েছে। বোঝে পার্থ, আলাপী নিদ্রিত নয়। আর তার উদ্দেশ্য বুঝতেও বিলম্ব হয় না। একটা গ্লানিকর অস্বস্তিকর অনুভূতি সমস্ত চেতনাকে ক্লেদাক্ত করে' তুলেছে। বাইরে দিনের আলোর মত স্পষ্ট জ্যোৎস্না। আর তারই বারান্দায় এক দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকের অপচেষ্টা। কি প্রশ্নের উত্তর তন্ন তন্ন করে' খোঁজে পার্থ।

ভোরবেলা প্রতিদিনকার মতই ঘর ঝাট দিতে আসে আলাপী। পার্থ বই বন্ধকরে' আলাপীর দিকে স্থির চোখে তাকায়। দৃষ্টিতে ঝরে নীরব তিরস্কার।

গম্ভীর সুরে বলে, "এই তোমার মাইনের টাকা। আজ থেকে আর কাজ করতে হ'বে না তোমাকে।"

আর একবার তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে ভৎর্সনা ভরা সুরে জিজ্ঞেস করে পার্থ, "একটা কথা জানতে চাই আলাপী, তুমি আমার এখানে কি শুধুই রান্নার কাজেই এসেছিলে?"

আলাপী বোঝে, কেন এ প্রশ্ন। জীবনে এই প্রথম এ প্রশ্ন।

তার নগ্ন দেহকেও উপেক্ষা করতে পারে, এমন পুরুষও আছে পৃথিবীতে, এই প্রথম জানলো আলাপী সে কথা। তবু সক্লেশে উত্তর দেয় সে, "আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে বিশ্বাস করুন, দারোগা বাবুই আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন।"

চমকে উঠে পার্থ। যেন একটি কদর্য নগ্নরাত্রির ঘোমটা খসে পড়লো চোখের সামনে। দারোগারই এত হীন প্ররোচনা। রাজবন্দীদের চারিত্রিক কলঙ্ক রটিয়ে তাদের ঘায়েল করার শেষ অপচেষ্টা।

আলাপী টাকা নিয়ে চলে যায়।

সারাটা সকাল মাটি হয়।

চৌকীদার এসে দাঁড়ায় দুয়ারে। দু'খানা বইয়ের অর্ডার দিয়েছিল চাষ ও পশুপালন সম্বন্ধে। সে বই দু'খানা এসেছে কাল। চৌকীদার বই দু'খানা রেখেই আবার চলে যায়। পার্থ সারা দুপুর বসে চাষের বইখানা পড়ে। মন থেকে সকাল বেলার গ্লানি অনেকখানি কেটে যায়। প্রসন্ন মনে বইখানা হাতে নিয়ে সারথীর বাড়ীর দিকে হাঁটে। তামাক কাটছে বসে সারথীর বাবা। পার্থ খুশির সুরে বলে, "ফসলের পোকার হাত থেকে রক্ষা করার কত উপায় লিখেছে বইয়ে, দেখুন।" সারথীর বড় ভাইও উৎসুক হয়ে সামনে এসে বসে।

পার্থ প্রতিদিনই এসে পোকার হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্বন্ধে

বোঝায়। সারথীদের প্রতিবেশী চাষীরাও সবাই এসে জড়ো হয় গজেনের উঠোনে।

ফসলের পোকা কি একটা, দু'টো? অসংখ্য। কাঁটাল পোকা, জাব পোকা, শুঁয়া, মাজরা, গন্ধি, ভামা, কোরা পোকা, ফড়িং, লেদা পোকা, মরিচ পোকা। অন্ত নেই। এর উপর আছে পঙ্গপাল।

ফসলের শত্রু যেমন এরা, আবার এদের শত্রু হ'ল জল ফড়িং, ধামসা পোকা, পদ্ম পোকা। কাজেই তারা হ'ল চাষীর বন্ধু।

পার্থ মৃদু হেসে বলে, "কি ভাবে এদের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা যায়, তার কিছু কিছু উপায় যদিও আমরা সবাই জানি, তবু সঠিক প্রণালী আমরা জানি না। যেমন ধরুন কেরোসিনের আরক। কেরোসিন আমরা অনেক গাছেই দেই। কিন্তু কম, বেশী দিয়ে ফেলি। কিন্তু ঠিকমত দিতে হ'লে কেরোসিনের আরক তৈয়ার করতে হ'বে এ ভাবে। মন দিয়ে শুনে রাখুন। প্রথম আধপোয়া বার সাবান দেড়সের আন্দাজ জলে ভাল করে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর সাবান বেশ ভালমত মিশে গেলে আড়াইসের কেরোসিন তৈল অল্প অল্প করে ঐ জলে ঢেলে খুব ঘন ঘন নাড়তে হ'বে। তারপর তার সঙ্গে দশগুণ জল মিশিয়ে পিচকারী দিয়ে ক্ষেতে ছিটাতে হ'বে।"

কার্তিক উঠোনের উপর দিয়ে কোথায় চলেছে। সেও একটু বসে শুনে যায়, কি ব্যাপার হ'চ্ছে এখানে। কার্তিক উঠে গেলে শঙ্খমান বলে, "টোক নিয়ে গেল, কিসের সভা হচ্ছে এখানে। ব্যাটা এক নম্বরের ঘুঘু।"

সারথী তেতো হাসি দিয়ে ভাইয়ের কথায় পিঠে ফোঁড়ন কাটে। "দেখে গেল বোমা পিস্তল বানান শেখাচ্ছেন কি না?"

উঠে পড়ে পার্থ। "কাল আবার গন্ধকের গুড়ো কি ভাবে তৈয়ার করে বলবো।"

নদীর ধারে ধারে তামাক ক্ষেত। গাছের গোড়ায় গোড়ায় পিলি বাঁধা। গজেন আর শঙ্খমান তাদের ক্ষেতে গাছের ডগা ভেঙ্গে দিচ্ছে। পাশের ক্ষেতের

ছোট একটি ছেলেকে হুঁশিয়ার করে শঙ্খমান, "দেখিস বীজগাছের ডগা ভাঙ্গিস না।"

সতৃষ্ণ নয়নে দেখে পার্থ। তার বাবাও এমনি করেই সতর্ক করতো তাকেও ছোটবেলায়। মাঠ ফড়িঙের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতো তারা। কেরোসিন মিশিয়ে ছাই ছড়িয়ে দিয়ে আসতো সে তামাকের ক্ষেতে। চারা অবস্থায়ই শুরু হ'ত উইচিংড়ি আর চোরা পোকার উৎপাত। গাছের কচি পাতা, কচি ডগাগুলো কেটে রেখে যেতো ওরা রাত্রিবেলা। দিনের বেলায় গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতো। আর সন্ধ্যা হ'লেই ডাক শুরু হ'ত উইচিংড়িদের। সেই ঝিল্লিরব···সন্ধ্যার ঠাণ্ডামাটি···তামাক ফুল···তামাক পাতার কড়া গন্ধ আজ এক অস্পষ্ট ছায়াচিত্রের মত মনে হয়। যেন সুদূর—দূর অতীতের ধূসর অন্ধকার সন্ধ্যাকাশের বুক থেকে ভেসে আসছে কোন এক ছড়া বলার সুর—"ঝিঁ ঝিঁ লো আয়লো।"

ঝিঁ ঝিঁর গর্ত খোঁজার জন্য ছোট ছোট চাষীর ছেলের কি ঐকান্তিক চেষ্টা। উইচিংড়িদের হাত থেকে তামাক চারাদের রক্ষা করতে শিশুচিত্তের কত দায়িত্ব। সস্নেহে ভাবে পার্থ সেই শিশু পার্থর মুখখানা। দুটি সরল চোখে জীবন দায়িত্বের প্রথম অংকুর। প্রকৃতির সঙ্গে চাষীর ছেলের প্রথম সংগ্রাম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। হাজংদের চোরমাগা উৎসব সামনে। অন্ধকার নদীর ওপার থেকে ঢোল ও খোরার শব্দ ভেসে আসছে। নাচ গান পচাই আর কাছিমের মাংস।

রাত ভরে চলে স্ফূর্তি। দিন ভরে চলে কাঠ কাটা। সারথী কাঠ কাটতে যায়।

বিরাট এলাকা জুড়ে সরকারী রিজার্ভ ফরেষ্ট। মেহেগনী, শাল, চন্দন।

সরস্বতীর শাশুড়ী কয়দিন ধরে জ্বরে পড়ে রয়েছে। তাই সরস্বতীও যায় জ্বালানীর কাঠ সংগ্রহ করতে। সমস্ত দিন ধরে কাঠ কাটছে হাজংরা।

চালানীর কাঠ। বনের ধারে সারি সারি গরুর গাড়ী দাঁড়ান। বড় বড় কাঠের গুড়ি বোঝাই গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী চলেছে বড় নদীর দিকে।

নিথর, নিস্তব্ধ বন। শুধু কাঠ কাটার শব্দ। মস্ত একটা গজার গাছে ছ'দিক থেকে দুজনে কড়ুল ফেলছে। গাছের গোড়ায় কস পড়ে পড়ে জমে রয়েছে। সারথী একটা চাকা তুলে এনে দেয় সরস্বতীকে। "দেখ তোর জন্য কতখানি ধূপ নিয়ে এলাম।"

সরস্বতী মরা ডালের এক বোঝা বেঁধে নিয়েছে। সারথী তাকিয়ে বলে, "তুই রেখে যা এগুলো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো।"

আয়ত চোখে দেখে সারথী সরস্বতীকে। রাত জাগা উৎসবের মদালু আবেশ তার চোখে। সেই ছোট বয়স থেকেই দেখছে সে সরস্বতীকে। তবু দেখার পিপাসা মেটে না। খয়েরী পাতুনের তলায় প্রলুব্ধ স্বাস্থ্য, চোখে নিবিড় ভালবাসা, ঠোঁটে মাতাল আকর্ষণ আর এই নিরালা বনের ছায়া। এ জাগন্ত মুহূর্তকে বৃথা বয়ে যেতে দেবার মত কাপুরুষ নয় সারথী। তার দেহের বলিষ্ঠতায় সুভদ্রাহরণের অর্জুন প্রতিজ্ঞা। আত্মবিশ্বাসে সচেতন দুটি বাহু। চারদিকে লক্ষ লক্ষ সজাগ প্রহরী সঙ্গিন উঁচিয়ে রয়েছে বুঝি এই নিঝুম নিস্তব্ধতায়। এক দুঃসাহসী পুরুষের দুর্দমনীয় শক্তিতে খান খান হ'য়ে যায় প্রতিবাধার শানিত সঙ্গিন। সারথী দৃঢ় বাহুর নিবিড় বন্ধনে কাছে টেনে নেয় যৌবনের সহচরীকে। পুরুষ ঠোঁটের গাঢ় চুম্বনে বিবশ সরস্বতী। আরামে নিস্তেজ হ'য়ে আসে দেহ।

দূর থেকে শশ্মানের ডাক ভেসে আসে, "এই সারথী।" সরস্বতী নিজেকে মুক্ত করে নেয়—সশঙ্কিত স্বরে বলে, "ছাড়, ছাড় তোমার ভাই এসে পড়বে।"

সারথী অনুচ্চ স্বরে বলে যায়, "এই চোরমাগার সময়ই তোকে আমি বিয়ে করবো। না হলে আমি পুরুষের সন্তানই নই।" জ্বালানী কাঠের বোঝা নিয়ে চলে যায় সরস্বতী। বন পেরিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে হেঁটে চলে। একটা জবা গাছ থেকে দুটো ঝুমকো জবা ছিঁড়ে গোঁজে খোঁপায়।

পার্থর ঘরের সামনে দিয়ে চলেছে। বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে

পার্থ জানালা দিয়ে—যেন একখানা মূর্তিমতী প্রাণাবেগ এই সরস্বতী। ভীরু দুর্বল প্রেমিক প্রেমিকা নয় এরা। তাই গোপন অভিসারের কুণ্ঠা নেই চোখের তারায়। ঐ টকটকে লাল জবার মতই স্পষ্ট প্রেম। পাহাড়পুরের নায়ক নায়িকা।

পার্থর অন্তরীণের মেয়াদ শেষ। চৌকীদারের মুখে শুনেছে, শীগগীরই আবার সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাকে।

আবার কোন অনির্দিষ্ট জীবনের যাত্রা হবে, এখনও জানে না। কিন্তু এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার সংবাদে একটা ব্যথার রেশ জমে উঠেছে মনে। যেখানেই যাক, সারথী সরস্বতীর জীবনআগ্রহময় চোখে-মুখের এই আরক্তিম দীপ্তিটুকু কোনদিন ভুলবে না সে। প্রেমই জোগায় জীবনের উপলব্ধি। জীবনকে ভালবাসতে শেখায় এ প্রেম। তবু একি বিরাট "কিন্তু" স্থির হয়ে রয়েছে তার অনন্ত জিজ্ঞাসায়।

উঠোনের কোণায় কোণায় আগাছার গায়ে আশ্বিনের কচি রোদ। মিলনের মাঝেও যেন বিরহের রঙ সে রোদে।

উঠোনে বসে বোষ্টমীর গান শুনছে সুদাম, মঙ্গলা, লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ। বোষ্টমী গাইছে—"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী। উমা কেমনে রয়েছে। উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ—তাও বেচে ভাঙ খেয়েছে।"

বুকের ভিতরে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে মঙ্গলার এ আগমনীর গানে। "যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী।"

মা যে, সেই জানে, মায়ের প্রাণের এ যে কি ব্যথা। গিরিরাণীর এ আকুলতা, এ যে সকল মায়েরই চাপা কান্নার কথা। মঙ্গলাও যদি অমনি ডাক ছেড়ে সুদামকে বলতে পারতো—যাও যাও তাকে আনতে যাও।

লক্ষ্মণ উঠে যায় বেগুন ক্ষেতে জল দিতে। "এত সুন্দর বেগুন গাছগুলো পোকায়ই যে শেষ করে দিচ্ছে কি করি বলুন ত।"

সুদাম সুর কেটে উত্তর দেয়—

"বলে গেছে বরাহের পো। দশটি মাসে বেগুন রো।
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাহি কোন বিষাদ
ধরলে পোকা দিবে ছাই। এর চেয়ে অন্য উপায় নাই
মাটি শুকালেই ঢালবে জল। সকল মাসেই পাবে ফল॥"

একটু ঠাট্টার সুরে বলে সুদাম "চাষীর ছেলে, খনার বচন জান না? বেগুন গাছে পোকা ধরলে কি দেবে তাও জানতে এসেছ।"

লক্ষ্মণ লজ্জা পেয়ে উত্তর দেয়, "তা'ত জানিই। আমি ভাবলাম, আপনারা বুড়ো মানুষরা যদি আরও কিছু জানেন।"

সুদাম মুখ তুলে তাকায়—পিয়ন এসে দাঁড়িয়েছে টেলিগ্রাম নিয়ে।

"টেলী? কার টেলী?" বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে যেন মঙ্গলার। লক্ষণের নামে টেলিগ্রাম। টেলীগ্রামটা রাখে সে। কিন্তু পড়ে দেবে কে? ইংরাজীতে লেখা। পিওন মঙ্গলার বিবর্ণ মুখের দিকে লক্ষ্য করে বলে "খারাপ খবর না। পার্থ ছাড়া পেয়েছে।"

"সত্যি?" একসঙ্গে প্রশ্ন করে সবাই। কেউই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এত আকস্মিক সুসংবাদ।

সুদাম আবার জিজ্ঞেস করে, "সত্যি ত? ইংরেজী পড়তে পার?"

"পোষ্ট মাষ্টার বাবু কেরাণীবাবুকে বললেন, মনসাডাঙ্গার পার্থ ছাড়া পেল এদ্দিনে।"

"কিন্তু বাড়ী আসার কথা কিছু আছে?" ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকায় মঙ্গলা টেলিগ্রামের কারবণে লেখা অক্ষরগুলোর দিকে। পিওন অক্ষরগুলোয় একটু চোখ বুলিয়ে ফিরিয়ে দেয় লক্ষ্মণের হাতে। "তুমি বরং দীনু মাষ্টারের কাছে যাও।"

অর্জুন বলে, "দিন ওটা আমার কাছে। আমি এক দৌড়ে যাব আর আসবো।"

মঙ্গলা ঘরে এসে লক্ষ্মীর কাছে কপাল ঠুকে প্রণাম করে। "শনি সত্য-নারায়ণের পূজো দেবো, যদি সত্যি খালাস পেয়ে আসে সে।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই অর্জুন ছুটতে ছুটতে আসে। "দাদা কালই আসবে।" সারা শরীর দিয়ে আনন্দ ঝরে পড়ছে তার। আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না কেউই। লক্ষ্মী আর অর্জুন জল্পনা করে, দাদা তাদের চিনতে পারবে কিনা। "অর্জ্জুন তখন কয় বছরের ছিল মা, দাদা যখন সিলেটে পড়তে যায় ?"

"আট বছরের।"

লক্ষ্মণ কোদাল দিয়ে উঠোনের চারধারের জঙ্গল পরিষ্কার করছে। লক্ষ্মীকে ডেকে বলে, "বসে না থেকে ঘরদোরগুলো লিপে মুছে রাখ।" "একটু ঠাট্টার সুরে বলে, "বি-এ পাশ দাদা আসছেন—এবার আর বোনের পা মাটিতে পড়বে না।"

"তা'ত পড়বেই না। এই তিন গ্রামের মধ্যে পাশ দেওয়া ছেলে আর আছে ?" লক্ষ্মীও একই সুরে উত্তর দেয়।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গোবর মাটি ছেনে নেয় সেও। কয়দিন আগে ঝড়জল গেছে। পিড়েগুলোয় সব কেঁচোমাটি উঠে রয়েছে। গৃহস্থঘরের মেয়ে—হাতের ছোঁয়াতেই কেমন শ্রী ঘুরে আসে ঘরে। বাড়ীঘর ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করে' উঠে। ধানের গোলাটার তেল সিঁদুরের ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। আবার নূতন করে তেল সিঁদুর দিয়ে লক্ষ্মী মূর্তি এঁকে রাখে মঙ্গলা।

মঙ্গলা সারা দুপুর ভরে' বিছানার কাঁথা, বালিশ ঢাকনি, মশারী সব কেচে গুছিয়ে রাখে। কোন রকম কষ্ট যেন না হয় পার্থর। বুকটা ঢিব ঢিব করে বার বার—পার্থ, তার সেই পার্থ-ই আছে ত ? লেখাপড়া শিখে এ গৃহস্থ ঘরে মন যদি না টিকে তার ?

কোন গাড়ীতে আসবে, কিছুই লেখেনি পার্থ। তবু আন্দাজে ষ্টেশনে

যাবার উদ্যোগ করে লক্ষ্মণ আর অর্জুন ভোরে উঠে। লক্ষ্মণ সার্টটা গায়ে দিয়ে লক্ষ্মীকে বলে, "দেখ দেখি সাজটা ঠিক হল কিনা।"

অর্জুন ঠাট্টার সুরে বলে, "আপনার রকম দেখে মনে হচ্ছে হেন জামাই আনতে চলেছেন।"

সুদাম উত্তর দেয়, "তা প্রায় ত সেই রকমই। জামাই-ই এ বাড়ীর ছেলে। আর ছেলেই জামাই।"

মফির মা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয়, "তোমাগো পার্থ আসতেছে। ঐ ত সড়কের উপর—সুটকেশ হাতে আসতেছে।"

এক সঙ্গে সবাই এগিয়ে যায়। আলি, আলির চাচা, চাচী, অমূল্য, অমূল্যর খুড়ি—খাল পারের ছেলে বুড়ো সবাই এসে ভীড় করে সুদামের বাড়ীর ঘাটে।

পার্থ সলাজ হ'য়ে উঠে তার গ্রামের মানুষের এত উচ্ছসিত অভিনন্দনে।

আট বছর পর বাড়ীর উঠোনে সে। মফির মা ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে। "চিনতে পারলা নি?"

পার্থ সলজ্জ হাস্যে ঠাট্টার সুরে উত্তর দেয়, "সেই পেয়ারা গাছটা আছে ত? জেলে বসে তোমার পেয়ারা গাছের গল্প করতাম।"

"সত্যি? আমাদের কথা মনে ছিল জেলে গিয়েও?"

মফির মায়ের সারা মুখে হঠাৎ খুশি ছড়িয়ে পড়ে। ঢিলা চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে মনের খুশি উপচে উঠে।

মঙ্গলা, সুদাম এই আনন্দের ভীড়ের মাঝে কথা বলতে পারে না। কথা বলছে শুধু তাদের চোখ দু'টি। তাদের পার্থ-ই উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে! পার্থর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ আর ফেরাতে পারে না মঙ্গলা। বারে বারে মায়ে ছেলে চোখে-চোখে হয়। মায়ের এ দৃষ্টিতে একটা ক্ষীণ ব্যথার ধারা নিস্তেজে বয়ে চলে কথাবার্তা, হাসি তামাসার আড়ালে পার্থর মনের

ফল্গু দিয়ে। দু'টি সাধারণ চোখ। কিন্তু ঐ চোখ দু'টির মাঝে আট বছরের কত ব্যাকুলতা নিবিড় হ'য়ে রয়েছে। আর এ আট বছরে কত কম ভেবেছে সে মায়ের কথা। গ্রামবাসীর কথা। কি একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ মনের গভীর গভীরে।

লক্ষণ গায়ের সার্টটা খুলে, কোমরে গামছা জড়িয়ে নিয়ে পুকুরের দিকে যায় একটা ঝাঁকি জাল নিয়ে। পার্থর দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার সুরে বলে, "বাড়ীর কুটুম এসেছে। যাই, দেখি দুই একটা রুই কাতলা উঠোতে পারি কি না।"

হাসে পার্থ। এ ঠাট্টাটুকু অন্তর দিয়েই সমর্থন করে সে। সত্যি কুটুমই ত সে।

লক্ষ্মী এসে দাঁড়ায় সামনে এক মুখ হাসি নিয়ে। "এই ঝাঁকি জাল দিয়ে রুই কাতলা ধরে খাওয়াবে তুমি দাদাকে?"

"রুই না উঠুক পুটি চাঁদা ত উঠবে। তা' বুঝি দাদার পাতে দেওয়া চলবে না?"

লক্ষ্মীকে দেখে গেছে পার্থ বার বছরের নোলকপরা মেয়ে। আর আজ সে স্বামীর সঙ্গে কপট কলহে মত্ত। সব কিছুই নূতন চোখে দেখে পার্থ। একটু অপরূপ চোখেও দেখে। এতকাল ধূমকেতুর মত যেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে চলেছে। শুধু ছোটার নেশায়ই সে চলা—শুধু চলা—শুধু চলা। তার মাঝে এ স্নেহনিবিড় অভ্যর্থনা, এ স্নিগ্ধ গৃহছায়া—কোনও রেল জংসনে পরবর্তী গাড়ীর অপেক্ষায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার মতই লাগে। এ গৃহকোণে ফিরে আসার সুর চিরদিনের জন্য ছিঁড়ে গেছে মনে হয়। তাই মায়ের চোখের ঐ শান্ত প্রতীক্ষার শেষ কোনদিন আর আসবে না। সে সংবাদ একমাত্র সেই শুধু জানে। এক গৃহত্যাগী চৈতন্য লুকিয়ে রয়েছে তার মনের প্রান্তরে।

ছদ্মবেশী মনে হয় নিজেকে এত আন্তরিক আত্মীয়দের মাঝে। সত্যি, অতিথিই সে আজ নিজ গৃহে।

উঠোনের এককোণায় বিকেলের রোদ পড়েছে ঘাসের উপর। একটা হলুদ

রঙের সন্ধ্যামালতি গাছে ফুল ফুটে উঠেছে। পল্লী-বধূর স্নিগ্ধতা সে ফুলের নম্রতায়।

ঘরে ফেরার জন্য গাভী ডাকছে মাঠে। নিজেরই গ্রামের এ নিবিড় সুর বড় করুণ হ'য়ে বাজছে যেন কোথায়।

লক্ষ্মী চা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। চোখেমুখে চপল হাসি। "দেখো, আমিও চা বানাতে শিখে গেছি।" "কেন, লক্ষণ এখনও চা ধরেনি?" "দুষ্টুমীর সুরে প্রশ্ন করে পার্থ।

লক্ষ্মী আরও মিষ্টিস্বরে প্রশ্ন করে, "এই পেয়ালাটা আজ কে কিনে এনেছে জানো?"

পার্থ সস্নেহে হাসে। "জানি।"

পার্থর পাঠশালার বন্ধু লক্ষণ। লক্ষণ, আলি আর পার্থ—তিনটি কিশোর ছেলের কত গভীর হৃদ্যতা ছিল একদিন। আর আজ কতদূরে সরে গিয়েছে সে।

লক্ষণকে, আলিকে প্রয়োজন তার, কিন্তু সেই কিশোর বন্ধুত্বের দাবীতে নয়, —সহকর্মীর দাবীতে। স্নেহ অনুভব করছে পার্থ লক্ষ্মীর প্রতি, অর্জুনের প্রতিও যেমন স্নেহ করতো সে সারথী, সরস্বতীকে। তার এ অনাত্মীয় স্নেহে আহত না হয় ভাইবোন, মা বাবা,—হুঁশিয়ার হ'য়ে চলে সে।

পার্থ চায়ের পেয়ালাটা রাখতে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে—সুদাম একটা কাঁসার গ্লাসে চা নিয়ে বসেছে রান্নাঘরের দুয়ারে, মঙ্গলা নারকেল ছুলছে। পার্থ তার পেয়ালাটা ধুয়ে এনে বাবার গ্লাস থেকে চা-টা ঢেলে দেয় সে পেয়ালায়। "দেখুন আমার জন্য কি সুন্দর চায়ের পেয়ালা কিনে এনেছে লক্ষণ।" একটু দুষ্টুমীর সুরে বলে, "কুটুম এসেছে কিনা বাড়ীতে।" মার হাত থেকে নারকেলটা নিয়ে বলে, "দাও, আমি ছুলে দিচ্ছি।"

সারাদিনে বাবার সঙ্গে কথাই হয়নি—এত লোক এসেছে তাকে দেখতে।

সুদাম আশ্বস্ত হয় মনে মনে। তাহ'লে সেই পার্থই আছে। পার্থ বদলায় নি· তবু সশংকিত স্বরে প্রশ্ন করে সে, "বাড়ীতে থাকবেত এখন?"

পার্থ করুণভাবে হাসে সুদামের সশংক স্বরে। "এখনত আছি। তারপর দেখি।"

"আর দেখাদেখি নেই। আমাদের দিকে একটু তাকাও এখন।" ছেলের দিকে নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে বলে মঙ্গলা। অভিমানে ভারী হ'য়ে আসে কথাগুলো। "তোমরাত জেলে জেলেই কাটালে জীবন। আর এদিকে দেশের মানুষগুলো মরে আছে, না বেঁচে আছে, তা'ত দেখলে না কোনদিন। দেশের মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে এ কেমন ধারা স্বদেশী—আমরা মুর্খ মানুষ বুঝে উঠি না।"

পার্থ আশ্বাস দিয়ে সহাস্যে বলে, "দেশের মানুষদের আর বাদ দেওয়া হ'বে না মা। এখন থেকে তোমাদেরও চাই।"

পাহাড়পুরের গল্প আরম্ভ করে পার্থ। গল্প আর ফুরোয় না। সমস্ত চৈতন্য দিয়ে পার্থর মুখে গল্প শুনছে মঙ্গলা—শুনছে পার্থর গলার স্বর। কতকাল পর এ স্বর শুনছে সে! থেকে থেকে পুলকে জ্বলজ্বল করে ওঠে চোখমুখ।

উঠোনে সন্ধ্যার ছায়া নামছে। মাটি ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। লক্ষ্মী উঠে যায় বাতি ধরাতে। পার্থ কথা থামিয়ে হঠাৎ বলে, "উঃ দারুণ মশা ত? আগের মতই ম্যালেরিয়া আছে?"

"ম্যালেরিয়া থাকবে না? ম্যালেরিয়া আমাদের জন্মসাথী।" তিক্তস্বরে উত্তর দেয় সুদাম। অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রতি জোয়ে জ্বর আসে তার। "এই জল টান দেবার সময়ই দেখবে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া।"

"এক বছরের মধ্যে ম্যালেরিয়া তাড়াবো আমরা।" এই 'আমরাটা' কারা, বুঝে ওঠে না সুদাম, মঙ্গলা কেউই। তবু উত্তর দেয়, "তাইত বলি, এবার এই দেশের মানুষগুলির দিকে একটু তাকাও।"

আলি এসেছে। পার্থ উঠে যায়। "যাই একটু ঘুরে আসি তালপুকুর থেকে। মাস্টার মশাইর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

মঙ্গলা ডেকে বলে দেয়। "সাবধানে যেও বাপু। তুমি ত এখন শহুরে ছেলে হ'য়ে গেছ।—এ কিন্তু শহুরে রাস্তা নয়। গ্রামদেশের রাস্তাঘাটে রাত বেরাতে ওরা কিন্তু ঘুরে বেড়ায়।"

পার্থ হাসে। এই 'ওরাটা' কারা বোঝে। রাতে সাপের নাম নেবে না। আলির সঙ্গে বের হয় পার্থ। কিন্তু তালপুকুরে আর যাওয়া হয় না।

আলির ঘরে গিয়ে আবার কথায় ডুবে যায়। লক্ষণও এসে বসে। পথকর আন্দোলনের কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শোনায় আলি। ঘরের একটা আধাপোড়া কাল থামের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিয়ে বলে, "ঐ আমাদের সে আন্দোলনের সাক্ষী আজও রয়েছে।" জগাই বাঁড়ুজ্যে ঘরে আগুন ধরিয়ে যায়। এ কর আমরা না উঠিয়ে ছাড়তাম না। কিন্তু কংগ্রেসের প্রিয়তোষবাবু মধ্যস্ততা করে' বললেন—জমিদাররা ত আমাদের দেশেরই মানুষ। তাঁরা নিশ্চয়ই একদিন আমাদের কষ্ট বুঝবেন।" বিদ্রূপের সুরে বলে আলি।

পার্থ লক্ষ্য করে আলির কথার ঝাঁঝটুকু। সে উত্তর দেয়, "হাঁ, জমিদাররাও এদেশেরই মানুষ ঠিকই। তবে তারা আমাদের মিত্র নয়। জমিদার আর কৃষক দু'টো জাত। তাদের মধ্যে সম্পর্ক হ'ল সাপ আর বেজীর। শুধু এদেশে নয়—সারা দুনিয়ায়। রাশিয়ায় আজ জমিদারদের সরাতে পেরেছে বলেই কৃষকদের এত উন্নতি। রাশিয়ার কৃষকদের কথা তোমরা হয়তো এখনও কিছুই জান না। আমাদের মতই জমিদার দ্বারা তারাও এমনি ভাবে অত্যাচারিত হ'ত। এমনি অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অজ্ঞতার অন্ধকারে তাদের দিন কাটতো। কিন্তু আজ তাদের গল্প শুনলে তোমরা অবাক হ'য়ে যাবে। সেখানে এখন চাষীদের মধ্যে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, ব্যাধি, দারিদ্র্যের যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে এসেছে সুন্দর, সুস্থ জীবনের আনন্দ, সুখ। সেখানে যৌথ খামারের কৃষকরা এখন স্কুলে যায়, লেখাপড়া শেখে, দৈনিক খবরের কাগজ

পড়ে, লাইব্রেরীতে যায়, উপন্যাস পড়ে, গ্রামোফোন, রেডিও শোনে, সিনেমা দেখে, খেলাধূলা করে, বক্তৃতা দেয়, অসুখ করলে স্বাস্থ্যনিবাসে থাকার সুযোগ পায়—এক কথায় তারা যে সুখসুবিধা আজ পাচ্ছে, তা তোমাদের কল্পনারও বাইরে।"

আলি আর লক্ষণ তন্ময় হ'য়ে শোনে রাশিয়ার কৃষকদের গল্প, যৌথখামারের গল্প—শ্রমিকদের গল্প। গল্প বলতে বলতে পার্থর চোখে সেই কোন্ দূর দেশের স্বপ্ন নেমে আসে। গভীর আবেগের সুরে বলে চলে সে, "কিন্তু এ সুখের জীবন পেতে শত শত কৃষক প্রাণ দিয়েছে। শত শত শ্রমিককে গুলি মেরেছে ধনীরা, জমিদাররা, ব্যবসাদাররা।—শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়েছে তারা। তবু অসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, জীবনদানের পর আজ সেখানে শ্রমিক কৃষকদেরই রাজত্ব, শ্রমিক কৃষকরাই সেখানে দেশ শাসন করে। এখানে যেমন দেখছো লীগের মন্ত্রীত্ব। লীগের মন্ত্রী কি? না, বড় বড় জোতদার, জমিদারের মন্ত্রীত্ব। সেখানে তেমনি কৃষক, শ্রমিকদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী নির্বাচিত হয়। তারপর তারাই আইন করে, আইন চালায়……এর নাম সেখানে বলে সর্বহারাদের নেতৃত্ব।"

লক্ষণ বলে, "ঠিকই নাম দিয়েছে—সর্বহারাই আমরা।"

অর্জুন ডাকতে এসেছে। গল্পের নেশায় খেয়াল নেই—এত রাত হ'য়ে গেছে। উঠে পড়ে সে। "চলি আজ। আবার আরেকদিন শোনাব।"

লক্ষ্মী এখনও কাজ সেরে আসেনি। লক্ষণের ঘরে বসে আবার একটু গল্প করে পার্থ। লক্ষণ বলে, "আলি ত আবার এক ফ্যাকড়া বাধিয়ে রেখেছে। কালো ঠারানের বিধবা মেয়ে মেঘীকে বিয়ে করবে মনস্থ করেছে। কেউ অবশ্য জানেনা এ খবর।"

বিস্মিত হয় পার্থ। "মেঘীকে বিয়ে করবে আলি? কি করে করবে?"

"কেন, মেঘীকে নিয়ে পালিয়ে যাবে শহরে।"

রাত গভীর হ'চ্ছে। সারাদিনের কথায়, গল্পে উত্তেজনায়, আনন্দে ধীরে

ধীরে অবশ হ'য়ে আসছে স্নায়ুগুলি। চোখের পাতা ভারী হ'য়ে আসছে ঘুমে। পার্থ উঠে যায় শুতে। বড় ঘরের বারান্দায় তার বিছানা হ'য়েছে সুদামের তক্তপোষে। সুদাম আজ ঘরে গিয়ে শোয়।

অর্জুন হারিকেনের সামনে তখনও পড়ছে। পার্থ ভাইয়ের কাঁধে হাতখানা রাখে। "কোন্ ক্লাসে পড়ছিস?"

"ক্লাস এইটে।"

"আমার সঙ্গে ক'খানা ভাল বাংলা বই আছে। কাল বের করে দেবো তোকে।" খুশিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে অর্জুন দাদার এতটুকু স্নেহের কথায়।

পার্থ মাকে বলে, "আমি এবার শুয়ে পড়লাম, বড় ঘুম পেয়েছে। কিন্তু মশারীটা না হ'লেই ভাল হ'ত। মশারীর মধ্যে শুতে দম বন্ধ হ'য়ে আসে।"

সুদাম আপত্তির সুরে বলে, "না, না, মশারী ছাড়া চলবে না। মশায় ছেঁকে ধরবে।"

অর্জুনও বই থেকে মুখ তুলে বলে, "তাছাড়া এখানে এখন দারুণ ম্যালেরিয়া।"

পার্থ মৃদু কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করে ভাইয়ের উপদেশ। শুয়ে পড়ে। ঘুমভরা চোখের পাতায় নিশীথ রাত্রির কোন অব্যক্ত বেদনা। বোঝে না পার্থ, কি এক দুর্বোধ্য ব্যথায় ভারী হ'য়ে রয়েছে বুকের মধ্যে। অবচেতন মনের কোন নিভৃত বিলাপে।

মেঘী স্নান করে এসে লক্ষ্মীর আসন সাজাচ্ছে—বৃহস্পতিবার। হঠাৎ বোমার মত ফেটে পড়ে কালোঠারান, "হারামজাদী, ঐ হাতে আর ঠাকুর দেবতার ফুল ছুঁতে হ'বে না। কুলটা মাগী, আমার ঘর থেকে বের হ।" বুক কেঁপে ওঠে মেঘীর। সর্বনাশ, সব বুঝি ফাঁস হ'য়ে গেছে।

বাইরে উঠোনে বসে সিগারেট ফুঁকছে জগাই বাঁড়ুজ্যে—হাতে আলির লেখা চিঠিটা। দীঘির পাড়ে রেখে জলে নেমেছিল মেঘী।

"কিগো, শ্রীরাধিকা, আর লোক পেলে না, একেবারে জাত-ধর্ম খুইয়ে পিরীত ?" জিঘাংসায় মুখটা বীভৎস ক্রুর, কুটিল হ'য়ে উঠেছে জগাই বাড়ুজ্যের।

মুহূর্তের মধ্যে লোকের ভীড় জমে যায় উঠোনে। গ্রামের মোড়ল ব্যক্তি সব, আর ফাজিল ছোকরার দল।

জমিদারের মামা আসে বিচার করতে। গ্রামের মধ্যে এত বড় পাপ। জগদীশ মুরুব্বীর সুরে বলে, "ওর মাথা ন্যাড়া করে সমস্ত গ্রামে ঘুরিয়ে আনা হোক। গ্রামে বৌ ঝি-রা দৃষ্টান্ত দেখে রাখুক—পিরীত করার শাস্তি কেমন হয়।"

কানাই পুরুত হুঁকোটা জগাইর হাতে দিয়ে বলে, "মাথা মুড়িয়ে দিলে চুল উঠতে আর কদিন। আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে দাও। জন্মের মত মনে থাকবে এ কলঙ্কের দাগ।"

নাপিত ডাকিয়ে মাথা মুড়িয়ে দেয় মেঘীর। পিঠ ছাওয়া কাল চুল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

জগদীশের ছেলে বলে, "ক্যামেরা থাকলে একখানা ফটো তুলে রাখা যেত।"

দাঁতে দাঁত ঘষে বিকৃত চাপা কণ্ঠে বলে জগাই, "এত অপমানেও বজ্জাতির এক ফোঁটা জল নেই চোখে। দাঁড়াও ওকে আলিদের পাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ছাড়বো।"

পার্থ আলির ঘরে বসে রুশ বিপ্লবের কাহিনী বলছে। বই খুলে ছবি দেখায়। নভেম্বর বিপ্লবের ছবি। "লাল পতাকার মর্যাদা সেখানে প্রাণের চাইতেও বেশী।" দীপ্ত কণ্ঠে বলে পার্থ, "সে পতাকা কোনও একটি দেশের পতাকা নয়। সমস্ত পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের পতাকা। সমস্ত পৃথিবীর ধনীর সঙ্গে ধনীর যেমন আত্মীয়তা, ঠিক তেমনি আবার সমস্ত পৃথিবীর দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রের—অর্থাৎ যারাই অত্যাচারিত—তাদের মধ্যে মনের আত্মীয়তা রয়েছে। তাই কি না ? এই যেমন তুমি মুসলমান হ'য়েও নবাবদের সঙ্গে দোস্তালী করতে পারবে

না। তোমার মনের মধ্যেই বাধা রয়েছে। অথচ হিন্দুর ছেলে লক্ষণের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হ'তে পেরেছে অনায়াসে। তার কারণ তোমার দুঃখের কথা আজ যত সহজে লক্ষণ বুঝবে, ধনী, জমিদার মুসলমানরা তা বুঝবে না।

এই যে সম্পর্ক, এটা ধর্মের সম্পর্ক নয়। জাতির সম্পর্ক নয়, দেশেরও নয়। ঠিক আমাদেরই মত বিলেতেও কৃষক রয়েছে, শ্রমিক রয়েছে। এমনি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তাদের। এমনি ছেঁড়া জামা গায়ে, ঘরে খাবার নেই। এখানকার পাটের সাহেবদের দেখে দেখে তোমরা সাহেবদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছ। ভাব, সাহেবরা বুঝি সবাই বড়লোক, সবাই এমনি ট্রলি হাঁকিয়ে চলে, পোষা কুকুর আর রঙমাখা মেম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তা' নয়। এই দেখ ওদেশের শ্রমিকদের ছবি। ছেঁড়া জামায় পিঠ ঢাকা পড়ছে না। মেয়েরা পর্যন্ত খাটতে খাটতে নুয়ে পড়েছে। এক শ্রেণীর লোকের এমনি কষ্ট সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। বিলেতে, আমেরিকায়, চীনে, জাপানে, সব দেশে। সেই শ্রেণীর নাম সর্বহারা শ্রেণী।"

আলির নিবিষ্ট মুখের দিকে স্থির চোখে তাকায় পার্থ। পেশীমান বাহুতে যেন সেই আগামী নওজোয়ানের স্বাক্ষর।

আবার বলতে শুরু করে পার্থ, "যারাই অত্যাচারিত, তারাই সেই সর্বহারা শ্রেণীর লোক—"

আচমকা কথা থেমে যায় পার্থর। বাইরে কিসের যেন গোলমাল। মফির মা ছুটে আসে, "কি সর্বনাশ, বামুন বাড়ীর মেঘীরে কি দশা করছে দেখ।"

ঘর থেকে ছুটে বের হয় পার্থ, আলি, লক্ষণ। পাড়ার ছেলেমেয়ে সবাই হতবাক, স্তম্ভিত।

চোখ নামিয়ে হেঁটে চলেছে মেঘী। মাথা মোড়ান। গালে কাল পোড়া দাগ। আগে পিছে জগাই বাঁড়ুজ্যে, জমিদারের মামা, আর কয়টা বাচ্চা ছেলে।

বিদ্যুৎ তাড়িতের মত সমস্ত শরীর ক্রোধে ঝলসে ওঠে পার্থর। জগদীশের সামনে এগিয়ে গিয়ে গর্জে ওঠে, "ভেবেছেন কি, গ্রামে একটাও মানুষ নেই?"

মেঘীর দিকে তাকিয়ে বলে "মেঘী বোন, তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো আমার বাড়ীতে।"

জগদীশ পার্থর সামনে রুখে আসে, "কি, চাষার ছেলের এত বড় আস্পর্দ্ধা ?"

"হ্যাঁ, চাষার ছেলেরই এই স্পর্দ্ধা থাকে। এত বড় অন্যায় তারা কখনই সহ্য করে না। আপনাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনবো। একটি বয়স্থা মেয়ের মান নষ্ট করার কোনও অধিকার নেই আপনাদের।"

জগাই বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, "আর মিঞার সঙ্গে পিরীত করে যে মাগী, তার আবার মান-ইজ্জতের কিছু বাকি আছে ?"

ক্রোধে বুকের ভিতরে কাঁপছে পার্থর। গর্জে ওঠে সেও, "না, তা'তে মান নষ্ট হয় না। আমরা আলির সঙ্গেই তার বিয়ে দেবো। দরকার হ'লে পুলিসেরও সাহায্য নেবো। সাবালিকা কন্যার স্বাধীন মতের বিরুদ্ধে বাধা দেবার আপনাদের কোনও অধিকারই নেই।'

জগদীশ পার্থর এ অগ্নিমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে যায়। স্বদেশী ডাকাতী করা ছেলে। পিস্তল টিস্তল নাকি এদের সঙ্গেই থাকে। তাছাড়া শেষে যদি সত্যি মানহানির মামলা বাধিয়ে বসে। গলার স্বর নামিয়ে মৃদু মুরুব্বির সুরে বলে, "কিন্তু এটা কি ভাল কাজ হ'বে ? বামুনের মেয়ের সঙ্গে মুসলমানের ছেলের বিয়ে ?"

"সে বিচার তারা নিজেরাই করবে।" উত্তর দেয় পার্থ। জগাই দলবল নিয় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে যায় শাপ দিতে দিতে। "নরকেও স্থান হবে না ওর। ব্রহ্মশাপ গায়ে লাগবে।"

পার্থ একটা গাছতলায় এসে বসে পড়ে। মাথার মধ্যে দাবানল জ্বলছে তখনও। এখনও কি ভয়ানক সমাজপতিদের অত্যাচার !

আলি মাথা নিচু করে বসে রয়েছে ঘরের দুয়ারে—লজ্জায় যেন মাথা তুলতে পারছে না। পার্থ উঠে আসে সামনে। গাঢ়স্বরে বলে, "এত ভেঙ্গে

পড়লে চলবে না তোমার। আজই সদরে গিয়ে—রেজিষ্ট্রি করবে তোমরা। আমি আর লক্ষ্মণ সঙ্গে যাব।"

"কিন্তু আমি আর এ গ্রামে ফিরবো না।" ক্ষুব্ধস্বরে বলে আলি।

দুপুরের গাড়ীতেই রওয়ানা হ'য়ে যায় পার্থ এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করতে। লক্ষ্মণকে বলে যায়, "গ্রামের দু'চারজন লাঠিয়াল ছেলে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হ'য়ো তোমরা। জমিদার সঙ্গে রয়েছে ওদের। এত সহজে নিষ্কৃতি দেবে না।"

সন্ধ্যাসন্ধি মেঘীকে নিয়ে গরুর গাড়ী ছাড়ে। রাত্রির গাড়ীতে যাবে। আমিনুদ্দি চোখের জল মুছে বিদায় দেয় আলিকে। জন্মের মতই বিদায় নিয়ে চল্ল আলি এ গ্রাম থেকে।

সুদামও নিশ্চল হ'য়ে বসে থাকে ঘরে। কাজটা একবার সায় দেয়, একবার সায় দেয় না মনে। বামুনের মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে—ঘর সংসার চলবে কি ভাবে কে জানে? নামাজ পড়বে, কলমা পড়বে মেঘী? আবার ভাবে, নামাজ কি আলিই পড়তো কোনদিন? এরা সব আলাদা জাত। আলাদা যুগের আলাদা মানুষ। পার্থ, আলি, লক্ষ্মণ—এরা কলিকালের ছেলে সব। তাছাড়া এ বিয়ে না দিলেও মেয়েটার দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

মঙ্গলা মেঘীদের রওয়ানা করে দিয়ে এসে বলে, "গালের ওপর টিকের আগুন দিয়ে ছ্যাকা দিয়ে দিয়েছে মেয়েটার। এরা কি মানুষ নয়?"

আলি মেঘীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসে পার্থ। ট্রেণ ছেড়ে দেয়। শেষবারের মত দেখে নেয় আলি মেঘী তাদের আশৈশবের পরিচিত গ্রামের দূর বনানী।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আসে পার্থ। গেট কিপারের কাছ থেকে সাইকেলটা চেয়ে নেয়। সারাদিনের শ্রান্তি ক্লান্তির আড়ালে সফলতার আনন্দ অনুভব করছে। তবু থেকে থেকে বেদনায় ভরে উঠছে মন। বিনা অপরাধে নির্বাসিত হ'ল আলি নিজ গ্রাম থেকে। তালপুকুরের নদীর ধার দিয়ে চলেছে

পার্থ। হঠাৎ দেবকীকে দেখে:সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ায়। নদীতে জল আনতে যাচ্ছে দেবকী।

"কেমন আছ দেবকী?" সামনে এসে দাঁড়ায় পার্থ।

দেবকী পার্থর মুখের দিকে তাকায় পূর্ণায়ত চোখে। যেন কত দূর থেকে দেখছে সে পার্থকে।

"কেমন আছি?" উত্তর দিতে গিয়েও উত্তর আসে না। কলসীটা মাটিতে রেখে আবার তাকিয়ে দেখে সে পার্থকে।

পার্থ কৈফিয়তের সুরে বলে, "আমি শুনেছিলাম, তুমি শ্বশুরবাড়ীতে আছ। আর এখানে এসেই কাজে এত জড়িয়ে পড়েছি, তাই দেখা করতে পারি নি। কেমন আছ বল্লে না? তোমার শ্বশুরবাড়ীর খবর সব ভাল ত?"

দেবকী মনে মনে আর্তস্বরে বলে ওঠে, "কেমন আছি দেখাতে পারতাম যদি তোমাকে! ব্লাউজের তলায় চিরদিনের জন্য স্বামীর আদরের চিহ্ন বয়ে বেড়াব আমি। তবু এ চিহ্ন তোমাকে দেখাবার নয়। যে মানুষ পারতো তাকে সুখী করতে, তার কাছে এ গ্লানির চিহ্ন দেখিয়ে আজ আর কি লাভ?

মনে মনেই বলে দেবকী, তোমার কাছ থেকে পাওয়া ক্ষত যে কোনদিন শুকোবে না পার্থদা, তা'ও তুমি জানলে না। আর আজ তুমি এসেছ কেমন আছি জানতে?

জল নিয়ে চলে যায় দেবকী। পার্থকে বলে যায়, "যেও একদিন, আমি এখন এখানেই আছি।"

চলে গেল দেবকী। মনে হয় পার্থর যেন একখানা অশরীরী কান্না হেঁটে চলে গেল। কেমন এক বিষণ্ণতায় ছেয়ে ফেলে সমস্ত মনটাকে। সাইকেলটা নিয়ে ধীরে ধীরে চলে নদীর ধার দিয়ে। এখনও কি রাগ করে' রয়েছে দেবকী তার ওপর?

পরদিন দুপুরে দেবকীদের বাড়ীতে যায় পার্থ। উঠোনভর্তি ধান রোদে দেওয়া হ'য়েছে। দেবকী ধামা করে মাচাতে তুলছে ধান। চোখে, মুখে, চুলে ধানের ধুলো। কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়ান, আধময়লা লালপাড় শাড়ি। ঘোমটা বিহীন সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। কপালে সিঁদুরের টিপ— যেন মূর্তিমতী একটি রক্তবর্ণ তিরস্কার। পার্থ নিমেষের দৃষ্টিতে দেখে নেয় সম্পূর্ণ মূর্তিখানি।

সুবালা সুপারি কাটতে বসেছে বারান্দায়। কুন্তীকে ডেকে বলে, "পার্থকে বসতে দে। জলচৌকীটা এনে দে কুন্তী।"

দুয়ারের সিঁড়িতেই বসে পড়ে পার্থ—"কিছু আনতে হ'বে না। আমি এখানেই বসছি।" এতক্ষণে হাসি ফোটে দেবকীর চোখে। মৃদু আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করে পার্থর চোখে মুখে ক্লেশের ছায়া। আশ্বস্ত হয় পার্থ। লক্ষ্য করে, মেঘ কেটে রোদের আভাস দেখা দিয়েছে তার চোখের খুশিতে।

সুবালা সুপারি ছুলতে ছুলতে বলে, "তোমাদের গ্রামের আলির সঙ্গে মেঘীর বিয়ে হ'য়ে গেল। তুমিই নাকি দিলে এ বিয়ে?"

"এ বিয়ে হ'তই ওদের। তবে আমি কিছু সহায়তা করেছি।"

পার্থর স্বরের দৃঢ়তায় আর কোনও উচ্চবাচ্য করে না সুবালা। সসম্ভ্রমেই কথা বলে আজ সুবালা পার্থর সঙ্গে। কথা-বার্তায় একটা সহবত আছে পার্থর।

দীনবন্ধু পাঠশালা থেকে আসে। পার্থকে দেখে দারুণ খুশি হয়। "তুমি যে ছাড়া পেয়েছ, পিয়নের কাছেই শুনেছি।" পার্থ উঠে প্রণাম করে।

লজ্জিত হ'য়ে বলে, "এসেই এমন একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তাই আসতে পারি নি।"

"তা'ও শুনেছি। তোমরা নাকি আবার কম্যুনিষ্ট হ'য়েছ। আমরা শুধু জানতাম এক কংগ্রেসই স্বদেশী করে। কম্যুনিষ্ট আবার কি, তা'ত বুঝলাম না। শুনি তারা নাকি বলে, সকল মানুষই সমান।"

দেবকীর ধান তোলা শেষ হ'য়ে গেছে প্রায়। উঠোন ঝাড় দিয়ে চারদিকে ছড়ান ধানগুলো জড়ো করে। মফির মা এসে বসেছে কলাই শাক নিয়ে। সুবালা কুন্তীকে ডেকে "চারটি চাল দিয়ে শাক ক'গাছা রাখ ত কুন্তী।"

মফির মা দেবকীকে ভাল করে একটু লক্ষ্য করে বলে সুবালাকে, "সন্ধ্যার পর যেন আর ঐ গাবতলা দিয়ে ঘাটে যায় না বড় মাইয়া। পোয়াতী মানুষের উপর ওগো নজর থাকে। প্রথমকারটা ত নষ্ট হইয়া গেল—"

কথা থামিয়ে হঠাৎ তাকায় পার্থ দেবকীর দিকে সপ্রশ্ন চোখে। এ দৃষ্টির প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা বুঝে চোখ নত করে দেবকী। সঙ্গে সঙ্গে একটা ম্লান বিমর্ষ ছায়া ছড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গে—পাংশু বিবর্ণ হ'য়ে উঠে চোখ-মুখ।

সন্তান আসছে তার। কিন্তু পার্থদা ত জানবে না কোনদিন, কত গ্লানির এ সন্তান। এ যে কত বড় এক বোঝা টানছে সে সর্বক্ষণ, পুরুষের চোখ বুঝবার দিয়ে কথা নয়।

দীনবন্ধু ডেকে বলে, "একটু তামাক খাওয়া ত দেবী।"

দেবকী রান্নাঘরে এসে উনুন থেকে হাতা দিয়ে আগুন তুলছে কল্কেতে। দু'ফোটা চোখের জল পড়ে সে আগুনে। সারা দেহে চোখ বুলিয়ে কি দেখে গেল পার্থদা। হয়তো ভেবে গেল দেবকী তাকে এরই মধ্যে ভুলে বসে আছে। চোখ মুছে কল্কেটায় ফুঁ দিতে দিতে বাবার হাতে দেয়। পার্থ জিজ্ঞেস করে দীনবন্ধুকে "কেতকী কোথায়?"

"সে ত বোর্ডিংএ আছে। এবার বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। এখন পাশ করে তবেই হয়। আমাদের গ্রামের মধ্যে এই ত প্রথম মেয়ে স্কুলে পড়ছে।"

এ পরীক্ষা দেবার কথা ছিল দেবকীর। আর আজ সন্তানের মা হ'তে চলেছে সেই ছোট্ট মেয়ে দেবকী। ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট সেই ছোট্ট মুখ-খানা, পার্থ একটু ভাবে। রোদ পড়ে আসে। সুবালার সুপারি কাটা আজকের মত শেষ। দীনবন্ধু সুবালাকে বলে. "একটু চা খাওয়াও পার্থকে। কতকাল পর দেখা। যা দেবী, একটা নারকেল ছোল দেখি।"

সাথী আবদারের সুরে বলে, "বাবা পার্থদার জন্ত বিস্কুট কিনে আনি আমাদের বৃন্দাবন কাকার দোকানেই বানায়—একেবারে সত্যিকারের বিস্কুটের মত।"

দীনবন্ধু ছেলের কথা শুনে সস্নেহে হাসে। "যা তবে, ছুটে যা।"

পার্থদাকে সাথীর খুব পছন্দ। তাড়াতাড়ি ছুটে চলে সে দোকানের দিকে। দীনবন্ধু পূর্বকথার জের টেনে জিজ্ঞেস করে, "তুমি ত এখন বাড়ীতেই থাকবে?"

বিনীত সুরে উত্তর দেয় পার্থ, "আমি এ সপ্তাহেই কোলকাতায় চলে যাচ্ছি। এম-এ পড়ার ইচ্ছে।"

দীনবন্ধু খুশি হ'য়ে বলে, "তুমিই এ গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর বিদ্বান না হ'লেও ছেলের মত ছেলে ছিল আলি।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে দীনবন্ধু, "চোর, ডাকাত খুনীরা গ্রামে বাস করতে পারে। কিন্তু গ্রামে থাকতে পারে না যারা মানুষকে ভালবাসে। যারা মানুষকে খুন করে, তাদের সঙ্গে এক গ্রামে থাকতে আটকায় না সমাজের—এইত এখন মানুষের বিধান।"

পঞ্চাশোর্ধ মাষ্টার মশাইর মুখে এতবড় সনাতনী-বিরোধী কথা শুনে অভিভূত হয়ে পার্থ। বিস্মিত আবেগের সুরে উত্তর দেয় সে, "আপনার মত মানুষের প্রতি এত টান যদি থাকতো সমাজপতিদের, তাহ'লে ত কোনও সমস্যাই থাকতো না আজ পৃথিবীতে।"

সূর্য ডোবে ডোবে। সন্ধ্যার ছায়া নামছে খালের জলে। বাড়ীমুখী হাঁটে পার্থ। দূর থেকে লক্ষ্য করে, আকাশ প্রদীপ জ্বলছে তাদের বাড়ীর উপর। নিশ্চয়ই অর্জুনের কাজ। বাড়ী এসে অর্জুনকে বলে, "কাঠের পোল থেকে তোর আকাশপ্রদীপ দেখে এলাম।"

অর্জুন খুশি হ'য়ে আবারও প্রশ্ন করে, "পোল থেকেও দেখা গেল?"

হঠাৎ সারা পাড়ায় কিসের গোলমাল ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ

ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে' মঙ্গলাকে বলে, "শীগগির একটা মশাল তৈয়ার করে' দিন। ক্ষেতে শুয়োর এসেছে।"

মঙ্গলা, লক্ষ্মী দু'জনেই তাড়াতাড়ি দু'টো মশাল তৈয়ার করে আনে। লাঠির সঙ্গে ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিনে ডুবিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। মশাল দু'টো নিয়ে অর্জ্জুন আর লক্ষ্মণ ক্ষেতের দিকে ছোটে। আরও অনেকেই মশাল নিয়ে বেরিয়েছে ক্ষেতে। এক পাল বন্য শুয়োরে ছেয়ে ফেলেছে ক্ষেত। চারদিক থেকে চাষীদের তাড়া খেয়ে এদিক ওদিক ছোটে শুয়োরগুলো আগুন দেখে।

"এই যে এখানে একটা ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়েছে।" অর্জ্জুন চেঁচিয়ে বলে। "শালা আবার ক্ষেতের মধ্যে ঘুপটি মেরে রয়েছে!"

একবার এদিক, একবার ওদিক ছোটে শুয়োরগুলো। প্রায় একঘণ্টার চেষ্টায় তাদের ক্ষেত থেকে বের করে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে আসে।

নিবে আসন্ন মশালটা হাতে নিয়ে বাড়ী ফেরে লক্ষ্মণ। তখনও হাঁপাচ্ছে সে। পার্থ লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন করে, "এখন ত ওদের তাড়িয়ে এলে। রাতে যদি আবার আসে?"

"রাতে পালা করে পাহারা দিতে হ'বে। না হ'লে এক রাতেই ক্ষেতকে ক্ষেত সাবাড় করে রেখে যাবে ওরা। ঠিক হ'য়েছে, আজ পাহারা দেবো আমি আর সোনা।"

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় পার্থর। হিম-ঝরা রাত্রির অন্ধকার। ক্ষেত থেকে ভেসে আসছে শুয়োর তাড়ান কর্কশ ক্যানাস্তারার শব্দ। আর পশ্চিমের ঘর থেকে যেন একটা মৃদু গোঙানির শব্দ আসছে। কোঁকাচ্ছে কে? কান পেতে শোনে একটু পার্থ। না, কেউই ত নয়। আর কোনও শব্দ নেই। শুধু রাত্রির স্তব্ধতা। তবু মনে হয়, রাত্রির অদৃশ্য অন্ধকারে কে যেন লুকিয়ে কাঁদছে। কে কাঁদে? কারা কাঁদে? কেন কাঁদে? রাত্রির রন্ধ্র দিয়ে যেন অনন্তলোকের ক্রন্দন বয়ে চলেছে। কার অশ্রুত

বিলাপ রজনীর দীর্ঘশ্বাসে মিশে চলেছে। কানাস্তারার শব্দ তখনও থামেনি। বন্য বরাহের সঙ্গে মানুষের অনিদ্র সংগ্রাম।

এ দীর্ঘ শীতের রাত শেষ হ'তে এখনও অনেক দেরি।

পার্থ উঠে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে ক্ষেতের দিকে। গল্প বলছে কে? সোনারই গলা না? আত্তাপ সাত্তাপের গল্প বলছে। ফুলবানুর গল্প দিয়ে মোলায়েম করে তুলেছে রাত্রির পাহারা। হৈমন্তিক ক্ষেতের বুক থেকে হিম উঠছে। মুলো ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

গল্প শোনা থামিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে তাকায় লক্ষ্মণ, "কি ব্যাপার?"

"একটু আগুন পোয়াতে এলাম। বাকী রাতটুকু আমি পাহারা দিচ্ছি, তুমি বাড়ী যাও।"

লক্ষ্মণ সপ্রশ্নে আবারও তাকায়। লক্ষ্মীর ব্যথা ট্যথা উঠলো না ত? কিন্তু পার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে উত্তর দেয়, "এক রাতের জন্য পাহারা দিয়ে আর কি হ'বে? তার চাইতে তোমার জেলখানার গল্প বল।"

পশুতাড়ান আগুন জ্বলছে হিমের রাতে। একটি একটি করে পুড়ে চলেছে কাঠগুলো। দগদগে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর আবার একটু হাতগুলো সেঁকে নেয় লক্ষ্মণ।

রাত শেষ হ'য়ে আসছে। অস্পষ্ট হ'য়ে আসছে তারাগুলো। পূবালী হাওয়া বইছে। চোখে মুখে এসে লাগে সে হিম হাওয়া—বড় আরাম লাগে পার্থর রাতজাগা চোখে। গল্প বলে চলেছে সে। কয়েদীদের গল্প, রাজবন্দীদের গল্প—অনশন, পাগলা ঘণ্টা।

পার্থ তার হাতের একটি আঙ্গুল দেখিয়ে বলে, "সেই পাগলা ঘণ্টার দৌলতে এ আঙ্গুলটি জন্মের মত বেঁকে রয়েছে।"

"এমন করে লাঠি চালায় নাকি জেলখানায়।" সবিস্ময়ে তাকায় সোনা পার্থর হাতের দিকে। "শুধু লাঠি? গুলিও ত চলেছে হিজলীতে। দু'জন মারা গেল সে গুলিতে।" মৃত শহীদের উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রণাম জানায় পার্থ।

চোখে ভেসে ওঠে নির্ভিক নওজোয়ানের রক্তাক্ত ওষ্ঠপ্রান্তের শেষ দৃঢ়তাটুকু। অপরাজেয় হিমশীতল দু'টি দেহ।

বাড়ী ফিরে আসতে মঙ্গলা এসে বলে পার্থকে, "আজ রওয়ানা না হ'লে। লক্ষীর কাল রাত থেকে ব্যথা উঠেছে। প্রথমকার পোয়াতী। একটা দিন থেকেই যাও।" পশ্চিমের ঘর থেকে একটা যন্ত্রণাচাপা কাতর শব্দ কানে আসে। পার্থ সেদিকে লক্ষ্য করে মাকে জিজ্ঞেস করে, "ধাত্রীকে খবর দেওয়া আছে?"

"ধরণী বুড়ি সকালে একবার দেখে গেছে। এখনও দেরি আছে।" উত্তর দেয় মঙ্গলা। চোখেমুখে তারও চাপা উদ্বেগ। প্রথমকার সন্তান। খালাস না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই মনের।

লক্ষণ আর অর্জুন মিলে বড় ঘরের পেছনে একটা ছোট চালা তুলছে প্রসবের জন্যে। পার্থ মার কাছে এসে আপত্তির সুরে বলে, "ঘরেই হোক না?"

ছেলের অজ্ঞতায় হাসে মঙ্গলা। "পাগল, ঘরে কখনও আতুড় পড়তে পারে? ঠাকুর দেবতার কাজ কর্ম হয় ঘরে।"

লক্ষণদের চালা তোলা শেষ হ'য়ে যায়। পার্থ দেখে আবারও আপত্তি করে, "এতে ঠাণ্ডা লাগবে না? অন্ততঃ খান কয়েক তক্তা পেতে দাও মেঝের ওপর। ঘরের টিনগুলোও ত থাকবে। সেগুলোত আর ফেলে দেবে না।"

"টিনগুলো ত আর ও ছুঁতে যাবে না।"

মার দিকে তাকিয়ে হতাশ সুরে বলে পার্থ, "তোমাকে একবার কোলকাতায় ঘুরিয়ে আনবো। তা হ'লে এসব কুসংস্কার যদি কাটে।"

"সেখানে গঙ্গার ধারে কোনও দোষ নেই।"

"বেশত, আমি ওখান থেকে কিছু গঙ্গাজল না হয় পাঠিয়ে দেবো। তা' দিয়ে শুদ্ধ করে নিও তক্তাগুলো।"

পার্থর এত অনুরোধে শেষে মেঝের উপর তক্তা বিছিয়ে দিতে রাজী হয় মঙ্গলা। ছেলেকে ক্ষুণ্ণ করতেও মনে কামড় দেয়।

ঘরের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্মীকে দেখে আসছে মঙ্গলা। বেদনায় চোখমুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠেছে লক্ষ্মীর। মঙ্গলা ফিস ফিস করে বলে যায়, "টু শব্দ করবি না। বাড়ী ভর্তি পুরুষমানুষ। কেউ যেন টের না পায়।" বাইরে এসে অর্জুনকে ডেকে বলে, "শীগগীর ধরণী বুড়িকে ডেকে নিয়ে আয়।"

পার্থ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। "তুই থাক। আমি যাচ্ছি।" সাইকেল নিয়ে ছুটে যায় সে ধাত্রীকে ডাকতে।

লক্ষ্মীকে আতুড় ঘরে নিয়ে যায় মঙ্গলা। ধরণী বুড়ি এসে প্রসূতির অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি কাপড়টা বদলে একটা ছেঁড়া কাপড় পরে আতুড়ে ঢোকে। মঙ্গলা জল গরম বসিয়ে এসে অর্জুনকে বলে যায়, "তুই জালটা একটু ঠেলিস। আমি গেলাম ও ঘরে।"

একটা অস্বস্তিকর বেদনাবোধে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে পার্থ। মেয়েদের এ কি কষ্ট? বিজ্ঞান এত অসাধ্য সাধন করছে। তবু মেয়েরা এ প্রসব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না কেন আজও?

আতুড় ঘরের বেড়ার ফাঁক থেকে, থেকে থেকে লক্ষ্মীর চাপা আর্তনাদ কানে আসছে। "উঃ মা, মাগো।" সে চাপা আর্তনাদে মনে হয় পার্থর, বুঝি হৃৎপিণ্ডটাই ছিঁড়ে যাচ্ছে লক্ষ্মীর। মঙ্গলা ও ধরণীবুড়ি একসঙ্গে বলে উঠে, "একটুও শব্দ ক'রবি না মুখ দিয়ে। ব্যথাটা চেপে রাখ তা হ'লেই তাড়াতাড়ি খালাস পাবি।" নাঃ, ঘরে বসে ছটফট করে লাভ নেই—পার্থ উঠে জামাটা গায়ে দিয়ে বের হয়।

সুদাম মুখ তুলে তাকায় "কোথায় চল্লে?"

"যাই ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি?"

বলতে বলতেই আচমকা একটা দারুণ চিৎকার করে উঠে লক্ষ্মী। পার্থ ভয় পেয়ে আতুড় ঘরের দিকে তাকায়। আর কোনও সাড়া নেই লক্ষ্মীর। শুধু ধরণী বুড়ির মৃদু আওয়াজ। "এখানটায় কাট।" "জোরে বাঁধ দাও।" কান পেতে রয়েছে সুদাম। ধরণী বুড়ি চেঁচিয়ে বলে, "নাতনী হ'লো। এবার

পান বাতাসা বের কর বুড়ো।" ঘর থেকে বেরিয়ে তিনবার জোরে উলু দেয় মঙ্গলা। জোকার শুনে আলিদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসে দাঁড়ায় উঠোনে। "মেয়ে হ'ল বুঝি লক্ষীর।" চোখেমুখে এক ঝলক হাসি নিয়ে আতুড় ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় মফির মা।

ধরণীবুড়ি মেয়েকে একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে দুয়ার থেকে দেখায়। "দেখ, কেমন টানা টানা চোখ হ'য়েছে। কই মেয়ের বাপ কই। মোহর নিয়ে আসুক মেয়ে দেখতে।"

অর্জুন দেখে এসে বলে উঠে, "ওর নাম রাখবো মুক্তি। দাদার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যখন এসেছে।"

উত্তর কোলকাতায় একটা ফ্ল্যাটবাড়ীতে একখানা ঘর ভাড়া নেয় পার্থ। তার ওপর ভার পড়েছে, কৃষক আন্দোলনের জন্য এক গোপন পত্রিকা চালাবার।

তিনঘরের একটি ছোট ফ্ল্যাট তিনতলার ওপর। একতলায় এক চাচার হোটেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে রসুন পেয়াজের কড়া গন্ধ নাকে আসে। চোখে পড়ে বড় বড় স্যাস্প্যান, গরীব রেঁস্তোরার গরীব আসবাব। হিন্দুস্থানী চাচাজী—বয়সের ভারে নুয়ে আসছে দেহ। তবু তার খুন্তি নাড়ায় লাল টকটকে ভাঁজা মাংসের সুঘ্রাণে পেটের ক্ষুধাটা নড়ে চড়ে ওঠে অফিস ফেরতা বাবুদের।

সিঁড়ির দু'ধারে ছোট ছোট ফ্ল্যাটগুলোতে মধ্যবিত্ত পরিবার। সিঁড়িতে অনবরত জুতোর শব্দ, ঠিকে ঝিদের কড়ানাড়ার শব্দ, মাঝে মাঝে শিশুর কান্না। পার্থর গৃহস্বামী বৃদ্ধ, প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার। পশ্চিমের কোনও ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। আর তার বিধবা পুত্রবধূ হিন্দিস্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

পার্থ তার পরিচয় গোপন রেখে জানায়, এবার এম, এ, দেবে সে।

আনন্দবাবু খুশি হ'য়ে শোনেন। "আমাদের ভদ্রা মায়েরও ত এম, এ, দেবারকথা ছিল বাংলায়। কিন্তু স্কুলের কাজ করে, সংসারের কাজ করে' সময়ও পায় না।"

বাংলাতে পড়ছে বৃদ্ধের পুত্রবধূ; পার্থ তাই ইকনমিক্সের কিছু বই জোগাড় করে সাজিয়ে নেয় ঘরে। ফ্ল্যাটফাইলে টাইপ করা কিছু প্রফেসারদের নোট্‌স।

আনন্দবাবু খেতে' বসে জানায় ভদ্রাকে, "বেশ ছেলেটি। লেখাপড়ায় খুব মন। দিনরাত বই নিয়ে আছে। ফার্ষ্ট ক্লাস পাবার চেষ্টা করছে।"

আনন্দবাবুর বড়ছেলে পশ্চিমে চাকরি করছে। বিয়ে করেনি। বিয়ে করবেও না, জানিয়েছে। মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাঠায়। তবু কুলিয়ে ওঠে না। তাই একখানা ঘর সাব্‌লেট করছে ভদ্রা। সে-ই শ্বশুরকে বুঝিয়েছে, "বড়দা ত দু'তিন বছরে একবার আসেন। বাইরের ঘরটা ভাড়া দিয়ে দেই।"

পার্থকে দেখে থেকে থেকে মৃতছেলের কথা মনে পড়ছে আনন্দবাবুর। এমনি পড়াশুনায় মন ছিল তারও। বৃদ্ধ আবারও একটু ঘুরে আসে পার্থর ঘরের দুয়ার থেকে। ভিতর থেকে বন্ধ ঘরের দুয়ার। পড়ছে। বেশ, মনদিয়ে পড়াশুনা করুক। নিঃশব্দে আবার ফিরে আসে বৃদ্ধ তার নিজের ঘরে। চৌকীর তলা থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করে বসে। বাক্সটার মধ্যে মিস্ত্রির সরঞ্জাম—হাতুড়ি, বাটালি করাত। বসে বসে কতকগুলো কাঠ জোড়া দেয়।

স্নানের ঘরে যেতে আসতে দেখে পার্থ, শ্বশুর ও পুত্রবধূর ছোট্ট গৃহস্থালী। খুবই সামান্য আসবাবপত্র। রান্না ঘরে গোটা কয়েক এলোমেনিয়ামের বাসন, গোটা কয়েক কৌটো, চায়ের কেটলী, পেয়ালা পিরিচ, দু' তিনখানা থালা, গ্লাস। কিন্তু চোখে পড়ে ঘরটুকুর ঝকঝকে পরিচ্ছন্নতা। উনুনের সামনে বসে বই পড়ছে ভদ্রা। হাঁড়িতে কি চাপান। মৃদু হাস্যে লক্ষ্য করে

পার্থ রান্না ঘরে বসে ভদ্রার এই বই পড়া। তারও এমনি পড়ার নেশা ছিল এক কালে।

ঘরে এসে কাজ নিয়ে বসে সে। দুধওয়ালা আসছে না এখনও। কি ব্যাপার? ঘড়িটায় চাবি দিয়ে রাখে। আটটা বাজে। ভাবতে ভাবতেই হিন্দুস্থানী দুধওয়ালা এসে কড়া নাড়ে। ভদ্রারাও আজকাল দুধ রাখছে এই একই দুধওয়ালার কাছ থেকে। পার্থই ঠিক করে দিয়েছে—খুব খাঁটি দুধ দেয়। ছোট ছোট এলোমিনিয়ামের জাগে করে দুধ নিয়ে আসে। কোনটায় গরুর দুধ, কোনটায় মোষের দুধ।

ভদ্রা দুধটা ঢেলে জাগটা ফিরিয়ে দেয়। পার্থও ঘরে এসে জাগের ঢাকনাটা খোলে সতর্ক ভাবে। জাগের মাথায় আর একটা এলোমিনিয়ামের গ্লাস। তার ভেতরে টাইপকরা পাতলা কয়সিট কাগজ। কাগজগুলো বের করে এক বাণ্ডিল লিথুকরা কাগজ ঢুকিয়ে দেয় জাগটায়। সাইকেল নিয়ে চলে যায় দুধওয়ালা।

স্কুলে যাবার সময় হ'য়ে যায় ভদ্রার। পার্থকে ডেকে বলে যায়, "বাইরের দুয়ারটা বন্ধ করে দেবেন। বাবা ত ঘুমিয়ে থাকেন দুপুর বেলা।" ভদ্রা চলে গেলে পার্থ আনন্দ বাবুর ঘরে এসে বসে। একটা শেলপ বানাচ্ছে বৃদ্ধ। যাটের ওপরে বয়স। কিন্তু এক মুহূর্ত বসে থাকতে পারে না। পার্থকে দেখে বলে, "দেখ, কেমন এক শেলপ বানিয়ে ফেল্লাম। এখন বার্নিশ করে' দিলে ভদ্রার নিশ্চয়ই অপছন্দ হ'বে না। কি বল?"

পার্থ বৃদ্ধের উৎসাহ লক্ষ্য করে বলে, "বেশ সুন্দর হ'য়েছে।"

আনন্দবাবু খুশি হ'য়ে বলে, "দেখ, এই বুড়ো হাতেও আমরা যা পারি, তোমরা তা' পারবে না। পারবে কি করে? ম্যানুয়েল লেবারকে ত তোমরা শ্রদ্ধা কর না। পুঁথিপড়া বিদ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা হাতে কলমে কাজ শেখা উচিত প্রত্যেকের। হাত পা থেকেও আজ আমরা পঙ্গুর সামিল। এই ত দেখ, জলের পাম্পটা খারাপ হ'য়ে গেছে। এতগুলো ফ্ল্যাটে এমন একটি

ছেলে পাবে না, যে পাম্পটা ঠিক করে নেয়। সেই বাড়ীওয়ালার মর্জির ওপর নির্ভর। কবে ঠিক করিয়ে দেবে, ততদিন মুখগুজে কষ্ট ভোগ কর। ইউনিভারসিটি থেকে বি, এ; এম, এ ডিগ্রি নিয়ে সব বের হচ্ছে ছেলেরা মেয়েরা। কিন্তু সংসারযাত্রা করার একেবারে অযোগ্য সব। সামান্য একটু অসুখ বিসুখেও এক ফোঁটা ওযুধ দিতে জানে না কেউ আজকাল। একটা সর্দি কাশিতেও ছুটবে ডাক্তার বাড়ী। তাই কিনা বল।"

পার্থ দ্বিমত করে না। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার সুযোগ দেয় বৃদ্ধকে নীরব শ্রোতা হ'য়ে। জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা দিয়ে হুঁশিয়ার করতে চায় বৃদ্ধরা পরবর্তী যাত্রীদের। যা'তে একই ভুল বার বার না করে মানুষ।

মিস্ত্রির কাজ তখনকার মত সাঙ্গ করে পত্রিকাটি নিয়ে বসে আনন্দবাবু। সারা সকাল ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া পত্রিকাখানাই সম্বল এ নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্নের। একই খবরে দ্বিতীয়বার চোখ বুলায়।

"জার্মানী ত পোলাণ্ডও গ্রাস করবে মনে হ'চ্ছে। চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়েছে, পোলাণ্ডও টিকবে বলে মনে হয় না।"

এবার পার্থর বলার পালা। চিন্তার তরঙ্গ উঠেছে ভিতরে। দিনের পত্রিকা আজ উদ্বেল করে তুলেছে যে কোন চিন্তাশীল মানুষকে। হিটলারের লক্ষ্য আজ সুস্পষ্ট—উক্রাইনের শস্যশ্যামল ভূমি। কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করে পার্থ, ঘুম জড়িয়ে এসেছে বৃদ্ধের চোখে। উঠে পড়ে সে, "আপনি ঘুমোন এখন আমি যাই।"

নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। এবার নিশ্চিন্তে সারাটা দুপুর কাজ করা চলবে। ঘরের কোণের একটা বাকসো থেকে সাইক্লোষ্টাইল মেশিনটা বের ক'রে বসে। দুধওয়ালা শোহন সিংয়ের আনা টাইপ করা কাগজখানা খুলে পড়ে নেয় আর একবার। লিথুর সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হ'বে। "চাষীর" চাহিদা বাড়ছে মফস্বল থেকে।

রিপোর্ট মিলিয়ে মিলিয়ে লিথুর খসড়া করে চলে পার্থ। চব্বিশ পরগণায় কৃষক আন্দোলন চলছে ভেড়ির জল নিয়ে। ভেড়ির জল ছাড়বে না জমিদার। তার ফলে বিরাট অঞ্চল জুড়ে জমি অকেজো হ'য়ে উঠেছে।

মনসাডাঙ্গারও রিপোর্ট এসেছে। মৃদু চাঞ্চল্য অনুভব করে পার্থ। গনেশ দাস ছাড়া পেয়ে কাজ করছে সে অঞ্চলে। লক্ষ্মণরা কৃষক সমিতির কেন্দ্র খুলেছে মনসাডাঙ্গায়। পার্থ নূতন উৎসাহ নিয়ে লিথু করে যায়:—
"এ বছরে সারা ভারতে কৃষক আন্দোলনের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। কর বৃদ্ধি, বেগার প্রথা, বে-আইনী আদায়, জমি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতি বহুমুখী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা আজ সংগ্রাম চালাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন। মহাজন ও জমিদারের অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্য কৃষকরা আজ নিজেদের চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে কৃষক-সমিতি গড়ে তুলেছেন।

নিষ্ঠুর সামন্ততন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রেণী হিসেবেই প্রাণপণ লড়াই করতে হ'বে কৃষকদের।

এজন্য চাই কৃষক শ্রেণীর সংগঠন। তাদের লক্ষ্য হ'বে স্পষ্ট—সাম্রাজ্যবাদকে প্রবল আক্রমণে পরাস্ত করা এবং তাকে হটিয়ে কৃষি ব্যবস্থায় এমন এক বিপ্লব আনা যার ফলে কৃষকরা জমি পাবে, কৃষক ও সরকারের মধ্যে কোনরূপ মধ্যসত্ব ভোগী থাকবে না। কৃষক ঋণ মুক্ত হ'বে। এবং নিজেদের পরিশ্রমের ফল তারা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ ক'রতে পারবে।

পাতার পর পাতা লিখে চলেছে পার্থ। কার্তিক মাসের ছোট বেলা ঝিমিয়ে আসছে। ভদ্রার আসার সময় হ'য়ে এল। মেশিনটা বাক্সে ঢুকিয়ে সব গুছিয়ে রাখে সে। আবার রাত ভরে চলবে কলম। দ্রুত কলম চালায় পার্থ—"কৃষি কার্যে আধুনিক ষ্টীম ইঞ্জিন চালিত লাঙ্গল প্রয়োগ করতে হ'লে বড় খামার ও যথেষ্ট পুঁজির প্রয়োজন। কৃষি সংকট দুর করার নামে

সরকার পক্ষ সমবায় সমিতি সৃষ্টি করছে। কিন্তু গরীব কৃষকদের এমন সামর্থও নেই যে তারা সমবায় ঋণদান সমিতির সভ্য হ'তে পারে।"

পার্থ স্নান করতে যাচ্ছে। ভদ্রা ডেকে বলে, "আমার উনুনে অনেক আঁচ আছে, আপনার ভাতের স্যসপ্যানটি দিয়ে যান।"

পার্থ ভাবে, এ বুদ্ধি মন্দ নয়। চাল ডাল আলু সহ স্যসপ্যানটা এনে রাখে রান্নাঘরে। ভদ্রা বলে, "এবার আপনি নাইতে যান, ভাতটা আমি রেখে আসবো'খন ঘরে।"

ভদ্রার স্কুলের সময় হ'য়ে গিয়েছে। শাড়ি বদলে, ছাত্রীদের খাতাপত্র গুছিয়ে তৈরী হ'য়ে নেয়। যাবার আগে স্যসপ্যানটা রেখে যায় পার্থর ঘরে।

পার্থ মন দিয়ে "চাষী"র আগামী সপ্তাহের সম্পাদকীয় লিখছে। একবার চোখ তুলে মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে দেখে ভদ্রাকেও। আবার মন দেয় লেখায়।

প্রায় দু'টো বাজে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হয় এখনও খায় নি সে। ভুলেই গেছে খাবার কথা। উঠে থালাটা ধুয়ে এনে স্যসপ্যানের ঢাকনাটা খুলে দেখে—ভাতের পাশে বাটিতে সাজান ডাল, তরকারি, ভাজা। এমন কি লেবু নুন পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে রাখা। মেয়েলী রান্নার গন্ধে মায়ের হাতের যত্ন। ভদ্রা ফিরে এলে বলে সে, "দিয়ে এলাম শুধু ডাল আর চাল, তাও একসঙ্গে মিশিয়ে। আর হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখি, ঘণ্ট, ভাজা, চচ্চড়ী। এ দেখি, চীনে রূপকথার ব্যাপার।"

ভদ্রা সে কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি রোজই চাল ডাল মিশিয়েই রান্না করেন নাকি?" পার্থ উত্তর দেয়, "রোজই মেশাই না। বাজার থেকে কেনার সময়ই মিশিয়ে কিনি। রোজ মেশান আবার হাঙ্গামা। আর এতে আলাদা আলাদা বাসন কোসনেরও দরকার হয় না।"

কথা শুনে হেসে ফেলে ভদ্রা, "কি কাণ্ড।" মৃদু কৌতুকের সঙ্গে বলে সে, "এরপর থেকে ঐ হাঙ্গামাটুকুও আর করতে হ'বে না আপনাকে। আমার

ঘরেই রেখে যাবেন আপনার সংসারের জিনিসপত্র। একটি স্যসপ্যান আর একটি কেটলী ত? আর ঐ চালে ডালে মেশান থলিটিও"। ভদ্রা চলে যায়। মনে মনে প্রমাদ গণে পার্থ। এতটা মেলামেশা ঠিক হ'বে কি? কিন্তু আবার বেশী এড়িয়ে চল্লেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

ঘরখানা সবদিক থেকেই ভাল পেয়েছে। ভিতরের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। পাশের বাড়ী থেকেও চোখে পড়ে না। পশ্চিমের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে কতকগুলো বস্তির চালা আর একটা মোষের খাটাল। দক্ষিণমুখী জানালা দিয়ে দৃষ্টির অগোচরে আলো বাতাস প্রচুর ঢোকে ঘরে। ঢোকে অজস্র অপ্রয়োজনীয় চাঁদের আলোও। কিন্তু এসব খেয়াল করার অবসর নেই পার্থর। লিখে করে চলেছে সে:—

"ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণপরিষদের মারফৎ ভারতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন।

ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী অপসারণ ও গণসেনা গঠন।

বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ। সমস্ত ঋণ মকুব।

কলকারখানা, জমি, ও চা, রবার, কফি বাগানের মজুরদের আট ঘণ্টা রোজ, ও বেঁচে থাকার উপযোগী মজুরী।

সমস্ত ভারতবাসীকে খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার প্রতিশ্রুতি।

লাভহীন জমির খাজনা ও রাজস্ব মকুব।

কলকারখানা, খনি, ব্যাঙ্ক, রেলপথ, জাহাজ, চা, রবার, কফি বাগান প্রভৃতিতে নিযুক্ত বিদেশী পুঁজির বাজেয়াপ্ত করা ও শিল্পগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

বিদেশী দেনা অস্বীকার।"

রাত গভীর হ'চ্ছে ধীরে ধীরে। দেওয়ালের ওপাশের বাড়ীগুলির দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ চোখে পড়ে না, কিন্তু কানে আসে। বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া, দুয়ারে ঘন ঘন কড়া নাড়া সব থেমে গেছে। চারদিকের নিস্তব্ধতা রাত্রির

গম্ভীরতাকেই মনে করিয়ে দেয়। সেড দেওয়া টেবিল-ল্যাম্পের ধারে লিখে চলেছে পার্থ। একবার উঠে জল খেতে গিয়ে দেখে, এক ফোঁটা জল নেই কুঁজোতে। জলতোলার কথা খেয়ালই ছিল না। কুঁজোটা নিয়ে কলতলার দিকে যায়।

ভদ্ররে ঘরে বাতি জ্বলছে তখনও। একটু বিস্মিত হয় পার্থ—এত রাতে এখনও পড়ছে ? কলতলা থেকে ফিরে আসে—জল নেই কলেও।

ভদ্রা টের পেয়ে নিজের কুঁজোটা নিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। "এত রাতে কি জল থাকে কলে ? আপনি এ কুঁজোটা নিয়ে রাখুন ঘরে।"

খোলা দুয়ার দিয়ে একবার কটাক্ষ মাত্র তাকিয়ে দেখে পার্থ—মেঝেতে মাদুরে ছড়ান বই, কাগজ, কলম।

পরদিন ভোরে ভদ্রাকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কি সত্যি এম, এ, দিচ্ছেন এ বছর ?"

"স্কুলের এ ঘানি কাঁধে নিয়ে ইউনিভারসিটির দুয়ারে যাবার সাহস আর নেই।" মৃদু হেসে উত্তর দেয় ভদ্রা। "অত রাত জেগে কি পড়ি, তাই বোধ হয় ভাবছেন। পড়ি কবিতা। কবিতা পড়ি, কবিতা অনুবাদ করি, কবিতা লিখি। তারপর সে কবিতা দিয়ে উনুন ধরাই।"

"রাত ভরে' কবিতা লিখে, তা' দিয়ে উনুন ধরান ?" বিস্মিত চোখে তাকায় পার্থ ভদ্রার মুখের দিকে। বাইরে এত নম্র, শান্ত, আর ভিতরে এত প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মন লুকিয়ে রয়েছে, দেখে ত মনে হয় না, মনে মনে ভাবে পার্থ। ভদ্রা রুটিতে মাখন মাখাচ্ছে। পার্থ আবারও একটু মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে। ঠিক বাঙালী মেয়ের মত লাগে না দেখতে। ধারাল রূপ। রঙ ফর্সা, তীক্ষ্ণ চোখ—লম্বা দেহের গঠন।

ভদ্রা স্কুলে যাবার সময় পার্থকে ডেকে বলে যায়, "আপনার ভাত ঢাকা রইল। খেতে ভুলে যাবেন না আবার।"

"না, ভুলবো না।" লেখা থেকে মুখ না তুলেই উত্তর দেয় পার্থ। শোহন

সিং দুপুরে আর একবার দুধের টাকা নিতে আসে। আরও কিছু নূতন নির্দেশ দিয়ে যায়। আরও কিছু নূতন সংবাদ। 'চাষীর' একটা হিন্দি সংস্করণ বের করার তাগিদ আসছে ঘন ঘন। দুয়ারে কড়া নাড়ে ভদ্রা। উঠে গিয়ে দুয়ার খুলে দেয় পার্থ। "এত আগে আজ ?"

"রাস পূর্ণিমা আজ। তাই স্কুল ছুটি হ'য়ে গেল।" রাস পূর্ণিমা। কিন্তু আকাশে আজ সারাদিন মেঘের ভার। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিও পড়ছে। চিন্তিত চোখে তাকায় পার্থ আকাশের দিকে। এ অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি নামলে শস্যের দারুণ ক্ষতি হ'বে। মনে মনে খনার বচন আওড়ায়—"যদি বর্ষে আগনে, রাজা বের হন মাগনে"। এ ফসল পাকার সময়ে বৃষ্টি হ'লে রাজাকে পর্যন্ত ভিক্ষায় বের হ'তে হয়।

ভদ্রা ষ্টোভ ধরাচ্ছে। পার্থ উঠে আসে রান্নাঘরের দুয়ারে। "এক কাপ চা খাওয়াবেন। খুব কড়া চা।"

দুয়ারখোলা ঘরে চোখ পড়ে—লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন আনন্দবাবু। এই শীতে তাদেরই হাড় শুদ্ধ ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে, বুড়োদের যে কি অবস্থা। স্নেহের চোখে আবারও একবার তাকিয়ে দেখে ঘুমন্ত বৃদ্ধটিকে।

ভদ্রা চা করে' নিয়ে আসে ঘরে। পার্থ ভদ্রার মুখের দিকে হঠাৎ থমকে তাকায়। এত বিষণ্ণ কোনদিন দেখেনি সে তাকে। অজান্তে চোখ পড়ে সিঁদুরহীন সিঁথিটাতে। এই জলো হাওয়ার দিনে মৃত স্বামীর স্মৃতিই হয়তো ঝড় তুলেছে মনে। চায়ের পেয়ালা হাত থেকে নিয়ে বলে, "চলুন, আপনার ঘরে বসেই চা-টা খেয়ে আসি। আজ আর পড়ায় মন বসছে না।"

ভদ্রার ঘরে ঢুকে চা খেতে খেতে তাকে সাজান বইগুলোতে চোখ বুলিয়ে দেখে পার্থ। বেশীর ভাগই কবিতার বই।

"মাইকেলের বই খুব ভালবাসেন মনে হ'চ্ছে।" অন্যমনস্ক ভাবে একবার প্রশ্ন করে সে। ভদ্রা স্মিতহাস্যে উত্তর দেয়, "এমন কেউ আছে, যে তাঁর বই ভালবাসে না। তাছাড়া তাঁর জীবনও ত একখানা কাব্য।" ভদ্রার মুখে এ

জবাবে বিস্মিত হয় না পার্থ। কিন্তু একটা বেদনা বোধে নাড়া দেয় মনের তলায়। এত শানিত মুখর মনও আজ উপবাসক্লিষ্ট। পার্থ তাক থেকে মধুসূদনের গ্রন্থাবলীখানা নিয়ে অনুচ্চ স্বরে পড়ে যায়:—

"কেন লো সই না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনেছি
রোদন নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামে তর আঁখি মোর নাচিছে সতত
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ। না জানি সজনি
হায়লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে।"

বই বন্ধ করে তাকায় পার্থ ভদ্রার দিকে। রক্ষকুল বধূর সেই ত্রাস, সেই ভীতি ব্যাকুলতার ভারে ভারী হ'য়ে উঠেছে তার চোখের পাতা। দু' চোখ ভরা আসন্ন শোকের প্রতীক্ষা।

পড়ে যায় পার্থ—

"ছিল আশা মেঘনাদ মুদিব অন্তিমে
এ নয়ন দ্বয় আমি তোমার সম্মুখে।
সপি রাজ্য ভার পুত্র, তোমায়, করিব মহাযাত্রা।"

পড়ে চলেছে সে ;—

"হা পুত্র, হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে॥"

বই বন্ধ করে' মুখ তুলে তাকায় পার্থ। আনন্দবাবুও কখন এসে বসেছে ঘরে। তার শোকার্ত বক্ষপিঞ্জরের দীর্ঘশ্বাসগুলিই প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে রাক্ষস নৃপতির এই মর্মভেদী বিলাপে। চিরযুগের ক্রন্দনকে ছন্দবদ্ধ করে রেখে গেছে মধুসূদন—"হা পুত্র, হা বীরশ্রেষ্ঠ।"

পার্থ আবার একটু মন দিয়ে দেখে ঘরখানা। যামিনী রায়ের খান দুই ছবি দেওয়ালে। ছোট একটা ত্রিকোণ দেওয়াল-তাকে সাজান কিছু সমুদ্রের ঝিনুক, কয়টা শঙ্খ। কিন্তু আশ্চর্য, যে ব্যক্তির ছায়া ঘুরছে এ গৃহের সব কিছুর আড়ালে, তার কোনও ছবি নেই ঘরে। তাকের ওপর ছোট একখানা রূপোর থালায় কিছু শুকনো ফুল। মনে হয়, যেন খুবই যত্নে সঞ্চিত রাখা হ'য়েছে এ ফুল। এক বেদনা-স্তব্ধ জিজ্ঞাসায় দৃষ্টি আটকে যায় শুকনো ফুলের থালায়। হয়তো কোনও মধু রাত্রির স্মৃতি বহন করছে এরা।

পার্থ মন্থর পায়ে চলে আসে তার ঘরে। বেলা শেষ হ'য়ে এসেছে। সারাদিন পর সূর্য দেখা দিয়েছে আকাশের পশ্চিম ঢালুতে। জানালাটা খুলে দিতেই এক ঝলক ম্লান রোদ এসে ছড়িয়ে পড়ে তার টেবিলের বইগুলোর ওপর। বড় বিষণ্ণ লাগছে নিজেরও আজ। থেকে থেকে মনে হ'চ্ছে, যদি কিছু সান্ত্বনা, কিছু প্রলেপ দিতে পারতো সে এদের এ নিঃসঙ্গ জীবনে।

সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু তির্যকভাবে লেগে রয়েছে মেঘের গায়ে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় সে আলো। গোধূলির ছায়া নামছে প্রতিটি বাড়ীর ছাদের আলিসায়। দূরে কোন বাড়ীতে সা রে গা মা সাধছে একটি মেয়ে। বহুদূর নদীর ধারের ছায়া ঘেরা একটি উঠোন উঠে এসেছে যেন এই ফ্ল্যাটবাড়ীর ছোট্ট ঘরখানায়। অতসী গাছে ফুল ফুটে উঠেছে এখন সে উঠোনের কোণায়।

গার্হস্থ্য জীবনের মৃদু একটু আস্বাদ। পুকুরের জলে গা ভাসিয়ে ভেসে চলা মাছের মত ভেসে চলেছে কতকগুলো অস্পষ্ট অনুভূতি। সুখের, বেদনার, আশার।

রাত ভরে' জ্যোৎস্নার বান বয়ে যায় আকাশে, ঘুমন্ত বাড়ীগুলোর ছাদে। কতকাল পর দেখছে পার্থ এ জ্যোস্না, শুনছে রাত্রির আলাপ।

ভোরবেলা চা ভর্তি পেয়ালাটা রেখে যায় ভদ্রা পার্থর টেবিলে। কলম থামিয়ে সুমিষ্ট হাসিভরা চোখে তাকায় সে ভদ্রার দিকে—"চায়ের জন্য ধন্যবাদ।" স্বরে ধরা দেয় সুপ্রভাতের প্রসন্ন আমেজ। মুহূর্তের জন্য একবার

তাকিয়ে দেখে ভদ্রা পার্থকে। ঠিক এমনি চুলের বিন্যাস, ঠিক এমনি স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য ছিল তার স্বামীর চোখেমুখে। রান্নাঘরে বসে কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হ'য়ে পড়ে ভদ্রা। হঠাৎ চমকে উঠে' আবার কাজে মন দেয়। শ্বশুরের দুধরুটি দিয়ে আসে ঘরে। একটা কোট এনে দেয় সামনে, "এটা গায়ে দিয়ে বসুন। যা ঠাণ্ডা পড়েছে ক'দিন ধরে'।"

"কিন্তু তোমারও ত গায়ে গরম জামা দেখি না। গরম জামা নেই নাকি?" ব্যস্ত সুরে জিজ্ঞেস করে আনন্দবাবু কন্যাতুল্য পুত্রবধূকে।

"আমি কি বুড়োমানুষ নাকি? যে সব সময়ই গরম জামা পরে থাকতে হ'বে।" প্রতিবাদের সুরে উত্তর দেয় ভদ্রা।

উত্তুরে হাওয়া বইছে সারা দিন ভরে। একটা করুণ সুর ভেসে আসছে যেন কোন দূর লোকান্তর থেকে। সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে আকাশ জুড়ে। এক ওমরখৈয়ামী বেদনায় ভরে' উঠেছে মন। দিন আর রাত্রির সন্ধিক্ষণ এ সন্ধ্যা যৌবনান্ত মানুষের জীবন ভরা স্মৃতি আর মৃত্যুর অপেক্ষাকেই স্মরণ করায়। তাই এ গোধূলীর বিষণ্ণতা এত করুণ ক'রে তোলে মনকে। কোন এক বাড়ীর অন্দরে গলা সাধছে একটি মেয়ে। প্রতিটি উন্মুক্ত রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করছে সেই সপ্তসুরের সুসমঞ্জস্য আরোহন, অবরোহন। উঠে গিয়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দেয় ভদ্রা। এক্ষুনি সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করে' বাড়ী ফিরবেন শ্বশুর মশাই—সিঁড়ির বাতিটাও জ্বালিয়ে রাখে। বারান্দা থেকে চোখে পড়ে, তন্ময় হ'য়ে বই পড়ছে পার্থ। তার আনত ললাটে স্নেহশীল ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর। এই দৃঢ় সুগঠিত পুরুষমূর্তির মাঝে বার বার আরও এক ঋজু মূর্তির সাদৃশ্য উঁকি মারে। তার স্বামীর সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে পার্থর। চোখ, নাক, কপাল, চুলের বিন্যাসে? না ঐ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক ওষ্ঠপ্রান্তের স্নেহের আভাসে? ঠিক বুঝে ওঠে না।

সাত বছর আগের একটি বাসর রাত্রি তার একাংক জীবন-নাটকের যেন এক মাত্র দৃশ্যপট। বৌ ভাতের নিমন্ত্রিতরা সবাই চলে গিয়েছেন। ফুলশয্যার

ঘরে গানের পর গান গেয়ে চলেছে একটি সুকুমারী মেয়ের। ঘুম জড়িয়ে এসেছে ভদ্রার চোখে, তবু গানের রেশ টেনে নিয়ে চলেছে তাকে কোন অপরূপলোকে। যেন কোন কল্পনা-লোকের দুহিতা সেই সুকন্যা।

শেষ গানটি গাওয়া শেষ হ'লে ভদ্রার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে সে। মধুর হাস্যে কানে কানে বলে যায় "শুভরাত্রি।" তার সঙ্গীতের মতই মধুর সে কামনা।

সবাই চলে যায়। শুধু প্রিয়দর্শন আর সে। পরিপাটি নরম শয্যা। নীলাভ সেডের আড়ালে টেবিল ল্যাম্প, ফুলদানিতে রাশিকৃত রজনীগন্ধা, গোলাপ, আর রূপোর ডালিতে বেলি, যুঁই, চামেলী। স্নিগ্ধ গন্ধে ভরপুর ঘর খানা। একটু বুক ঢিব ঢিব করতে থাকে তার। একটা ভয়ের ছায়াও বুঝি নেমে এসেছিল চোখে। প্রিয়দর্শন লক্ষ্য করে' একটু হাসে। তারপর উঠে এসে বলে, "কোনও ভয় নেই।" অগ্রজের স্নেহ ধরা দেয় কণ্ঠস্বরে। বাতিটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, "তুমি ঘুমোও। বাতি ঘুরিয়ে দিচ্ছি, চোখে লাগবে না। আমি এ বইটা শেষ করে নেই।"

একটা মোটা বই নিয়ে ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে দেয় প্রিয়দর্শন। মনে মনে কৌতুকবোধ করে সে। এই ফুলশয্যার রাত সম্বন্ধে কত কি গল্প শুনেছে সে। খুশিও হয় প্রিয়দর্শনের নম্র শিষ্টাচারে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় আবার। এক ফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার চোখের পাতায়। খোঁপাটা ভেঙে এলিয়ে পড়েছে ফুলগুলি, কুঁড়ির মালাটা আলগা হ'য়ে জড়িয়ে রয়েছে সে চুলে—যুঁইফুলের মৃদু গন্ধে স্নিগ্ধ মাদকতা। ঘুমভরা চোখে তাকিয়ে দেখে, প্রিয়দর্শন ঘুমিয়ে পড়েছে চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে।

সেই ছবি, সেইঘুমন্ত চোখের পল্লব, চুলের বিন্যাস, প্রশান্ত ললাটের সঙ্গে বার বার মিলিয়ে দেখে ভদ্রা পার্থর দৃঢ়তাব্যঞ্জক চোখেমুখের স্নেহ-নম্রতাটুকু। ঠিক এরকম বয়সেরই একটি সুদর্শন ছেলে প্রিয়দর্শন আর ষোল বছরের বধূ ভদ্র তবু স্বামীর অনুরাগের চাইতে স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিভার প্রতিই আকৃষ্ট সে

তখন। ষ্টেট স্কলারসিপ পেয়ে বিলেত যাচ্ছে প্রিয়দর্শন আর এক সপ্তাহ পরে। তারই গৌরবের আমেজ বৃত্তি পাওয়া মেয়ে ভদ্রারও চোখে। তারপর আরও অনেকগুলি সকাল, অনেকগুলি বিকেল আর অনেক রাত্রির পর এমনি একটি জলো হাওয়ায় দিন সাতবছর আগে। বিকেলের জলখাবার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে শ্বশুরের কাছে। মন দিয়ে কার চিঠি পড়ছেন তিনি। পড়তে পড়তে হঠাৎ হাতটা একটু কেঁপে উঠে—চিঠিটা পড়ে যায় হাত থেকে। তাকিয়ে দেখে ভদ্রা, চোখমুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে তাঁর কি এক অব্যক্ত অপরিসীম যন্ত্রনায়। ভীত, বিহ্বল ভদ্রা মেঝে থেকে চিঠিটা তুলে নেয়। এ হস্তাক্ষর অপরিচিত নয় তার। টেবিলের উপর আরও একখানা চিঠি রয়েছে—পেপার ওয়েটের তলায়। একই হস্তাক্ষরে লেখা ঠিকানায় তারই নাম—শ্রীমতী ভদ্রা।

বৃদ্ধ শ্বশুর চোখ তুলে তাকায় তার দিকে। যেন কতদূর থেকে দেখছেন তাকে, এমনি নির্বাক আচ্ছন্ন সে দৃষ্টি। লজ্জায়, কুণ্ঠায় নুয়ে আসছে মাথাটা।

বিস্মিত ভদ্রা নিজের ঘরে এসে ছিঁড়ে ফেলে এনভেলাপটা। রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ে যায় চিঠিখানা। প্রিয়দর্শনের চিঠি।

বহুকাল পর আবার বের করে' পড়ে ভদ্রা সম্পূর্ণ চিঠিখানা। চিঠির কাগজ বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু তার অক্ষরে অক্ষরে স্বাক্ষরিত হয়ে রয়েছে তার জীবননাট্যের একটি অসম্পূর্ণ অঙ্ক। প্রিয়দর্শনের হস্তাক্ষর।

"স্নেহের ভদ্রা,

তোমাকে এক অবাঞ্ছিত সংবাদ জানাবার জন্যই এ চিঠি লিখছি। অবাঞ্ছিত হ'লেও এ সংবাদ গোপন রেখে তোমাকে প্রতারিত করতে চাই না। তাই তোমাকেই প্রথম জানাচ্ছি, আমি আমার এক সহপাঠী মেয়ের পাণি-প্রার্থী। তার দেশ ফ্রান্সে। এখানে একই সঙ্গে আমরা রিসার্চ করছি। আমার আগের চিঠিতে দাদার কাছে তার কথা লিখেছিলাম। এ সংবাদে

আমাদের পরিবারে শোকের ছায়া নামবে। বাবা ভেঙে পড়বেন এ আঘাতে। কিন্তু সকলের উপরে তোমার কথা ভেবেই সংকোচে ভরে উঠছে আমার মন।

তোমার সঙ্গে পরিচয় আমার খুবই সামান্য। দু'জনই দু'জনের কাছে অপরিচিতই বলা চলে। তবু সামাজিক ভাবে আমার উপর তোমার অধিকারই সর্বাগ্রে। তা' সত্বেও তোমার সে সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব নয় আর আমার। এজন্য আমি যে কতখানি লজ্জিত ও সংকুচিত তোমার কাছে, বোঝাবার নয়। তবু আমি উপায়হীন।

তোমার প্রতি যে অন্যায় করতে চলেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইলেই এ অন্যায়ের ভার কমবে না। তাই একটি মাত্র অনুরোধ জানাই। এই হয়তো আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ তোমার কাছে। 'তুমি এ বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে নিজের পায়ে দাঁড়াও ও নিজের মনোনীত ছেলেকে বিয়ে করো' ভবিষ্যতে। আমার অপরাধের জন্য তোমার জীবন ব্যর্থ হয়, আমি চাই না।

তোমার কাছে ক্ষমা না পেলেও, আমি তোমার স্নেহাকাঙ্খী হ'য়েই থাকবো চিরদিন। তাই অন্তরের সঙ্গেই প্রার্থনা করছি—তুমি সুখী হও জীবনে। ইতি—প্রিয়দর্শন।

আশু বিচ্ছেদের বেদনায় বিদীর্ণ সেই পিতার মুখছবি কোনদিন ভুলবার নয়। লজ্জাভারে নুয়ে পড়েছে প্রাক্তন অধ্যাপকের সেই দীর্ঘ উন্নত ঋজু দেহখানি। বসে বসে উকিলের কাছে চিঠি লিখছেন তিনি, ভদ্রা এসে দাঁড়ায় সামনে। বিনীত অনুরোধের সুরে বলে সে, "বাবা, আপনি চিঠির উত্তর দিন বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে। আপনার আশীর্বাদের জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন ওঁরা।"

আঠার বছরের মেয়ের মুখে এ উত্তর হয়তো আশা করেননি তিনি। তবু অশ্রু গোপন রাখতে পারেন না বৃদ্ধ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "কেমন করে' নীতি বিরুদ্ধ কাজে আশীর্বাদ জানাই।"

চিঠির উত্তর দিতে পারেন না তিনি। উত্তর দেয় ভদ্রা। সব শেষে

লেখে,—"বৈষ্ণব-গীতি কাব্যের দেশ এই বাংলা। বাংলার মেয়ের কাছে প্রেমের স্থান সর্বোচ্চে। তাই আপনার ফরাসী বান্ধবীকে এ বাংলাদেশের মেয়ে তার অন্তরের প্রীতি জানাচ্ছে।"

এখানেই যদি শেষ হ'ত তার কাহিনী, নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সম্মুখে থাকতো বিস্তৃত জীবনের উদার ঐশ্বর্য। কিন্তু তখনও বাকী ছিল তার জীবনের শেষ পরিহাস। সে চিঠির ছয়মাসের মধ্যেই কলেজের অধ্যক্ষের তার এল—প্রিয়দর্শন আত্মহত্যা করেছে। কারণ অজ্ঞাত।

বাইরের লোকের কাছে এ মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত। তবু সমস্ত জীবন ভরে' এ দুঃখময় স্মৃতির গ্লানি বয়ে চলবে ভদ্রা—তারই জন্য এ মৃত্যু বরণ করতে হ'ল একটি প্রতিভাবান ছেলেকে। হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ অচল এদেশে, আর বহু বিবাহ অচল সে দেশে। তাই যে দেশে সমাজ নেই, আইন নেই, সে দেশে চলে গিয়েছে প্রিয়দর্শন তার বুক ভরা অতৃপ্ত প্রেম নিয়ে।

এ প্রেম কি জিনিষ, কাব্যে, গানে, ছন্দে, অনুভব করেছে ভদ্রা এতকাল। কিন্তু আজ এ কি বেদনায় থেকে থেকে ভরে' উঠছে তার বুক। অঙ্গে অঙ্গে এক করুণ বিবসতা। আকাশের অন্ধকারে মিশে রয়েছে যেন এক পরাজিত পুরুষের ক্ষুধিত ক্রন্দন।

আলির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল পার্থ। প্রেসের মেশিনম্যানের কাজ করছে সে। ফেরার পথে দারুণ ঝড়-বৃষ্টি নামে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে খালের মত জল চলেছে। ট্রাম, বাস সব দাঁড়িয়ে পড়ে। জল না সরলে চলবে না।

পার্থ বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে। রাত প্রায় দশটা। মাথার উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ কাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে পার্থ। ভদ্রা না? এত রাতে এই ঝড়-জলে? "কি ব্যাপার। এই ঝড়ে—?"

কথা আর শেষ করতে দেয় না, পার্থকে দেখে যেন একটু সাহস পায় ভদ্রা। উদ্বেগচাপা কণ্ঠে বলে, "বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছি। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন পার্কে। কিন্তু পার্কে ত এখন জন মনুষ্যি নেই দেখে এলাম। বুড়ো মানুষ চোখেও দেখেন না ভাল।"

দুশ্চিন্তায় কথা থেমে আসে। পার্থ ভদ্রার চোখ-মুখ দেখে বোঝে, কতখানি উতলা হ'য়ে পড়েছে সে। হাতে একটা ছোট মেয়েদের ছাতা। কিন্তু ঝড়ের বেগে ছাতাটা হাত থেকে ছুটিয়ে নিতে চাইছে। পার্থ ভদ্রার হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে নেয়। "আমার হাতে দিন ওটা। চলুন আরেকবার দেখে আসি। পার্কের আশেপাশে কোনও বাড়ীতে যদি থেকে থাকেন। কোনও বাড়ীতেও ত যেতে পারেন ঝড় দেখে।"

"ঝড় ত এল রাতে, উনি ত সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফেরেন।"

প্রত্যেকটি বাড়ীর বারান্দায়, আঙ্গিনায় চোখ বুলিয়ে চলেছে দু'জনে। শেকলে বাঁধা পোষা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে কোন এক বাড়ীর বারান্দায়। দু' একজন পথচারী ছাতা মাথায় চলেছে জলের উপর দিয়ে।

ভদ্রা দাঁড়িয়ে পড়ে। দুশ্চিন্তায় ছিঁড়ে আসছে তার চোখ-মুখ। "চোখে এত কম দেখেন। বুড়ো মানুষ, শেষে কোনও অ্যাকসিডেণ্টই হ'ল নাকি? হাসপাতালে খোঁজ করবো?" ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করে ভদ্রা। তার চিন্তা দেখে পার্থও চিন্তিত হ'য়ে ওঠে। "আপনি বরং বাড়ী যান, আমি খোঁজ নিচ্ছি।"

কি একটু চিন্তা করে বলে পার্থ, "চলুন আগে বাড়ী যাই। বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে আসি। ট্রাম, বাস সব বন্ধ।"

জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে হাঁটে দু'জনে। আবার জোরে বৃষ্টি শুরু হয়। পার্থ সন্তর্পণে ছাতাটা ধরে ভদ্রার মাথার উপরে। ভদ্রার অবস্থা দেখে একটা কথা বলতে পারছে না সে। কি জানি, সত্যি যদি অ্যাকসিডেণ্ট হ'য়ে থাকে।

জনবিরল নিঝুম রাস্তা। শুধু বৃষ্টির শব্দ। এ অস্বস্তিকর মৌন ভঙ্গ করে'

বলে ভদ্রা, "ছোট ছেলের মৃত্যুর পর থেকেই কেমন অস্বাভাবিক হ'য়ে পড়েছেন উনি। অতবড় একটা আঘাত এ বয়সে সামলানও আর সোজা কথা নয়। কত আশা করে' বিলেত পাঠিয়েছিলেন ছেলেকে—আর সে ছেলে আত্মহত্যা করে মারা গেলেন।"

"আত্মহত্যা!" বিস্মিত চোখে তাকায় পার্থ।

ভদ্রা ম্লান, গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, "আত্মহত্যা করেই মারা যান আমার স্বামী।"

বাড়ীর দুয়ারে এসে গেছে। আর কোনও প্রশ্ন করে না পার্থ। ভদ্রাও কিছু বলে না। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে দু'জনে। আশেপাশের ফ্ল্যাটগুলোতে বাতি নিবে গিয়েছে। তিন তলার সিঁড়ি থেকে লক্ষ্য করে, তাদের বারান্দায় বাতি জ্বলছে। কি ব্যাপার? তাড়াতাড়ি উপরে উঠে যায় ভদ্রা। গিয়ে দেখে, একটা টুলের উপর নির্বিকার হ'য়ে বসে রয়েছেন বুড়ো-মানুষটি। ভদ্রাকে দেখে বলে, "বৃষ্টির জন্য বুঝি আটকে পড়েছিলে?" পার্থর দিকে তাকিয়ে বলে, "তুমি ত একেবারেই ভিজে এসেছ। যাও জামাকাপড় ছেড়ে ফেল তাড়াতাড়ি।"

ভদ্রা শ্বশুরের কথায় হাসবে না কাঁদবে, ভেবে পায় না। "পুরো দু'ঘণ্টা ধরে আপনাকে খুঁজছি, আর আপনি দিব্যি—"হেসে ফেলে ভদ্রা। আনন্দবাবু প্রতিবাদের সুরে উত্তর দেয়, "আমি কি একটা বাচ্চা ছেলে, যে ঝড়-জলে পথ হারিয়ে ফেলবো? আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'ল আজ কুড়ি বছর পর। তার বাড়ীতেই গল্প করতে করতে এত রাত হ'য়ে গেল।"

ভদ্রা হাত-মুখ ধুয়ে খাবার সাজিয়ে আনে।

পার্থকে ডেকে বলে, "আপনি আর একা একা কি খাবেন, এ ঘরেই আসুন।"

রাত্রিতে এক সঙ্গেই খেতে বসে ভদ্রা। একা বসে খেতে ভালবাসেনা সে।

ভদ্রা খাবার গুছিয়ে দিয়ে বলে পার্থকে, "আমিও কিন্তু বসলাম খেতে, যা লাগবে নিয়ে নেবেন।"

পার্থ মৃদুহাস্যে বলে, "আমাকে যা দিয়েছেন, এরপর আর কিছু লাগবে না। আপনি নিজে এবার বসুন।"

খেতে বসে আবার হেসে ফেলে ভদ্রা শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে, "আপনি দিব্যি পুরনো বন্ধুর বাড়ীতে বসে রইলেন, আর একবার ভাবলেনও না, আমি যে চিন্তা করবো।"

ভদ্রা যে তাকে কতখানি অপত্য স্নেহে পরিচর্যা করছে, কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করে' সস্নেহে হাসে আনন্দবাবু। খেতে খেতে হঠাৎ কি খেয়াল করে বলে ওঠে, "ওকি, দুধটা সরিয়ে রাখলে কেন?"

"আজ আর খেতে ইচ্ছে করছে না। দই পেতে রাখি।"

"না, না, আমাকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না। মাছ মাংস খাও না, একটু দুধ না খেলে কি করে শরীর টিকবে।"

পার্থর দিকে তাকিয়ে অভিযোগের স্বরে বলে, "আর আমি বলি, মাছ মাংস খেলেই বা কি ক্ষতি? ইয়োরোপের বিধবারা যে মাছ মাংস খাচ্ছে, তাদের কি কোনও ক্ষতি হচ্ছে? আমি কিন্তু পার্থ, বিধবা বিবাহের সমর্থক। পূর্ণ অন্তকরণেই সমর্থন করি বিদ্যাসাগর মশাইর নীতিকে। শুধু আইনত নয়, সামাজিক ভাবেই এর চালু হওয়া উচিত। আর তাদের মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ করার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করা দরকার। মাছের মধ্যে প্রোটিন ভ্যালু কত বেশী। ইতিহাস পড়নি তোমরা? মানুষ যখন থেকে মাছ মাংস খেতে শিখলো, তখন থেকেই বুদ্ধির জগতে বিপ্লব এল। আমরা বুড়ো মানুষ, আমাদের জন্য হালকা পথ্যের ব্যবস্থা, কিন্তু যারা সারাদিন খাটবে, তাদের মাছ মাংস না খেলে চলে?"

ভদ্রা উত্তর দেয়, "আমি যদি এখন মাছ মাংস খেতে আরম্ভ করি, তাহ'লে এ ফ্ল্যাটে আর থাকতে হ'বে না।"

আনন্দবাবু সস্নেহে তিরস্কারের সুরে বলে, "নিজে যা সমর্থন কর না, তা' বাইরের লোকের নিন্দার ভয়ে মেনে চলা ঠিক নয়।"

ভদ্রা জবাব দেয়, "শুধু কি বাইরের লোকের। আমার মাও তাহ'লে আমার হাতে খাবেন না।"

পার্থ এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছে শ্বশুর ও পুত্রবধূর মধুর তর্ক। ভদ্রার কথার পিঠে ব্যর্থসুরে প্রশ্ন করে পার্থ, "মাঠের মধ্য দিয়ে সরু পথ সৃষ্টি হয় কি করে, জানেন?"

"জানি।" মৃদুহাস্যে উত্তর দেয় ভদ্রা। "কিন্তু এ সব সামাজিক বিধি-নিষেধ ভেঙে চলা লৌহ প্রাচীর ভাঙার চাইতেও কঠিন।"

"কিন্তু তা' না ভাঙতে পারলে ডিমের খোসার মধ্যেই যে হাঁসের সবটুকু প্রাণ-শক্তি পচে নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

হঠাৎ থমকে পার্থর মুখের দিকে তাকায় ভদ্রা। ডিমের খোসার মধ্যে পাখীর প্রাণ যে গুমরে উঠেছে—এ খবর সত্যি কি ধরা পড়ে গেছে এ মানুষটির চোখে?

রাত প্রায় একটা। বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ে পার্থ। চোখের পাতায় স্বপ্ন-গর্ভ রাত্রির আমেজ। ঝড়-জলে জনবিরল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বুকে ভদ্রার একান্ত নির্ভরতাটুকু বার বার আনাগোনা করছে কাছে কাছে। চুলের মৃদু সুবাস, একটু অসাবধানী স্পর্শ, দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত দু'টি ভীতচকিত চোখ। যেন এক নাটকারম্ভের চালচিত্র-সঙ্গীত ভেসে আসছে সেই জলভাঙা রাস্তার বুক থেকে এ মৃদু অন্ধকারে। যেন এ ঝড়-জলের রাতে হঠাৎ মুখোমুখী দেখা হ'য়েছে তার প্রাণের নিভৃতে ঘুমিয়ে থাকা সহচরীর সাথে।

কয়টি দুর্লভ মুহূর্তের মধুর রোমন্থন সারা সত্তায়। চেতনায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে তীক্ষ্ণধী এক নারী সান্নিধ্যের উত্তাপ। দেহময়ী নয় এ নারী। তবু তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে উষ্ণ হ'য়ে উঠেছে এ অন্ধকার।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় পার্থর। আশেপাশের বাড়ীগুলো তখনও ঘুমন্ত।

সাদা সাদা মেঘ জড়ো হ'চ্ছে আকাশে। ভদ্রা উঠেছে আরও আগে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে সেও এই একই আকাশ। যেন ধ্যানস্থিতা। প্রভাতের পবিত্রতা চুলের বিন্যাসে। চোখের পাতায় কোন সুখস্বপ্নের ছোঁওয়া।

অজান্তে অভিনন্দন ঝরে পার্থর চোখে। ভদ্রা লক্ষ্য করে। কিন্তু কথা বলে না। নীরবে গ্রহণ করে নীরব দৃষ্টির অভিনন্দন।

পাখীর প্রভাত কাকলিতে এক কল্যাণ-প্রসু দিনের বন্দনা শুরু হ'য়েছে নিমগাছটার ডালে ডালে।

পার্থ ঘরে এসে লিখবার সরঞ্জাম গুছিয়ে নেয়। আনন্দবাবু মুখ ধুয়ে পত্রিকাটা নিয়ে বসে। ভদ্রা রুটি টোষ্ট করছে রান্না ঘরে। পার্থ উঠে এসে দাঁড়ায় দুয়ারে। "একটু কড়া চা চাই।"

ভদ্রা বোঝে, চায়ের চাইতেও তার সান্নিধ্যটুকু প্রয়োজন আজ পার্থর। কিন্তু সে উপলব্ধি গোপন রেখে মোড়াটা এগিয়ে দেয় দুয়ারে। "এখানেই বসুন। চা ভিজিয়েছি। চা-টা খেয়েই যান।"

আতিথ্য ঝরে তার চোখে। ধীরে ধীরে চা ছাঁকে। পার্থ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, "ঠিক শরৎকালের মত মনে হ'চ্ছে আজ সকালটা।"

"বৃষ্টির পর রোদ উঠলে শরতের রোদের মতই লাগে।" স্নিগ্ধ-স্বরে উত্তর দেয় ভদ্রা।

দু'চোখ ভরা লাল পলাশের রাঙা আবেশ।

বর্ষার স্রোত নামছে পাহাড়ী নদীতে। গৈরিক তটভূমি পলিবাহী নির্ঝরিণীর গান শুনছে প্রাণে প্রাণে।

পার্থ চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, "আজ ত আপনার ছুটির দিন। আমার কিছু কাজ করে দিতে হ'বে।"

ভদ্রা সকৌতুকে তাকায়। "কি জামা রিপু করা?" হেসে ফেলে পার্থ। "না জামা রিপুর কাজ আপনাকে দিয়ে করাব না। যে কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করান চলবে না এমন কাজ।" শান্ত আবেদনের সুরে বলে পার্থ "কিছু হিন্দি

অনুবাদ করে দিতে হ'বে। বাংলা থেকে হিন্দিতে। আর সে কাজটা গোপন রাখতে হ'বে—সে জন্যই আপনার শরণাগত।"

সপ্রশ্নে তাকায় ভদ্রা, "কোনও রাজনৈতিক ?"

এ জিজ্ঞাসায় মনে মনে খুশি হয় পার্থ। "ঠিকই ধরেছেন। আর সেটা এমন রাজনীতি, যা' বেফাস হ'লে শ্রীঘরে যেতে হ'বে আমাকে।" দৃঢ় আস্থাভরা স্বরে বলে পার্থ, "আপনার দ্বারা কোনও অনিষ্ট হ'বে না, তা' আমি জানতে পেরেছি বলেই এ কাজের ভার দিচ্ছি আপনাকে।"

'তা' আমি জানতে পেরেছি।' আস্তে বল্লেও মনে হয় ভদ্রার, যেন সারা ঘরে গম গম করছে কথাটা। ধরা পড়ে গেছে সেও তবে পার্থর চোখে ? মুহূর্তের জন্য রাঙিয়ে ওঠে ভদ্রা। নিজেকে সামলে নেয় তাড়াতাড়ি। দুপুরবেলা রান্নাঘরের কাজ সেরে পার্থর ঘরে ঢোকে সে, "দিন, কি কাজ করতে হ'বে।"

"কাজটা হ'চ্ছে অনুবাদ করার কাজ। কিন্তু এখন লোক-জন এসে পড়তে পারে। রাতে করবেন। খুব সরল হিন্দিতে অনুবাদ করবেন।"

বাংলাতে লেখা একটা আবেদন পত্র—ভদ্রা মনে মনে একবার পড়ে যায়। পার্থ নীরবে লক্ষ্য করে ভদ্রাকে। পড়া শেষ হ'লে সপ্রশ্নে তাকায় ভদ্রা পার্থর মুখের দিকে, "আপনি কি কম্যুনিষ্ট ?" নিজের অলক্ষ্যে একটু লাল হ'য়ে ওঠে পার্থ। "ঠিকই বুঝেছেন। আর আপনাকেও আমাদের চাই।"

রাত্রি গভীর। নিস্তব্ধ রাত্রি। অনুবাদ করে চলেছে ভদ্রা। মনের দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে এক মধুর ঘোষণা। "আপনাকেও আমাদের চাই।" তারও প্রয়োজন আছে পৃথিবীতে।

আপনাকেও আমার চাই নয়, 'আমাদের' চাই। এ প্রয়োজন শুধু গৃহ-কোণের নয়। শুধু আলস্যের নয়। তাকে প্রয়োজন কাজের, প্রয়োজন বহু মানুষের। এক অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত সত্তায়। সারা চেতনায় এক অননুভূত তৃপ্তির আস্বাদ।

ভোর বেলা চা নিয়ে যায় পার্থর ঘরে। চোখে মুখে, অঙ্গে অঙ্গে চেপে

রাখতে না পারা সাফল্যের তৃপ্তি। পার্থ কটাক্ষে মাত্র একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আমার কাজের কতদূর?"

ভদ্রা চা-টা রেখে অনুবাদগুলো নিয়ে আসে ঘর থেকে। "দেখুন চলবে কিনা।"

পার্থ মন দিয়ে পড়ে যায় লেখাটা। পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যায়। ভদ্রা হিন্দি জানে জানতো সে, কিন্তু এত ভাল হিন্দি জানে, জানতো না। অনুবাদের গন্ধ ছিটে ফোঁটাও নেই কোথাও।

ভদ্রা কাজের ফাঁকে আর একবার উঁকি মেরে যায় ঘরে। "কি চলবে ত?"

সহাস্যে উত্তর দেয় পার্থ, "কবিতা লিখে উনুন ধরানর কাজটি কিন্তু শেষ হ'ল আজ থেকে। আর ছুটি পাচ্ছেন না আপনি।"

ভদ্রা চলে গেলে পার্থ পত্রিকাটা খুলে বসে। হঠাৎ একটা সংবাদে চোখ আটকে পড়ে—সুলক্ষণের এক বছর জেল হ'য়েছে এক সাহেব কম্যাণ্ডাণ্টকে জুতো মারার অপরাধে।

শীগগীরই চাষীর হিন্দি সংস্করণ বের করা হ'চ্ছে। আবার দ্বিগুণ খাটুনি পড়ে পার্থর। কাজ দ্বিগুণ হ'য়েছে ভদ্রারও। তবু ক্লান্তি বোধ করে না সে। স্কুল থেকে ফিরছে ভদ্রা। স্কুলের খাতাপত্র ভরা একটা ঝোলা থলি হাতে। পিচের উত্তাপে গরম হয়ে উঠেছে পায়ের চটি। ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে। শিয়ালদার কাছে বাস ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধৈর্য হ'য়ে ওঠে ভদ্রা। "এই অফিস ফেরতা সময় বাসে ওঠাই এক দায়।" বিড় বিড় করে বলে একবার। সামনেই ফলের দোকানে রকমারি ফলের সারি। আপেল, আঙ্গুর, মোসাম্বি। খেজুরের প্যাকেটের চারদিকে মাছি ঘুরছে।

"কিছু ফল নিয়ে গেলে হয় বাবার জন্যে।" মনে মনে বলে ভদ্রা। মাস পহেলার মাইনে রয়েছে মানিব্যাগে। ব্যাগটা খুলে একটা টাকা বের করে।

হঠাৎ একটা লিথুকরা কাগজ দিয়ে যায় কে যেন হাতে। নিমেষের মধ্যে ভীড়ের ভিতরে উধাও হ'য়ে যায় ছেলেটি।

লেখাটার দিকে চোখ দিয়েই বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে ভদ্রা। এ যে তারই লেখা সেই হিন্দি অনুবাদ। লিথু করা অক্ষরে জ্বল জ্বল করছে প্রতিটি শব্দবিন্যাস। সিয়াসি কয়েদিয়কো ছোড় দেও।......শর্ম্মায়দারী বরবাদ।

তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ভাঁজ করে রাখে কাগজখানা। এক অদ্ভুত ধরনের চাঞ্চল্য অনুভব করে ভদ্রা ভিতরে। এই ট্রাম, বাস, রিক্সা, গরুরগাড়ী, অগণিত মানুষের ভীড়ে, চারদিকের দুর্বোধ্য কোলাহলের ভিতর থেকে একটি স্পষ্ট ঘোষণা গর্জে উঠেছে:—"দুনিয়াকে মজদুর এক হো।" দুনিয়ার শ্রমিক এক হও। আর সে ঘোষণা জানাচ্ছে যারা, তাদের না চিনলেও তাদেরই সঙ্গে একাত্ম সেও। তাদেরই একজন সেও।

বাড়ী এসে দেখে, পার্থর ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা ভেজান।

"আসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। যে কোনও সময়, যে কোন মুহূর্তে।" লেখা থেকে মুখ না তুলেই উত্তর দেয় পার্থ।

ভদ্রা ব্যাগ থেকে লিথুকরা কাগজখানা বের করে টেবিলের উপর রাখে নিঃশব্দে। চোখেমুখে উথলে উঠেছে চাপা আনন্দ।

পার্থ লক্ষ্য করে ভদ্রাকে। আজন্ম শুধু নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখে দেখে মুগ্ধ নার্সিসাস হঠাৎ যেন মুখ তুলে চেয়েছে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর বিস্ময়ে চমকিত হ'য়ে উঠেছে এক স্বপ্নোত্থিত নারী। কি অপরূপ সুন্দর তুমি, ভদ্রা। মূর্তিমতী সৌন্দর্যের নির্যাস। চোখ, নাক, চিবুক, শাড়ির আড়ালে স্তনাভাস, কটিদেশ, চূর্ণকুন্তল, চোখের পল্লব—কি অপরূপ।

ভদ্রা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করে, "তাহ'লে সত্যি এসব গোপনে ছাপাবার ব্যবস্থা আছে আপনাদের?" এটা যে পার্থরই করা লিথু, সে কথা প্রকাশ না করে' শুধু একটু হাসে পার্থ ভদ্রার এ সরল প্রশ্ন শুনে।

মনে হয় ভদ্রার, সে যেন একটা স্বপ্নের রাজ্যে ভেসে চলেছে। সে স্বপ্নের নায়িকা সে নিজে। সংসারের সমস্ত কাজ একই নিয়মে করে' চলেছে ভদ্রা। কিন্তু মনে হয়, যেন যন্ত্রচালিতের মতই চলছে, ফিরছে কাজ করছে সে। নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালাটা রেখে যায় ভদ্রা পার্থর টেবিলে। কথা বলে না কেউই। তবু অফুরন্ত কথার রেশ জমে থাকে এ সংযত মৌনে। প্রাণে প্রাণে বলা কথার অশ্রুত সুর, অশ্রুত আলাপ।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে নীচে নেমে যায় পার্থ। ফিরে এসে দেখে, সোহনসিং অপেক্ষা করছে তার জন্য।

"একটা চিঠি আছে আপনার দেশের।"

গণেশ দাসের চিঠি। লিখেছে,—পাহাড়পুরের জমি খুবই উর্বর। সেখানে লাঙল চালাতে পারলে ফসল ফলার আশা প্রচুর। পার্থর তাই একান্ত প্রয়োজন সেখানে। বীজ বোনার সময় বয়ে যাচ্ছে। চাষীর অভাবে জমিতে ফাটল ধরেছে।

সব শেষে লিখেছে, "রাজবন্দীরা মুক্তি পাচ্ছে দলে দলে। কাগজ চালাবার লোকের অভাব হ'বে না। আপনি সত্বর ফিরে আসুন পাহাড়পুরে।"

চিঠিটা পড়ে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে পার্থ। তাকে ডাকছে ভোগাই নদী, ডাকছে সারথী, সরস্বতী, শঙ্খমান। পাহাড়ী নদীর দু' ধারে রৌদ্রস্নাত গোচারণ ভূমি। চাষীর ছেলের রক্তে রক্তে মেশান জমির আকর্ষণ নাড়া দিয়ে ওঠে। চিঠিখানা আবারও পড়ে পার্থ। "চাষীর অভাবে জমিতে ফাটল ধরেছে।"

পার্থ মন স্থির করে ফেলে।

না নেয়ে, না খেয়ে গোটা তিনেকের সময় বাড়ী ফেরে সে। দেশে চলে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে আসে কৃষাণ অফিস থেকে। বাড়ীর সিঁড়ির কাছে এসে মনটা এক অস্ফুট বেদনায় ভরে' ওঠে। ফ্ল্যাটের কারও সঙ্গে আলাপ না হ'লেও অদৃশ্য বাঁধন পড়ে গেছে যে এরই মধ্যে, আজই প্রথম টের পায় সে। চাচাজীর হোটেলের কড়া পেঁয়াজ ভাজার গন্ধে মো মো করছে সিঁড়ির তলাটা।

জলের পাম্পটা আবার খারাপ হ'য়ে গেছে। দোতালার সিঁড়িতে জলের বালতি নিয়ে হাঁপাচ্ছে তিনতলার বাঁদিকের ফ্লাটের বৌটি।

পার্থ লক্ষ্য করে দেখে, অন্তঃসত্বা সে। বৌটির কাছে এসে বিনীত সুরে বলে সে, "দিন আমাকে, আমি তুলে দিচ্ছি জলের বালতিটা।" জলভরা বালতিটা ওপরে তুলে দিয়ে আসে পার্থ। সলজ্জ কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠে বৌটির চোখে।

বালতিটিটা রেখে আনন্দবাবুর ঘরে ঢোকে সে। আনন্দবাবু পার্থর চলে যাবার সংবাদ শুনে চমকে ওঠে। "দেশে চলে যাবে তুমি? আর আসবে না? পড়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছ?" ব্যাকুলস্বরে প্রশ্ন করে বৃদ্ধ। বৃদ্ধের এ বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বেদনা বোধ করে পার্থ। বিনম্র সুরে উত্তর দেয়, "বাবা অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। দেশের জমিজমার দেখাশুনা আমাকেই করতে হ'বে। আমিই বড় ছেলে।"

"জমিজমা আছে দেশে? তাহ'লে এ বুদ্ধি ভাল। শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যেতে মানুষ আর মানুষ থাকছে না। জোয়ান জোয়ান ছেলেদেরও যেন বার্ধক্য এসে যাচ্ছে শুধু বই পড়ে পড়ে। কিন্তু তুমি আমাদের ঘরের ছেলের মত হ'য়ে গিয়েছিলে।"

বৃদ্ধের মুখ দেখেই বোঝে পার্থ, তাকে ছাড়তে কতখানি কষ্ট পাচ্ছেন। কোমল সুরে উত্তর দেয় সে, "আপনিও আমার পিতৃতুল্য। একদিনের জন্যও নিজেকে অনাত্মীয় বলে মনে হয়নি আমার।"

ভদ্রা স্কুল থেকে ফিরে। ঘরে পা দিতেই সংবাদটা জানায় আনন্দবাবু, "পার্থ ত চল্ল।"

"চল্ল? কোথায়?"

"দেশে চলে যাচ্ছে। ওর বাবা অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। চিঠি এসেছে দেশ থেকে।"

ভদ্রা পার্থর মুখের দিকে তাকিয়েই বোঝে, এ কথার একবর্ণও সত্যি নয়।

বোঝে, রাজনৈতিক কারণেই চলে যাচ্ছে সে। পার্থ ভদ্রার সপ্রশ্ন বিবর্ণ মুখের দিকে তাকায় করুণ দৃষ্টিতে। ম্লান স্বরে বলে, "আপনাকে জানাবার জন্যই অপেক্ষা করছি। আজই স্থির হ'ল।" ভদ্রা কোনও কথা বলে না। নিঃশব্দে চলে যায় তার ঘরে।

পার্থ ঘরে এসে জিনিসপত্র গোছাতে আরম্ভ করে। সাইক্লো-টা আজই নিতে আসবে। কয়েকটা কাগজ পোড়াতে আসে সে উনানের ধারে। রাত্রির রুটি বেলছে ভদ্রা। পার্থকে দেখেও কোন কথা বলে না। একটা চাপা অপমান বোধ গুমরে গুমরে উঠছে ভিতরে। মানুষটি সব বুঝে, সব জেনেও এমন না-জানার ভান করে চলে যাচ্ছে। যেন রেলগাড়ীর কামরায় ঘণ্টা-কয়েকের আলাপ। এখন সময় হ'য়েছে, নেমে যাবে সে। ভিতরের আত্ম-মর্যাদাপ্রখর সত্তাটা একটা চাবুক খেয়ে টান হ'য়ে উঠেছে। এক দুঃসহ বেদনায় চোখের পাতা ভিজে ভিজে আসে। তবুও প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে সংযত রাখে ভদ্রা—এক বিন্দু দুর্বলতা প্রকাশ করবে না সে পার্থর কাছে।

ভদ্রার এ কঠিন নীরবতা লক্ষ্য করে পার্থ। ঝড় উঠেছে যে তারও মনে, সে সংবাদ হয়তো জানে না ভদ্রা।

উনানের উপর কাগজটা একবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে পরক্ষণেই পুড়ে কাল হ'য়ে যায়। পার্থ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দেখে। কিছু যেন বলতে চায় সে ভদ্রাকে। রুটি বেলতে বেলতে একবার মুখ তুলে তাকায় সে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না পার্থ। একটা অব্যক্ত কথা কণ্ঠ পর্যন্ত এসেও আঁটকে যায়। নিঃশব্দে চলে যায় সে ঘরে। অভিমান কেটে মায়ায় ভরে উঠে মন ভদ্রার পার্থর এ বিষণ্ণ মূর্তিতে—কঠিন দায়িত্বে বাঁধা পুরুষ। কর্তব্যের শৃঙ্খল বাঁধা পায়ে।

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে পার্থর ঘরে আসে ভদ্রা একখানা খাতা হাতে নিয়ে। পার্থ বসে বসে কতকগুলো কাগজ ফাইল করছে। কোনও ভূমিকা না করে বলে ভদ্রা, "বাবার অসুস্থতা, জমিজমা দেখাশুনা করা, এর

একটা সংবাদও নিশ্চয় সত্যি নয়? কাজেই কোথায় থাকবেন, ঠিকানাটা কি দিয়ে যাওয়া সম্ভব?"

"ঠিকানা।" মুহূর্তের জন্য কি একটু চিন্তা করে পার্থ। কিসের এক তড়িৎ ছায়া মিলিয়ে যায় চোখের তলায়। ভদ্রার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, "আপনাকে আমার কোনও পরিচয়ই জানাতে পারিনি। রাজনৈতিক কারণেই বাধ্য হয়ে' গোপন রাখতে হ'য়েছে সব কিছু। আমার বাবা অসুস্থ ও জমিজমা দেখা দু'টো সংবাদই 'অশ্বত্থমা হত ইতি' সত্য! আমার বাবা কৃষক —এখনও লাঙ্গল ধরা, চাষবাস সবই তিনি করছেন অসুস্থ শরীর নিয়েই। আর জমিজমা দেখাশুনা'করতে যাচ্ছি, এও ঠিক। তবে শুধু নিজের জমি নয়। সকলের জমি।"

কম্যুনিষ্ট মেয়ে নয় ভদ্রা, তাই কৃষকের ঘরে যে তার জন্ম, এ সংবাদটাও জানানর প্রয়োজন বোধ করছিল পার্থ। কিন্তু ভদ্রার কাছে শুধু তার এক জন্মের নয়, যেন বহু জন্মেরই জন্মবৃত্তান্ত জানা। তাই পূর্ব কথারই জের টেনে আবারও বলে সে, "ঠিকানাটা দিয়ে যাওয়ায় কি কোন বাধা আছে?"

পার্থ কাগজ নিয়ে আসে তার ঠিকানা লিখতে। ভদ্রা বাধা দিয়ে বলে, "ওতে নয়, আমার এ খাতায় লিখুন।"

কবিতার উদ্ধৃতিতে ঠাসা খাতাখানায় চোখ বুলিয়ে দেখে পার্থ। মায়াকভস্কির দু'টো লাইন একটু মন দিয়ে পড়ে। যে কোনও মৃত্যুকে করি পরাভূত, যে কোনও জীবনকে করি আলিঙ্গন।—

পার্থ ঠিকানা লিখে খাতাখানা ফিরিয়ে দেয় ভদ্রার হাতে। "আপাততঃ এখানেই থাকবো। তারপর কোথায় থাকি ঠিক নেই।"

ভদ্রা চোখ ন্যস্ত করে লেখাটায়। কত মধুর এ হস্তাক্ষরটুকু। ম্লান-স্বরে বলে একবার, "গত বছর এমনি এক দিনেই এসেছিলেন আপনি এ বাড়ীতে।"

আর কিছু বলতে পারে না সে। কণ্ঠ পর্যন্ত এসেও যে কথা বার বার থেমে যাচ্ছে, সে কথাই অশ্রু হ'য়ে মিশে চলেছে দেহময়। অনবরত জল ঝরছে অশ্রু-

গ্রন্থি থেকে। তবু এক ফোটা জল নেই চোখে। একটা কাতর যন্ত্রণায় মিলিয়ে যায় সে অন্তর্মুখী অশ্রু। আনত চোখের পাতায় অবরুদ্ধ অশ্রুর ছায়া ছলছল করে। বাইরে অন্ধকার আকাশে অশ্রুত সংগীত ভেসে বেড়াচ্ছে। সমস্ত পৌরুষ দিয়ে এ বাঁধভাঙা বন্যাকে প্রতিহত করছে পার্থ। অক্ষত নয় সেও আজ।

রাত ভরে' নিমগাছটার ডালে ডালে অশান্ত হাওয়ার বিলাপ বয়ে চলে। রোরুদ্যমানা রজনীর দীর্ঘশ্বাস। স্তব্ধতা-অভিসারী রাত্রির বুকে এ কি দুঃসহ বেদনা! এ কার অভিশাপ!

রাত শেষ হয়ে আসছে, একটি একটি করে নিবে যাচ্ছে রাতজাগা তারাগুলি। প্রহরের পর প্রহর চলেছে সঙ্গীন উঁচিয়ে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে। এ দুঃসহ তমসাকে জয় করার সুদীপ্ত প্রতিজ্ঞায় আলোর সঙ্গীন দেখা যাচ্ছে দিকে দিকে। শ্রদ্ধাবনত চোখে দেখে পার্থ উষার আবির্ভাব। যেন সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি এক কল্যাণী নারী নিজের দীপ্তিতে, নিজের মহিমায় আলোকময় হ'য়ে উঠেছেন। রাত্রির পথ অতিক্রম করে' দেখা দিচ্ছেন আলোকদাত্রী দেবী ধীর, অচঞ্চল পদক্ষেপে।

চা নিয়ে ঘরে ঢোকে ভদ্রা। স্নিগ্ধ হাসিভরা চোখে ভোরের নমস্কার। সে প্রসন্ন হাসির ছোঁয়াচ লাগে পার্থর চোখে। দুষ্টুমীর সুরে বলে সে, "বাংলা দেশের মেয়ে, আর বাংলার নদীই দেখেন নি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা—তাদের যে কি আকর্ষণ, দেখলে বুঝতেন।"

একই সুরে উত্তর দেয় ভদ্রা, "কেন, আমাদের এ গঙ্গা। হাজার বছরের সভ্যতার চিহ্ন রয়েছে তার পলিমাটিতে।"

হাজার বছরের সভ্যতা! গাঙ্গেয় সভ্যতা—শুধু একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে কত নগর, নগরীর উত্থান পতনের কাহিনী। বারানসী, পাটলীপুত্র, প্রয়াগ।

পার্থ শ্রদ্ধার চোখে লক্ষ্য করে ভদ্রাকে। কি অফুরন্ত জীবনসুষমা এর দেহের রক্তিমায়। তবু ফেনায় ফেনিল এ লবণাক্ত সমুদ্র আস্বাদের জন্য নয়।

ভদ্রা দুষ্টুমীর সুরে বলে, "আপনার দেশের নদীও দেখবো। দেখবেন, একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির হ'বো সেই যমুনাবতীর দেশে।"

গোছান শেষ হ'য়ে যায়। পার্থ কতকগুলো বই আলাদা করে' রেখে বলে, "এ বইগুলো আপনার কাছে রেখে গেলাম। সুলক্ষণ দিয়েছিল আমাকে।"

গাড়ীর সময় হ'য়ে এসেছে। পার্থ আনন্দবাবুকে প্রণাম করে' এসে জিনিষগুলো বাইরে বের করে নেয়। একটি সুটকেশ আর ছোট্ট একটি সতরঞ্চির বিছানা। শূন্য ঘরখানায় এক বার চোখ বুলিয়ে স্মিত হাস্যে ভদ্রার দিকে তাকায়, "তা হ'লে চল্লাম।"

রাস্তায় নেমে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ায় বাসস্টপে।

উপরে তাকিয়ে দেখে, ভদ্রা দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যালকনিতে। সমস্ত আকাশ জুড়েও আজ কি উদাস ব্যাকুলতা।

বাস এসে পড়ে। হাতটা তুলে শেষ নমস্কার জানিয়ে বাসে উঠে পড়ে সে। হাওড়া মুখী ঘুরে চলে বাস। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখে পার্থ— ভদ্রা তখনও দাঁড়িয়ে ব্যালকনিতে।

শাড়ির পাড় জোড়া দিয়ে দিয়ে একটা নিমা সেলাই করছে দেবকী ছেলের জন্য। দশ মাস হ'ল প্রায় ছেলের বয়স; এর মধ্যে একটা নূতন জামা গায়ে দেয়নি ছেলে। ইতি, সাথার ছোটবেলার জামা দু'চারটে যা ছিল ট্রাঙ্কের তলায়, সুবালা খুঁজে পেতে বের করে' দেয়। কিন্তু ছেলেটার ভ্রূক্ষেপ নেই কোন কিছুতেই। ছুঁচ গাঁথতে গাঁথতে সস্নেহে ধমক লাগায় দেবকী ছেলেকে, "আবার দুষ্টুমী হচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে।

সাথী এগিয়ে এসে ভাগ্নেকে কোলে তুলে নেয়। দু'গাল বেয়ে চোখের

জল পড়ছে জয়দেবের—দেখে হেসে ফেলে কুন্তী। "দে, আমার কোলে দে। তুই ফেলে দিবি।"

দীনবন্ধু দুয়ারে বসে আবারও পড়ে দেবকীর মামীশাশুড়ীর চিঠিখানা। দেবকীকে এ সপ্তাহের মধ্যে না পাঠালে তারা আবার বিয়ে দেবে ছেলের। চিন্তা করে' করে'ও কূল দেখতে পাচ্ছে না দীনবন্ধু। উঠে গিয়ে তামাকের কল্কে থেকে পোড়া টিকেগুলো ঘরের এক কোণায় উপুড় করে ঢালে। তামাকের হাঁড়িটা কাচিয়ে একটু তামাক বের করে। কল্কেটা ঠিক করতে করতে আবারও জিজ্ঞেস করে দেবকীকে, "তুই দেখ্ ভাল করে চিন্তা করে' না যাওয়াটা কি ঠিক হ'বে? দু'বার চিঠি এল, তোকে পাঠাবার জন্য। তাছাড়া আমার অবস্থা ত জানিসই। এই ত এতদিনের মধ্যে একটা নূতন জামা পর্যন্ত দিতে পারলাম না দাদুকে।"

সুবালাও বিরক্তিস্বরে বলে, "মেয়ে হ'য়ে জন্মালে শাশুড়ীর গঞ্জনা সহ্য করতেই হয়।"

দেবকী ছুঁচে ফোঁড় দিতে দিতে চোখের জল চেপে রাখে। মৃদুস্বরে উত্তর দেয়, "শুধু শাশুড়ীর গঞ্জনা হ'লে আমি কখনই এখানে থাকতে চাইতাম না।"

সুবালা কড়াস্বরে পাল্টা উত্তর দেয়। "সে দোষ তোমারই, পুরুষ মানুষের মন বুঝে চলতে শেখ নি। এমন স্বাধীনচেতা মেয়ে নিয়ে যে আমার কপালে দুঃখ আছে, তা' আমি জানতাম।"

"আমাকে নিয়ে তোমাদের আর কোনও দুর্ভোগ সইতে হ'বে না। আমি কোলকাতায় চলে যাব। সেখানে গিয়ে একটা কোনও কাজ জুটিয়ে নিতে পারবো। মামার কাছে চিঠি দিয়েছি। দু'একদিনের মধ্যেই তার চিঠি নিশ্চয়ই আসবে।"

অন্ধকারের মধ্যে ঐ একমাত্র ক্ষীণ আলোর রেখা। দীনবন্ধুও উদগ্রীব

হ'য়ে অপেক্ষা করছে সে চিঠির। ওর মামার শালারা অত বড় লোক, একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারবে।

কিন্তু সুবালা কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না বাপ ও মেয়ের এ যুক্তি। "রাজেন নিজেও একখানা দোকান দিয়েছে। ভাল কামাই হ'চ্ছে। দিনে দিনে তারও অবস্থা ফিরে যাবে। চিরদিনই আর মামাবাড়ীর অধীন হ'য়ে থাকবে না সে। দিন ফিরলে, এই ভাই বোনগুলির দিকেও ত একটু তাকাতে পারবি তুই। নিজের সুখ দুঃখটাই বড় হোল তোর। বাপ মা ভাই বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে কত কষ্ট সহ্য করে মানুষে মুখ বুজে।"

সাথী ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয়, "দিদি তোমার ছাগলে জগাই কাকার বাগানে ঢুকে নাকি বিলিতি ফুলের সব চারা খেয়ে ফেলেছে। ছাগল বেঁধে রেখেছে—খোঁয়াড়ে দেবে বলে।"

সাথীর কথা শুনে একসঙ্গে চমকে ওঠে সবাই। জগাইর বাগানে ঢুকেছে দেবকীর ছাগল। সর্বনাশ, এ ছাগল আর পাওয়া যাবে না।

দেবকী সেলাই রেখে ব্যস্ত হ'য়ে বের হয় ঘর থেকে। কিন্তু জগাই খুড়োর বাড়ী যাবে সে ছাগল চাইতে? বার বাড়ী পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ায়। বাড়ীর ভিতরে সুবালার গর্জন ক্রমশই সপ্তমে উঠছে। "ছাগল পুষে ছেলে পালবে মেয়ে আমার। অতই সহজে যদি পেটের চিন্তা মিটতো, তাহ'লে আর কথাই ছিল না।"

দেবকী ফিরে এসে কাকুতির সুরে বলে দীনবন্ধুকে, "বাবা, তুমি একবার যাও। জগাইখুড়কে একটু বুঝিয়ে বল, আর কখনও এমন হ'বে না।"

দীনবন্ধু ভারী মন নিয়ে হাঁটে জগদীশের বাড়ীমুখো। সহজে যে ছেড়ে দেবে মনে হয় না।

বেলা শেষ হ'য়ে আসে, দীনবন্ধু তবু ফেরে না। ঘরে বসে ছটফট করে দেবকী। তাহ'লে কি সত্যি খোঁয়াড়ে দিল? এ মাসের মধ্যে বিয়োবে

ছাগলটা। নূতন হেডমাষ্টারবাবুর বৌয়ের সঙ্গে কথা বলে রেখেছে সে, দুধটা রোজ দেবে তার কাছে।

উঠে গিয়ে আবার দাঁড়ায় সে ঘাটের পাড়ে। অপেক্ষা করে' করে' আর ধৈর্য থাকে না। এত নিষ্ঠুর কেন পৃথিবীর বড়লোকগুলো। কেন এত পাজী হয় ওরা।

কুন্তী ছেলেকে কোলে দিয়ে যায়। "ওর ক্ষিধে পেয়েছে, দিদি। কিছুতেই আর থাকছে না।"

মায়ের কোলে ঝাপিয়ে পড়ে জয়দেব, অনেক্ষণ পর মাকে পেয়ে আনন্দে জাপটে ধরে মাকে। শিশুর এ অসহায় আত্মসমর্পণে আর চোখের জল চেপে রাখতে পারে না দেবকী। ঘরের পেছনে বসেই ছেলেকে দুধ দেয়। মনে মনে আকুল স্বরে প্রার্থনা করে, "ওকে যখন পৃথিবীতে পাঠিয়েছ ভগবান, তাহ'লে তাকে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও।"

ছেলেকে দুধ দিয়ে আবার বোনের কোলে দিয়ে দেয়। জল আনতে হ'বে। বেলা আর নেই। পেতলের বড় কলসীটা কাঁখে তুলে নদীর দিকে হাঁটে অবসন্ন পায়ে।

নদীর ওপারে ক্ষেতগুলিতে বেলা শেষের রোদ পড়েছে। সে রোদে নাওয়া ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসে চোখের পাতায়। অভিমানী চোখের তারায় কার ছায়া ভেসে ওঠে।

চোখের জল আর চেপে রাখতে পারে না দেবকী। পার্থদা, দেশের কাজ করছো তোমরা। আর দেবকী কি দেশের কেউ নয়? একটি দিনের জন্যও খোঁজ নিলে না, দেবকী কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে। তবুও ত দেবকী ভুলতে পারলো না তোমাকে। কলসীটা জলে ডুবিয়ে ধীরে ধীরে জল ভরে। চোখ-মুখে জল দিয়ে কলসীটা কাঁখে নিয়ে আবার ওপরে উঠে আসে। সুখদার ঘরের পেছনে সীম গাছটা ফুলে ভরে' রয়েছে। বেগুনী রঙের ছোট ছোট ফুলগুলির

গায়ে কত স্বপ্ন, কত কামনা। সতৃষ্ণ নয়নে দেখে দেবকী। এমনি একখানা ঘরও যদি থাকতো তার!

মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফিরছে সুখদা। দেবকীকে দেখে বলে, "তোর বাবা আসতেছে তোর ছাগল নিয়ে।"

হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে দেবকী। "সত্যি? খোঁয়াড়ে দেয়নি তবে?"

"বাঘের খপ্পরে ছাগল পড়েছিল। প্রায় ত গেছিল। এর পর থেকে সাবধানে বেঁধে রাখিস।"

কথা বলতে বলতে পায়ের কাছে একটা সুপুরির খোল পড়ে। সুখদা খোলটা টেনে নিয়ে চলে বাড়ী। দেবকী দ্রুত পায়ে হাঁটে। পথের মোড়েই দীনবন্ধুর সঙ্গে দেখা। ছাগলের দড়িটা হাতে নিয়ে চলেছে। "এই নাও তোমার ছাগল। এবার মান থাকতে থাকতে ওটাকে বিক্রী করে দাও।"

সাথী বঁড়শি হাতে বাড়ী ফেরে। একটা কাছিম ধরে' নিয়ে এসেছে। এক-সঙ্গে সবাই খুশিতে ঝলমল করে' উঠে।

উঠোনের এক ধারে বসে হাত দা' দিয়ে কাছিমটা কেটে তোলে দেবকী। ভাইবোনরা সবাই গোল হ'য়ে দেখছে। দীনবন্ধুও একবার ঘুরে দেখে যায়। "অনেকখানি মাংস হ'য়েছে ত।" খুশিতে ছাপিয়ে উঠেছে চোখদুটি।

দেবকী কুন্তীকে বলে, "তুই কুপিটা নিয়ে আমার সঙ্গে ঘাটে চল। মাংসটা ধুয়ে আনি ঘাট থেকে।" লঙ্কা পেয়াজ বেটে মাংস বসিয়ে দেয় দেবকী। ভাই-বোনরা তিনজনই আজ রান্নাঘরে। মাংসের গন্ধে থেকে থেকে জিভে জল আসে। পাঁঠার মাংস খাওয়ার ভাগ্য হয় না তাদের। কাছিমের মাংস দিয়েই মাংস খাওয়ায় স্বাদ মেটে। কুন্তীর কোলে শুয়ে শুয়ে, সাথী কেমন করে কাছিমটা ধরলো, সে গল্প শুনছে ইতি। হঠাৎ দাদাকে প্রশ্ন করে, "কাছিমটা যদি তোমাকে কামড়ে দিত?" বোনের কথা শুনে হাসে সাথী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম জড়িয়ে আসে ইতির চোখে। দেবকী মাংসটা এক-

বার নেড়ে দিয়ে বোনের চোখের দিকে লক্ষ্য করে বলে, "কুন্তী দেখিস, ইতি যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। আমার হ'য়ে এল প্রায়।"

বাইরে কিসের ঝম ঝম শব্দ। একসঙ্গে সবাই তাকায় দিদির মুখের দিকে। দেবকী হেসে বলে, "সজারু এসেছে।"

ইতি চোখ মেলে তাকায়, "সজারু কি দিদি?"

দেবকী বোনকে বুঝিয়ে বলে সজারুর গায়ে কেমন কাঁটা থাকে। সজারুর গল্প করতে করতে মাংস সেদ্ধ হ'য়ে যায়। দেবকী ইতিকে খাইয়ে, মুখ ধুইয়ে বড় ঘরে দিয়ে আসে। কিন্তু ইতি কিছুতেই দিদির আঁচল ছাড়বে না। "দিদি তুমিও শোও।"

"আমার এখন শুলে চলে? কত কাজ পড়ে আছে?"

ইতি আবার করুণ সুরে আবদার ধরে, "আমি দিদির কাছে যাব।"

সুবালা আগুন হয়ে উঠে এক চড় মারে মেয়ের গালে, "দিদির কাছে যাব। দিদির আর কাজকর্ম নেই। চুপ করে ঘুমো শীগগীর।"

ইতি মায়ের ভয়ে কাঠ হ'য়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বালিশে মুখ গুজে। সুবালা লক্ষ্য করে আবার গর্জে ওঠে। "আবার কাঁদতে বসলো লক্ষ্মীছাড়ি। ছেলেটাকে না উঠিয়ে ছাড়বে না। ফের কাঁদবি ত অন্ধকারে বের করে দেব।"

সুবালা মেয়েকে টেনে বাইরে অন্ধকারে বের করে দিয়ে দুয়ার বন্ধ করে দেয়। ভয়ে মাত মাত করে চেঁচিয়ে ওঠে ইতি। "ও দিদি গো, আমাকে ঘরে নিয়ে যাও। ও দিদি।"

দেবকী সইতে পারে না শিশুর কান্না। খেতে খেতে এঁটোহাতে উঠে আসে সে। "চল্, আমার কাছেই চল্।" বা হাতে বোনকে কোলে তুলে ঘরে নিয়ে আসে।

চোখের জল মুছিয়ে একটা পিঁড়ি পেতে দেয়, "বোস আমি খেয়ে নেই।"

ভয়ে, দুঃখে, অভিমানে গুম হ'য়ে বসে থাকে ইতি। দেবকী তার জলে ভেজা

চোখের পাতাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে মায়ের কথা। সব-ক'টি সন্তানকেই এ ভাবে মেরে পিটিয়ে বড় করেছে তার মা। আর সে ঐ দশমাসের ছেলেরও চোখের জল এক মুহূর্তের জন্য সইতে পারে না। তার বুকের মধ্যে ছুরী বসায়, মনে হয় অসহায় শিশুর এ চোখের জল।

সাথী খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে সংবাদ দেয় খুশি হ'য়ে, "শিববাড়ী থেকে দাড়িয়াবান্ধা খেলতে আসবে তালপুকুরে।"

সাথীর কথায় ভীত হ'য়ে ওঠে' দেবকী। রাজেনও যদি আসে। আবার মনকে বুঝোয়, রাজেন নিশ্চয়ই এ গ্রামে খেলতে আসবে না। তবু মনের তলায় একটা উদ্বেগ চেপে থাকে।

সুখদার ঢেকিতে চিঁড়ে কুটতে চলে যায় সে কুন্তীকে নিয়ে। সাথীর কাছে দিয়ে যায় জয়দেবকে, "জয়কে একটু রাখত। মার জ্বর হ'য়েছে, আমি চিঁড়েটা কুটে আনি সুখপিসীর ঢেঁকি থেকে।"

সুখদা বসে বসে ঝেড়ে দিচ্ছে কোটা চিঁড়েগুলো। ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করে দেবকীকে। "শুনলাম তোর শ্বশুরবাড়ীর দেশ থেকে নাকি ম্যাচ খেলতে আসছে। জামাই আসবে না?"

"জামাইকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো।" বিরক্তি চাপা সুরে উত্তর দেয় দেবকী।

"রাগলি কেন। কি হ'য়েছে তোর, বল দেখি।" একটু অপ্রস্তত সুরে জিজ্ঞেস করে সুখদা।

ঢেঁকিঘরটা ঝেড়ে রেখে চিঁড়ের ধামাটা নিয়ে বাড়ী চলে আসে। উঠোনে পা দিয়েই সাথীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে দেবকী। "কি হয়েছেরে সাথী। কাঁদছিস কেন?"

"জয়কে নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জামাইবাবু তাকে নিয়ে গেছে।"

আচমকা একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে দেবকীর ভিতর থেকে। "নিয়ে গেছে?" দেবকীর সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ ছুটে যায়। আর একটা কথা মুখ দিয়ে বের হয় না। দরজার ওপরই বসে পড়ে সে।

দীনবন্ধু ছুটে যায় নৌকো ঘাটে। কিন্তু গিয়ে শোনে, প্রায় আধঘণ্টা আগেই শিববাড়ীর নৌকো ছেড়ে গেছে। ম্লান মুখে বাড়ী ফিরে আসে দীনবন্ধু।

সুবালা একবার দাঁত চেপে বলে উঠে, "আরও মেয়েকে পাঠিও না। এখন ফল বোঝ।"

দীনবন্ধু হঠাৎ ধমকে ওঠে স্ত্রীকে, "চুপ কর দেখি!"

সুবালা স্বামীর এ মূর্তি কোনদিন দেখে নি। সভয়ে গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কি মনে কর—ছেলেকে সত্যি রেখে দেবে।"

দীনবন্ধু কোনও উত্তর দেয় না। চিন্তা করেও কূল পাচ্ছে না। এমন অপদার্থও হয় মানুষ। ঐ টুকু দুধের শিশুকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গেল!

দেবকী রাত ভরে বিছানায় শুয়ে' শুয়ে কাঁদে। হয়তো না খাইয়েই মেরে ফেলবে ওকে। হয়তো তার জন্য কাঁদছে এখন—কোনও চেনা মুখ খুঁজছে কেঁদে কেঁদে।

অবশ হাতে কাজ-কর্ম করে চলেছে দেবকী। সারাদিনই চোখের পাতা ভিজে উঠছে। বুকের ভিতরে কান্নার কুণ্ডলী। ঘরের পেছনে বসে কাঁদছে সে—দীনবন্ধু সামনে এসে দাঁড়ায়, "এ ভাবে ত তুইও বাঁচবি না, ছেলেটাও বাঁচবে না। তার চাইতে সেখানে ফিরে যা। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মন শক্ত কর। কোনদিন এ ছেলে যদি বড় হ'য়ে মানুষ হয়, তখন সুদিন ফিরবে।"

দেবকীও বোঝে তাই। জয়কে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয় তার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সব অত্যাচারই সইতে হবে তাকে। শিববাড়ীতে ফিরে যাওয়াই

ঠিক করে। দীনবন্ধু মনসাডাঙ্গার আমিনুদ্দির কাছে যায়, একদিনের জন্য তার নৌকোটা দিতে পারে কি না। "নৌকোত পড়ে রয়েছে, কিন্তু বাইবার কেউ নেই।" ম্লান স্বরে উত্তর দেয় আমিনুদ্দি, "দেখেন দেখি, লক্ষ্মণ রাজী হয় কি না।" আমিনুদ্দির বাড়ী থেকে আবার পার্থদের বাড়ী যায় দীনবন্ধু। লক্ষ্মণ রাজী হয়। দীনবন্ধু বার বার বলে যায়, "অন্ধকার থাকতে রওয়ানা হ'তে চাই। আমি আবার এ নৌকোয়ই ফিরে আসবো।"

"আপনার কোনও চিন্তা নেই, আমি ঠিক সময়ই যাব।"

সুদাম তামাক সেজে এনে বলে, "শিববাড়ীর সরকাররা ত ধনী লোক। সেবার নীল পূজোয় শিববাড়ী গিয়েছিলাম। সরকারদের মস্ত বাড়ী।"

দীনবন্ধু বাধা দিয়ে বলে, "সরকারদের মেলাই শরিক। আমার জামাইদেরই জ্ঞাতি পাঁচানীরা। কিন্তু ওদের কোনও অংশ নেই। তবে জমিদারী না থাকলেও জমি-জমা, তালুক আছে যথেষ্ট। দিনরাত মাহিন্দা খাটছে।" মেয়ে বাড়ীর প্রাচুর্যে উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় দীনবন্ধু। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, "টাকা পয়সা থাকা না থাকার সঙ্গে সম্পর্ক নেই মেয়েদের কপালের সুখ-দুঃখের। ভাল অবস্থা দেখেই ত মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সুখে থাকবে মেয়েটা। কিন্তু কোথায় সুখ। মানুষ না আমার জামাই।" দীনবন্ধু আর চেপে রাখতে পারছিল না মনের ক্লেশ। "মেয়েটাকে মেরে রাখে না।"

একসঙ্গে আঁতকে ওঠে সুদাম ও লক্ষ্মণ দু'জনেই। "আপনাদের ভদ্রলোকের মধ্যেও বৌকে মারে?"

"ভদ্রলোক!" বিদ্রূপার্ত স্বরে উচ্চারণ করে দীনবন্ধু। "ভদ্রলোক, ছোট-লোক কারও কপালে লেখা থাকে না। ও জিনিষ চামড়ার তলায় থাকে। বুঝলে পার্থর বাপ। ও আত্মার জিনিষ। ফর্সা জামা কাপড় পরে' জুতো পায়ে মচ মচ করলেই ভদ্রলোক হয় না। দু'চারটে ইংরেজী ফার্সি বলতে শিখলেও ভদ্রলোক হয় না। আর আমাদেরও চোখও ত আজকাল তেমনি। না হ'লে

একটা অমানুষের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিলাম বাপ হ'য়ে। বুঝতেও পারলাম না। দিব্যি চালাক চতুর ছেলে। দেখতে শুনতে ভাল। অবস্থা ভাল। পাঁচ জনের ঘর।"

অবাক হ'য়ে দীনু মাষ্টারের মুখের দিকে তাকায় সুদাম। চোখের পাতা ভিজে উঠেছে বুড়ো মানুষটার—শেলের মত বুকে গিয়ে বেঁধে। সুদাম উপদেশের সুরে বলে, "মেয়েকে সেখানে পাঠাচ্ছেন কেন?"

"পাঠাচ্ছি কি আর নিজের ইচ্ছেতে। কাল খেলতে এসে দশমাসের ছেলেটাকে নিয়ে গেছে সেই অপদার্থ-টা।"

"ছেলেকে নিয়ে গেছে, ছেলের মাকে না নিয়ে?" এ যেন বিশ্বাসও করা যায় না।

দীনবন্ধু সখেদে উত্তর দেয়, "সেজন্যই ত এসেছি নৌকোর খোঁজে। মেয়েটা কেঁদে কেঁদে অস্থির হ'য়ে পড়েছে। এ দৃশ্য আর দেখতে পারছি না। যা আছে তার অদৃষ্টে তাই সে ভোগ করবে।"

লক্ষ্মী মেয়ে কোলে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। মেয়েকে একটু চেপে ধরে বুকে এ কাহিনী শুনে।

দীনবন্ধু শিশুটিকে দেখে স্নেহগভীর চোখে। "এই তোমার নাতনী? কত বয়স হ'ল?

"এইত প্রায় এক বছর হতে চল্ল। পার্থ খালাস পাবার মাসেই জন্ম। তাই ত বাপে নাম রেখেছে মুক্তি।"

দীনবন্ধু সতৃষ্ণ নয়নে দেখে লক্ষ্মীকেও। চাষীর ঘরের মেয়ে, চাষীর ঘরের বৌ। চোখে-মুখে কত সুখ সোহাগের ছাপ।

উঠে পড়ে দীনবন্ধু। লক্ষ্মণকে আবারও বলে যায়, "দেখ, বাপু, আবার যেন ডাকতে আসতে না হয়।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কাক ডাকার আগেই গিয়ে পৌছাব।"

দেবকী সারাদিন কাঁদছে। ভাই-বোনদের ম্লান মুখগুলির দিকে তাকাতে

পারছে না সে। ভাই বোনদের ছেড়ে যাচ্ছে সে, হয়তো জন্মের মতই এ যাওয়া। তবু না গিয়ে উপায় নেই তার। জয়দেব তার নরম হাতগুলো দিয়ে তাকে ডেকে ডেকে আকুল হ'য়ে উঠেছে। মাঠ, ঘাট, খাল, বিল পেরিয়ে সে নরম হাতের হাতছানি এসে পৌছোচ্ছে তার বুকের মধ্যে।

অন্ধকার ভোরে উঠোনে এসে ডাক দেয় লক্ষ্মণ, "মাষ্টারবাবু জাগা নাকি ?"

ধড়মড় করে' উঠে বসে দীনবন্ধু। সারারাত কেঁদে কেঁদে শেষ রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল দেবকী। দীনবন্ধু উঠে ডাক দেয়, "দেবকী ও দেবকী, ওঠ মা, এবার। অন্ধকার থাকতেই নৌকো ছাড়তে হ'বে।"

চোখ মেলেই মনে হয় দেবকীর, বুকের মধ্যে একটা পাথর বেধে রেখেছে কে। সুবালা বলে, "ইতিকে ডেকে কাজ নেই। কান্নাকাটি সুরু করবে।" ঘুমন্ত বোনের মাথায় ঠাণ্ডা হাতখানা রাখে দেবকী। ইতি ঘুম থেকে উঠে কত যে খুঁজবে তাকে, কিন্তু আর কোনদিন দেখবে না সে তার দিদিকে। ফুলে ফুলে কাঁদে দেবকী। সুবালারও আজ চোখে জল দেখা দেয় মেয়ের এ কান্নায়। ঘাট পর্যন্ত আসে সঙ্গে। নৌকো ছেড়ে দেয়। নিঃশব্দে চোখের জল মোছে সুবালা ঘাট পাড়ে দাঁড়িয়ে।

জুয়ান হাতের বৈঠা। আকাশ ফর্সা হ'বার আগেই নদী ছাড়িয়ে খালে গিয়ে পড়ে নৌকো। দু'ধারে পাট ক্ষেত। লক্ষ্মণ বৈঠাটা ঢুকিয়ে রেখে লগি বের করে। মাথায় কাপড় দিয়ে ছইয়ের মধ্যে মুখগুজে বসে রয়েছে দেবকী। লক্ষ্মণ দেখে দেখে ভাবে, এমন মায়াবতী মেয়েকেও এত কষ্ট দেয় জামাই। কেমন পুরুষ মানুষ সে ? লক্ষ্মীর বুকের গরমটুকু এখনও জড়িয়ে রয়েছে তার গায়ে।

দীনবন্ধু কাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, "সরকার বাড়ীর খালে জল আছে না ?"

দেবকীর আর্ত চোখের সামনে পর পর ছাড়িয়ে যাচ্ছে স্কুলের মাঠ, পাটের কুঠি, শিবমন্দির, বটগাছ। "এখানেই নৌকো ভিড়ান লক্ষ্মণদা। বড় পুকুরে গিয়ে আর কাজ নেই।"

দীনবন্ধু মৃদু আপত্তির সুরে বলে, "কিন্তু সড়কের ওপর দিয়ে তোর যাওয়া ঠিক হ'বে ?"

"সড়ক দিয়ে যাব না। গোয়ালবাড়ীর পেছন দিয়ে যাব।" মাথায় ঘোমটাটা আরও একটু টেনে নিয়ে নৌকো থেকে নামে দেবকী।

গোয়ালবাড়ীতে গরুর খড় কাটছে মাহিন্দারা। দেবকীদের দেখে সবিস্ময়ে তাকায় তারা। কে একজন মৃদু গলায় বলে, "এই না শুনলাম রাজেন বাবুর বৌ ছেলে ফেলে পালিয়ে গেছে কার সঙ্গে ?" লক্ষ্মণের কানে যায় কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ভয়ের ডাক দেয় মনের মধ্যে। একটা কিছু গোলমাল না হয়।

দেবকীর আর দীদবন্ধু উঠোনে পা দিতেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে দেবকীর মামীশাশুড়ী। থান কাপড় পরা। ছোট করে' ছাটা চুল। মামাশ্বশুরের মৃত্যুর পর এই প্রথম দেখা। দীনবন্ধুকে লক্ষ্য করে বলে টুসির মা, "মেয়েকে আবার এনেছেন কেন ? এ বাড়ীতে তার আর জায়গা হবে না।"

মায়ের কথা শুনে ছেলেমেয়েরা সব ঘর থেকে এসে ভীড় করে উঠোনে। টুসির কোলে জয়দেব হঠাৎ মাকে দেখতে পেয়ে দু'হাত বার করে' ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় মায়ের কোলে। স্ফূর্তিতে নেচে ওঠে চোখ দুটি। দেবকীও হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে নিতে যাবে, ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ায় রাজেন। টুসিকে ধমক লাগিয়ে বলে, "ছেলেকে ঘরে নিয়ে যা টুসি। কুলটা মায়ের কোলে আর ছেলেকে দিতে হ'বে না।"

"কুলটা ?" আর্তনাদের মত গলা থেকে আওয়াজ বের হয় দীনবন্ধুর। ঘরের ভিতর থেকে জয়দেবের কান্না শোনা যাচ্ছে। কথা বলতে শেখেনি শিশু—কান্নার মধ্য দিয়েই না জানি কত অভিযোগ জানচ্ছে সে। বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছে দেবকীর। তবু এক ফোঁটা জল নেই দেবকীর চোখে। চারদিকে ছেলেপুলেরা, কামলারা। তার মাঝে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে রাজেন,

"কুলটা নয় ? আপনাদের গ্রামের ছেলে পার্থর কাছে লেখা তার চিঠি এখনও আছে আমার কাছে।"

ঘর থেকে জয়দেবের চিৎকার ভেসে আসছে। সমস্ত শরীর অবশ ক'রে দিচ্ছে সে। নৌকো পর্যন্তও হেঁটে যাবার শক্তি নেই।

দীনবন্ধু রাজেনের কথা শুনে হতবাক হ'য়ে গেছে। পার্থর মত ছেলের দ্বারা কোনও অন্যায় কাজ অসম্ভব। তবু এ পাষণ্ডের সঙ্গে আর কোনও তর্কাতর্কি করতে প্রবৃত্তি হয় না।

কিন্তু এত বড় অন্যায় চুপ করে সহ্য করার মত ছেলে নয় লক্ষ্মণ। সে এগিয়ে এসে বলে, "ওনাকে ঘরে নিতে আপত্তি, কিন্তু ঐ দুধের ছেলেটাকে আটকে রেখে কি লাভ হ'বে ? ছেলেটাকে দিয়ে দিন। মা ছাড়া কি ঐ টুকু ছেলে থাকতে পারে ?" কথা আর শেষ করতে দেয় না রাজেন। "মা ছাড়া ছেলে থাকতে পারে কি না, সে আমি দেখবো। ছেলে যখন আমার, তার উপর সম্পূর্ণ অধিকারও আমার।"

দীনবন্ধু বোঝে, বৃথা চেষ্টা। এর কাছে কাকুতি মিনতি—কিছুরই মূল্য থাকবে না। লক্ষ্মণকে বলে "ছেলেকে ও কিছুতেই দেবে না। চল ফিরে যাই"

গোয়ালবাড়ীর পেছন পথে হেঁটে চলেছে দেবকী। হেঁটে যাচ্ছে নয়, যেন দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। দশমাসের শিশুর বুক ফাটা কান্না সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলেছে। বুলি ফোটেনি যে শিশুর, তার ভাষা একমাত্র মা ছাড়া কে বুঝবে। নৌকোয় উঠে বুক ফাটা চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে দেবকী। জুয়ান পুরুষ লক্ষ্মণেরও চোখ ভিজে আসে সে কান্না দেখে। তার বুকের হাড়গুলিও বুঝি ভেঙে যাচ্ছে এ চোখের বন্যায়।

লক্ষ্মণ বৈঠা কাটতে কাটতে একবার সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। দীনবন্ধুকে বলে, "ছেলে আটকে রাখতে কিছুতেই পারবে না। কোর্টে গিয়ে নালিশ করুন। ছেলে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে পাবেন। জেলখানায়ও যে সব মেয়েদের পুলিসে ধরে নিয়ে যায়, তাদেরও কচি সন্তানদের মায়ের সঙ্গেই থাকতে দেয় জেলখানাতে।"

দেবকী মুখ তুলে তাকায় লক্ষ্মণের দিকে। লক্ষ্মণ তার অশ্রুসিক্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলে, "এক গ্রামের ছেলেকে একখানা চিঠি লিখেছে বলেই কুলটা হয়ে গেল বৌ।" বাবার সামনে এত বড় অপবাদে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল দেবকী। লক্ষ্মণের কথায় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ঝাপসা চোখ দুটি। করুণ চোখে তাকিয়ে দেখে, নদীতে এসে পড়েছে নৌকো। লগিটা ঢুকিয়ে রেখে বৈঠা বের করে নেয় লক্ষ্মণ।

ধীরে ধীরে থেমে আসছে গাড়ীটা—ঘুমটি ঘর ছাড়িয়ে যায়। পার্থ জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে প্ল্যাটফর্মে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। কোনও চেনা মুখ চোখে পড়ে না। গেটকিপারের সবুজ নিশান, আর দু'চারটি অচেনা মুখ।

মাত্র এক মিনিটের জন্য এ ষ্টেশনে গাড়ী থামবে। পার্থ ঝোলা থলিটি কাঁধে ঝুলিয়ে কামরার দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। রেল কামরার খোলা দুয়ার দিয়ে শীতের হাওয়া লাগে চোখে-মুখে। চুলগুলি উড়ছে বিপরীত হাওয়ায়। তবু বড় আরাম লাগে এ ঠাণ্ডা হাওয়ায়। দু'দিন আগে এমনি সময়ে ছিল সে মধ্যপ্রদেশে। সাতশ মাইল দূরের সেই বিচিত্র নগর, নগরী, নদ, নদী, বিচিত্র বেশভূষা, কথাবার্তা, কোলাহল সব ছাড়িয়ে আবার এই ব্রহ্মপুত্রের দেশে। গম ভুট্টার ক্ষেত, মাটির ঘর, রঙিন ঘাগরা, জাতাপেষার গান, বহুদূরে ঝাপসা হ'য়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে শৈশবের পরিচিত মেঠোপথ, বাঁশঝাড় আম, জাম, কাঠাল ; মলি বাঁশের ঘর, টিনের চালা।

গাড়ী থেকে নেমে পড়ে পার্থ। গার্ডের হুইসিল বেজে উঠে—গাড়ীটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যায়। ষ্টেশনের বাইরে গরুর গাড়ীগুলি উৎকর্ণ হ'য়ে রয়েছে সোয়ারীর অপেক্ষায়। এক মুসলমান বর বধূকে নিয়ে বসে একটা গাড়ীতে। কাপড় দিয়ে ঢাকা ছইয়ের দু'দিকে। পার্থ গাড়ী নেয় না। ক্ষেতের আল ধরে' হাঁটতে থাকে। ক'দিন ধরে বাস আর গাড়ী, গাড়ী আর

বাসে বসে বসে হাঁপ ধরে গেছে। আবার এই পাঁচ মাইল পথ গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনি খাওয়া অসম্ভব। একটানা ট্রেনযাত্রার পর ভোরের শিশিরে ভেজা এই ক্ষেতের ধার দিয়ে হাঁটতে বড় ভাল লাগছে। দু'দিকে ক্ষেতের পর ক্ষেত। ফুলন্ত রবিশস্য, ঘন সবুজ কলাই ক্ষেতের গায়ে গায়ে হলুদ সরষে ক্ষেত। তার পাশে সাদা হ'য়ে রয়েছে মুলোক্ষেতগুলি। পথ চলতে চলতে মন দিয়ে কি শোনে পার্থ। তোষলা ব্রতের ছড়া বলছে কুমারী মেয়েরা।

"কোদাল কাটা ধান পাব,
গোয়াল আলো গরু পাব,
দরবার আলো বেটা পাব,
সভা আলো জামাই পাব,
সেজ আলো ঝি পাব
আড়ি মাপা সিঁদুর পাব,
ঘর করবো নগরে,
মরবো গিয়ে সাগরে,
তোমার কাছে মাগি বর
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।"

তোষলা ভাসাতে চলেছে ছোট ছোট মেয়েরা। পার্থ সস্নেহে হাসে। কি মধুর কামনা। অনুভূতির পর্দা ঠেলে কোন দূর শৈশবে নিয়ে চলেছে তাকে। লক্ষ্মীও করতো এ তোষলা ব্রত। সূর্য ওঠার আগে নদীতে তোষলা ভাসাতে যেতো নূতন সরাতে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে। এখনও মনে আছে সেই :—

"গাইয়ে গোবর সরষে ফুল
আসন পিঁড়ি এলোচুল
গেয়ের গোবরে সয়ষে ফুল
ঐ করে পুজি আমরা মা বাপের কুল।

তুষ তুষলি গেল ভেসে
বাপ মার ধন এল হেসে”

এই বিচিত্রবর্ণা ক্ষেতের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে আজও সেই ব্রত কথা। “রায় উঠছেন, রায় উঠেছেন বড় গঙ্গার ঘাটে।” ব্রতী মেয়েদের সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গান পাখীরাও একই সূর্যের আগমনী গেয়ে উঠেছে। নদীর ওপারে সূর্যের আভাস দেখা যাচ্ছে। “রায় উঠেছেন, রায় উঠছেন ছোট গঙ্গার ঘাটে।”

এই শস্য ভরা ক্ষেত, এই মাটি, সূর্য, পাখী, ভোরের আকাশ আর এই ব্রতকথার সুরের সঙ্গে তার প্রাণের এক নিভৃত সম্পর্ক অনুভব করে পার্থ। গৃহস্থ ঘরের এই ছোট ছোট মেয়েরা—সবাই তার সহোদরা। তাদের এ সরল জীবনের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে চলেছে সে। এ চলার বিশ্রাম নেই, যতদিন না সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয়। শত শত কন্যা কুমারীর কামনার রঙে রাঙা লাল পতাকা।

“তোমার কাছে মাগি বর
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।”

কি স্পষ্ট কি সরল কামনা। মাঠের পর মাঠ, ক্ষেতের পর ক্ষেত ছাড়িয়ে চলেছে পার্থ।

ব্রততী মেয়েদের সুর ক্ষেতের বুকে ছড়িয়ে দুরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে সুরের ‘রেশ ধরে’ তারই পাশে পাশে চলেছে একটি নারী হৃদয়। কোমল। স্নিগ্ধ। শস্যক্ষেতের এ বুকভরা স্নিগ্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে আজ প্রথম টের পেল পার্থ, কতখানি কোমল করে রেখেছে ভদ্রা তার সমস্ত অনুভূতিকে। অনুভূতির তারে তারে শুরু হ’য়েছে ভৈঁরোর প্রথম আলাপ। প্রভাতের প্রথম মাঙ্গলিকী। জীবনের সঙ্গীত বয়ে চলেছে তার মনের অন্তরা দিয়ে। সে সঙ্গীতের ধ্বনি-যন্ত্র রয়েছে তারই প্রাণের সহচরী এক কল্যাণী নারীর হাতে। আধা স্পষ্ট, আধা অস্পষ্ট স্বপ্নাবেশ। দুটি প্রতীক্ষানিবিড় চোখের উঝে মেঘমল্লারের মৃদু রেশ। কোনও অচেনা ফুলের সৌরভ……।

ধ্যান ভেঙ্গে যায়। মনসাডাঙ্গার পোল। একমুখ হাসি নিয়ে কে এগিয়ে আসছে? কে? মফির মা? "ভাল আছো?"

খাল পারের ছেলেরা, মেয়েরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য এত অভ্যর্থনা, এত হাসিমুখ? ভদ্রা, আমার সঙ্গীতের একতারা রয়েছে এদের প্রত্যেকের হাতে। এদের এ চোখভরা হাসি উপেক্ষা করার সাধ্য আমার নেই, ভদ্রা।

দূর থেকে অর্জুনের গলার স্বর কানে আসছে, "মা, দাদা এসেছে।"

"কে পার্থ এসেছে?" মঙ্গলার আবেগ কম্পিত কণ্ঠস্বর। বাদাম গাছ তলায় এসে দাঁড়িয়েছে সুদাম, মঙ্গলা, লক্ষ্মী—কোলে মেয়ে।

"এরই মধ্যে এত বড় হ'য়ে গেল তোর মেয়ে?" পার্থ আশীর্ব্বাদী চোখে তাকায় শিশুটির দিকে। লক্ষ্মী উত্তর দেয়, "এরই মধ্যে হ'ল? একবছর ঘুরে এল প্রায়। এদ্দিনে মনে পড়লো আমাদের কথা?"

বোনের অভিযোগে হাসে পার্থ। "মনে না পড়লে এলাম কেন?"

সুদাম প্রশ্ন করে, "কোলকাতা থেকে এলে? এ সময়ে কোলকাতার গাড়ী কোথায়?" কণ্ঠস্বরে তার সম্মানের ছোঁওয়া ধরা পড়ে।

পার্থ উত্তর দেয়, "ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে পাটনা গিয়েছিলাম জেলখানার এক বন্ধুর বাড়ী। পাটনা থেকে কাটিহারের পথে এলাম বাহাদুরাবাদ হ'য়ে।"

সুদাম থেকে থেকে তাকায় ছেলের মুখের দিকে। বুকের ভিতরে একটা ব্যথার তারে টান পড়ে মৃদুভাবে। তারই ছেলে, তারই সন্তান—তবু কত দূরের লোক।

পার্থ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "লক্ষ্মণকে ত দেখছি না।"

"সে গেছে দীনুমাষ্টারের মেয়েকে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়ী।" আর কিছু বলে না সুদাম। পার্থ স্নান করে এসে বসে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে। "কতকাল পর পুকুরে স্নান করলাম।"

মঙ্গলা কাঁসার বৃন্দাবনীতে চিড়ের মোয়া নারকেলের তক্তি সাজিয়ে আনে। পার্থর মুখের দিকে তাকায় স্নেহাকুল দৃষ্টিতে, "কিছুদিন থাকবে ত এখানে ?"

পার্থ মায়ের কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে' করুণভাবে হাসে, "এ অঞ্চলেই থাকবো এখন। তবে বাড়ীতে থাকবো দিন সাতেক। তারপর যাব পাহাড়পুর।"

সুদাম একবার রান্নাঘরে গিয়ে খোঁজ করে আসে। "সেই পেয়ালাটা আছে ত ?"

মঙ্গলা হেসে উত্তর দেয়, "সে পেয়ালা লক্ষ্মী কোনদিন ছুঁতে দিয়েছে কাউকে ?"

লক্ষ্মী তার বাক্স খুলে পেয়ালাটা বের করে আনে। অর্জুন জাল দিয়ে এক ঝাঁকি ছোট মাছ ধরে নিয়ে আসে। জালের গায়ে গায়ে আটকে রয়েছে বাঁশপাতা মাছ। পার্থ উঠোনে নেমে আসে। "অনেক মাছ পেয়েছিস ত ?"

লক্ষ্মী এসে তাড়া দেয় অর্জুনকে, "শীগগীর যা, একটু চা পাতা কিনে নিয়ে আয়।"

সুদাম বলে, "কোলকাতায় শুনি, মাছও নাকি সের দরে বিক্রী হয়।"

লক্ষ্মীই উত্তর দেয়, "মাছ কি বল, মাটিও সেখানে বিক্রী হয়।" বলেই হেসে কুটি পাটি হয় লক্ষ্মী। পার্থ হেসে ফেলে বোনের কথা শুনে। "তোকে একবার নিয়ে যাব সেখানে।"

মঙ্গলা রান্নাঘরের পেছনে বটি, ছাই নিয়ে বসেছে মাছ কুটতে। লক্ষ্মীকে ডাক দিয়ে বলে, "যা ত লক্ষ্মী, ভাতের জ্বালটা একটু ঠেলে দিয়ে আয়।"

মনের তলার খুশির প্রলেপ পড়েছে তার চোখমুখে। এত সুখের আড়ালেও থেকে থেকে মনে হয়, মাত্র সাত দিন পরই চলে যাবে পার্থ। পার্থ চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই নোলকপরা ছোট্ট লক্ষ্মীরও চোখেমুখে ঝরে পড়েছে মায়ের স্নেহ। মাতৃত্বের তৃপ্তি। দুপুর বেলা একটা বই নিয়ে উঠোনে এসে বসে সে। বড় ভাল লাগছে শীতকালের এ রোদটুকু। বাদামগাছটা থেকে বড় বড় বাদামী

রঙের পাতা খসে পড়েছে উত্তুরে হাওয়ায়। শীতার্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি। ত্রিপুরী অধিবেশনের ছবিগুলি আবার ভাবে পার্থ। ত্রিকুট পাহাড়। বাঁশের ক্যাম্প, তোরণ, শহীদ বেদী। উত্তেজিত জনতা, সীতারামিয়া, জওহরলাল, সুভাস বোস। কি প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা।

মঙ্গলা উঠোনে বসে ধানের ডোলগুলোয় গোবর দিয়ে লেপছে। উঠোনের কোণায় স্তূপীকৃত ধান, মাড়াইয়ের অপেক্ষায়। ত্রিপুরীর সেই কোলাহল, ডেলিগেটদের ক্যাম্পে রাত ভরে তর্কবিতর্ক, উত্তেজনার এক মহা-হট্টোগোলের পর এই গার্হস্থ্য জীবনের সুরটুকু বড় স্নিগ্ধ লাগছে চোখে। ঘরের চালায় দু'টো পায়রা সরবে পরস্পরকে সোহাগ জানাচ্ছে। সারা বাড়ীখানায় জড়িয়ে রয়েছে এক নবান্নের স্বপ্ন।

আমিনুদ্দি এসে বসে উঠোনে। আলির খবর জানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। "প্রেসের কম্পোজিটারের কাজ শিখেছে আলি। মেখী হাসপাতালের নার্সের কাজ শিখছে।"

"তাহ'লে ভালই আছে।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমিনুদ্দি। "তবে, আমার সঙ্গে আর হয়তো তার দেখা হ'বে না। বুড়ো হ'য়ে এলাম, আর ক'দিনই বা বাঁচবো।"

সারাদিন ভরে' কথা বলছে পার্থ মা, বাবা, ভাই বোন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে। সে কথাবার্তা, হাসি তামাসার আড়ালে ধীরে বয়ে চলেছে এক ফল্গু-স্রোতা অন্তরের স্নিগ্ধ উপলব্ধি। প্রেম-নিবিড় হৃদয়ের শান্ত অপেক্ষা।

লক্ষ্মণ বাড়ী ফেরে। না নাওয়া, না খাওয়া মূর্তি। পার্থকে দেখে অবাক হয়। "কি, কয় ঘণ্টার অতিথি?"

পার্থ হাসে। "এখানেই থাকতে এসেছি। আর যাব না।" বিশ্বাস করতে পারে না লক্ষ্মণ। "সত্যি?"

আবারও একটু হাসে পার্থ। মঙ্গলা জামাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "কি, তোমার নাওয়া খাওয়া হয় নি?"

"নাওয়া খাওয়া? যার মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ভদ্রলোকদের বাড়ীতেও

এমন কাণ্ড কারখানা, জানতাম না। দীনু মাষ্টারের মেয়েকে তারা ঘরে ঢুকতে দিল না।"

পার্থ লক্ষ্মণের কথায় বিস্মিত হ'য়ে মুখের দিকে তাকায়, লক্ষ্মণের কথার খেই খুঁজে পায় না। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে সে, "কাকে ঘরে ঢুকতে দিল না? দেবকীকে?"

লক্ষ্মণ পার্থর চোখে-মুখের কাল ছায়া লক্ষ্য করে। কি একটু ভেবে নিয়ে আবার বলে সে, "আর সে কি কান্না মেয়েটার। দশমাসের ছেলেটাকে একবার একটু কোলেও নিতে দিল না।"

পার্থ স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। লক্ষ্মণের টুকরো টুকরো কথা জোড়া দিয়ে দেবকীর জীবনের এক মহাদুঃখের আভাস পাচ্ছে। বিস্মিত স্বরে আবারও প্রশ্ন করে সে, "কেন? দেবকীর সঙ্গে সদ্ভাব নেই তার স্বামীর?"

"সদ্ভাব! মেয়েটাকে নাকি মেরে রাখে না। নিজের মুখে বলে গেলেন দীনুমাষ্টার জামাইয়ের কীর্তি কাহিনী।"

একটা কথা আর বের হয় না পার্থর মুখ দিয়ে। স্তব্ধ হ'য়ে শুনে চলেছে সে এদের কথাবার্তা, সংক্ষুব্ধ আলোচনা, দেবকীর শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনী। গতবার যখন এল সে, একটি কথাও জানাল না দেবকী!

সবাই চলে গেলে লক্ষ্মণ স্বর নামিয়ে বলে, "সব চাইতে আপসোসের কথা, ছেলেটাকে ত ফিরিয়ে দিলই না, উপরন্তু একটা দুর্নাম দিয়ে তাড়িয়ে দিল তাকে।"

লক্ষ্মণের কথায় চমকে সপ্রশ্নে তাকায় পার্থ। লক্ষ্মণ পূর্বকথারই জের টেনে বলে চলেছে, "সে নাকি তোমার কাছে চিঠি লিখেছিল। আর সে চিঠি এখনও রয়েছে রাজেন সরকারের কাছে।"

পার্থ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়। দেবকী চিঠি লিখেছিল তাকে। আর সে চিঠি রয়েছে তার স্বামীর কাছে। কিন্তু কি এমন কথা ছিল সে চিঠিতে, যার জন্য এত বড় শাস্তি তার?

লক্ষ্মণের খাওয়া হ'লে তালপুকুর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে পার্থ। নদীর পথেই দেবকীর সঙ্গে দেখা হয়। হেডমাষ্টারবাবুর বৌয়ের কাছে ছাগলটা বিক্রী করে বাড়ী ফিরছে সে। টাকা কয়টা আঁচলে বাঁধা। এ টাকা দিয়েই তার কোলকাতা যাবার গাড়ীভাড়া হ'বে।

পার্থকে পথের মাঝে দেখে থমকে দাঁড়ায় দেবকী। নিঃশব্দে পার্থকে যাবার পথ দিয়ে সরে দাঁড়ায় সে। পার্থ এর অর্থ বুঝে বলে, "দেবকী, তোমার সঙ্গেই দেখা করতে চলেছি আমি।"

হঠাৎ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে দেবকী, "না, না, আমাদের বাড়ী আর যেও না তুমি। কিছু বলার থাকে এখানেই বল।"

একটা চাবুক খাওয়া মুখে তাকায় পার্থ। ক্লান্ত সুরে বলে, "লক্ষ্মণের কাছে আমি সব শুনেছি। সব শুনেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। যেহেতু আমি জানি, মিথ্যা দুর্নামে ভেঙ্গে পড়ার মত মেয়ে তুমি নও।"

দেবকী মুখ তুলে উত্তর দেয়, "দুর্নাম মিথ্যেই হোক, আর সত্যিই হোক তার জন্য কোনও দুঃখই আমার থাকতো না, যদি আমার জয়কে ফিরিয়ে—" আর শেষ করতে পারে না সে কথা। হঠাৎ চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সামনের সুপারি গাছটা শক্ত করে ধরে—যেন একটা আশ্রয় ধরার মত। এক বিন্দু জোর নেই দেহে দাঁড়াবার মত। শাড়ির আঁচল দিয়ে চেপে রাখতে চেষ্টা করে কান্না। কিন্তু পারে না। চোখের জলে ভিজে যায় আঁচল। পার্থ নিশ্চ প হ'য়ে দেখে দেবকীকে। একটি সান্ত্বনার ভাষাও খুঁজে পায় না।

দেবকী নিজেকে সংযত করে আবার বলে, "পার্থ দা, যদি জানতে, এ চারটি বছর কি ভাবে কাটিয়েছে দেবকী।" এ প্রাপ্য তিরস্কারে চোখ নত করে পার্থ—অশ্রুগোপনে রাঙা সে চোখ। কাতর দৃষ্টিতে দেবকীর দিকে তাকায়।

তার উদাসীনতাই এ পরিণতির এজন্য দায়ী। এক ক্লেশকর অপরাধবোধে বুকের ভিতরে টন টন করছে একটা গভীর ক্ষত। তবু আশা দেওয়া সুরে বলে, "জয়দেবকে আমি যে করেই হোক এনে দেবো তোমাকে।"

দেবকী ম্লানকণ্ঠে উত্তরে দেয়, "আমরা কালই রওয়ানা হ'য়ে যাচ্ছি আমার মামার কাছে। এরপরও আর গ্রামে থাকা চলে না আমার।"

পার্থ অনুরোধের সুরে বলে, "আমি মাষ্টার মশাইকে বুঝিয়ে বলবো, অন্ততঃ আর দু'টো দিন যাতে অপেক্ষা করে যান। তুমি বাড়ী যাও। সন্ধ্যার সময় আমি দেখা করবো তার সঙ্গে।"

সন্ধ্যার বাতি দিতে চলেছে কুন্তী। পার্থ উঠোনে এসে দাঁড়ায়। উঠোনে পা দিয়ে অনুভব করে যেন এক মহাশোকে আচ্ছন্ন সমস্ত বাড়ীটাই।

দীনবন্ধু পার্থকে দেখে হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে আবার ম্লান হ'য়ে যায়। পার্থর দৃষ্টি এড়ায় না। একটু সংকোচ বোধ করে সেও। তবু বোঝাতে চেষ্টা করে সে দীনবন্ধুকে, "আপনারা আর ক'টা দিন দেখে যান। আমি কালই সদরে চলে যাচ্ছি। সেখানে আমার চেনা উকিল আছে। তার কাছে পরামর্শ নিয়ে দেবকীকে দিয়ে কেস করাব ছেলের জন্য। আমরাই সব ব্যবস্থা করে' দেবো। এতটুকু ছেলেকে কিছুতেই আটকে রাখতে পারবে না।"

একদিনের মধ্যেই সদর থেকে ফিরে আসে পার্থ। উকিলবাবুর কথায় যেটুকুও বা আশা ছিল মনে, তাও নিবে যায়। পার্থকে বুঝিয়ে দেয় অভিজ্ঞ উকিল, আইনের খাতায় ছেলের ওপর বাপের অধিকারই আগে। তবে অনেক সময় জজসাহেবরা অবস্থা বুঝে বিপরীত রায়ও দিতে পারেন। কিন্তু ছেলের মাকে যদি দুশ্চরিত্র প্রমাণ করে, তাহ'লে ছেলেকে পাবার কোনও আইন নেই মায়ের পক্ষে। তাই এখন জানা দরকার, যে চিঠিটা ছেলের বাবার হাতে রয়েছে, তা'তে কি লেখা ছিল।

সদর থেকে ফিরে এসে লক্ষ্মণকে দিয়ে দীনবন্ধুকে খবর পাঠায়। দেবকীকেও আসতে বলে দেয়। তার সঙ্গেও কথা আছে।

দীনবন্ধু দেবকী আর ইতিকে নিয়ে মনসাডাঙ্গায় যায়। সুবালা ক'দিন ধরে' জ্বরে পড়ে রয়েছে। জ্বরার্ত কণ্ঠে দেবকীকে ডেকে বলে, "একবার মনসাবাড়ী থেকেও প্রণাম করে আসিস। ছেলেটার বিপদ যেন কাটিয়ে দেন মা মনসা।

দেবকী এই প্রথম এল পার্থর বাড়ীতে। উঠোনের ওপর রোদে দেওয়া ধান বিছানো। পার্থর মা ধান ঝাড়ছে। মনে হয় দেবকীর, কি গভীর শান্তি-মাখা রয়েছে এ উঠোনের ধুলোতে, মাটিতে।

মঙ্গলা দেবকীকে দেখে উঠে আসে ব্যস্ত হ'য়ে। তক্তপোষের ওপর পাটি পেতে দেয়। "গরীবের ঘরে বসতে দেবারও কিছু নেই মা।"

দেবকী স্তিমিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, "কে যে গরীব, কে যে ধনী, তার হিসেব রয়েছে শুধু ভগবানের খাতায়। মানুষের সাধ্য নেই তার হিসেব রাখা।" পার্থ মন দিয়ে শোনে দেবকীর কথাগুলো। মঙ্গলা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাষা জোগায় না মুখে। ছাড়া ছাড়া প্রশ্ন করে। "কালই চলে যাচ্ছ? সেখানে কে আছে?"

দেবকী সংক্ষেপে উত্তর দেয়, "বড় মামা, মামী আছেন। আর আমার পরের বোন কেতকী, রয়েছে।"

মঙ্গলা উঠে যায় ইতিকে নিয়ে। রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বাটিতে করে মোয়া বের করে খেতে দেয়। মনে মনে আপসোস করে' বলে, এমন দিনেই এল মেয়েটা।

মঙ্গলা চলে গেলে পার্থ স্থির দৃষ্টিতে দেখে দেবকীর ম্লান মুখখানা। সমব্যথার সুরে বলে, "দেবকী, তোমাকে খবর দিয়েছি একটা প্রয়োজনীয় কথা জানতে। তার উপরই নির্ভর করছে জয়কে পাওয়া। একটা কথা জানতে চাই—।" মুহূর্তের জন্য সংকোচে বেধে আসে স্বর। একটু থেমে থেকে, যেন কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করে, "জানতে চাই, তুমি আমার কাছে যে চিঠিটা লিখেছিলে, তা'তে কি লেখা ছিল, মনে আছে কি তোমার?"

পার্থর এ প্রশ্নে মাথা নত হ'য়ে আসে দেবকীর এক আরক্তিম বেদনায়। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তার পার্থর কাছে। মুহূর্তের জন্য একটা লজ্জার আভাস হঠাৎ রাঙিয়ে মিলিয়ে যায় মুখের উপর দিয়ে। লক্ষ্য করে পার্থ। স্থির চোখে তন্ন তন্ন করে কি যেন দেখে সে। দেবকীর উত্তরের জন্য আরও

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। কিন্তু নিরুত্তর দেবকী। এ নীরবতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে' নির্বাক হ'য়ে যায় পার্থও। একটা ক্লেশকর বেদনার ছায়া নেমে আসে তার চোখে-মুখে। আর একটি কথাও বলতে পারে না সে। সমস্ত কথাই মৌন তিরস্কার হ'য়ে ঝড় তুলেছে ভিতরে। পাঁচ বছর আগের একটি অন্ধকার রাত্রি উঠে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। কাঞ্চনপুরের রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবকীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে—কোনদিন ভুলবে না তাকে। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে শুধু একটি কথাই স্মরণে রেখেছে সে, সুখে আছে দেবকী—তার স্বামীর সন্তানকে বড় করছে সে জননীর উত্তাপ দিয়ে।

মনে হচ্ছে পার্থর, যেন সেই চোদ্দ বছরের দেবকী আর সেই বাইশ বছরের পার্থই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে আজ আবার এত কাল পরে। পার্থ দুয়ারের চৌকাটে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দেখছে দেবকীর এ ভেঙে পড়া মূর্তি।

বিসর্জনের আগে যেমন করে প্রতিমাকে দেখে, তেমনি করে দেখছে পার্থ দেবকীকে। তার আধাজীর্ণ শাড়ির লাল পাড়, তার অবিন্যস্ত চুলের খোঁপা, অলংকার বিহীন হাতের শাঁখা, চোখের তলায় দুশ্চিন্তার কালি। যত্নহীন দেহের মালিন্যে গ্রাম্য মধ্যবিত্ত ঘরের সংগ্রাম চিহ্ন। তবু উনিশ বছরের নম্র যৌবনশ্রী অঙ্গে অঙ্গে,—কমনীয় সুডোল গ্রীবায়।

লক্ষ্মী তার মেয়েকে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। দেবকী মুক্তিকে কোলে নিয়ে চেপে ধরে বুকে। পার্থর দৃষ্টির কুহেলীতে কত অস্পষ্ট ছবি ছায়া ফেলে ফেলে চলেছে। জীবনের একটা অধ্যায় উল্টে পাল্টে দেখছে সে। কত স্পষ্ট আর কত অস্পষ্ট মানুষের মিছিল, হাজার হাজার কথার অশ্রুত ধ্বনি, কথার উত্তাপ। আর সে মিছিলের ফাঁকে ফাঁকে ভেসে উঠছে যেন যুগ-যুগান্তরের চেনা একটি মুখ—দুটি সুন্দর চোখ। কক্ষচ্যুত তারার মত মিলিয়ে যাচ্ছে সে মুখ, সে চোখ এ সমস্যাকুল সন্ধ্যাকাশের গাঢ় অন্ধকারে। চিন্তা-কাশের গভীর—গভীর অতলে এক সুদূর হৃদয় অনুভূতির রেশ ··কক্ষচ্যুত তারার গতিপথের মত।

পার্থ দীনবন্ধুদের সঙ্গে কাঠের পোল পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যায়। হাতে একখানা বই। অবিন্যস্ত চুল, চোখে সমস্যাকুল গাঢ় ছায়া।

আর একদিন পরই দেবকীকে নিয়ে রওয়ানা হ'বে দীনবন্ধু। দীনবন্ধু পোলের কাছে এসে বলে, "আর তোমাকে যেতে হ'বে না। পরশু রওয়ানা হচ্ছি। যাবার আগে একবার দেখা করো।" পার্থ হাতের বইখানা দেবকীর হাতে দেয়। গর্কির 'মা'। প্রথম পাতায় লেখা—"কল্যাণীয়া দেবকীকে—পার্থদা।" লেখাটায় চোখ বুলিয়ে দেবকী পার্থর চোখে চোখে একবার তাকায়। দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলে মুহূর্তের জন্য। কিন্তু কোনও কথা বলে না।

চোখের আড়াল হ'য়ে যায় দীনবন্ধু, দেবকী, ইতি।

পোলের ধার থেকে চ'লে আসে পার্থ। কিন্তু বাড়ী ফেরে না। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন পথ চলা। যতদূর চোখ যায়, শুধু পাকাধানে ভরা ক্ষেত। তবু মনে হয় পার্থর, জীবনের আস্বাদে পরিপূর্ণ এ শস্যস্নিগ্ধ ক্ষেতের বুকে জীবনের কত সকরুণ গান ভেসে বেড়াচ্ছে। সমস্যাভারাক্রান্ত পৃথিবীর প্রতিটি সমস্যা এ শীতার্ত হাওয়ায় থর্ থর্ করে' কাঁপছে প্রতিটি ধানের বুকে। শত শত দেবকীর অশ্রু এ বাতাসকে হিমেল করে তুলেছে। জীবনের কানা গলিতে গলিতে কত গোপন দুঃখ, কত অজ্ঞাত ব্যথার দীর্ঘশ্বাস। জীবনের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে শুনছে সে পৃথিবীর বেদনার ঐক্যতান। আজকের পৃথিবীর সবচাইতে জটিল সমস্যারই সাক্ষী দেবকীর ঐ অশ্রুসিক্ত চোখদুটি। এ সমস্যা অন্নের, এ সমস্যা প্রেমের। তাইত দেশে দেশে শুধু দেবকীরই প্রতিভূ দেখে সে। দেবকীরই চোখের ছায়া দেখেছে সে ভদ্রার চোখের তারায়। ভদ্রার চোখের ছায়া দেখছে সে দেবকীর চোখের তারায়।

হয়তো এ গ্রামে আর ফেরা হ'বে না দেবকীর। তার ভাই-বোন, মা-বাবা, আশৈশবের পরিচিত প্রতিবেশী, আর এই মাঠ, ঘাট, নদী, প্রান্তর সব ছেড়ে চলে যেতে হ'চ্ছে একটি মেয়েকে। কিন্তু কেন? কি অপরাধে তার এ শাস্তি? আলি মেঘীও দেশ ছেড়েছে, ঘর ছেড়েছে। কিন্তু তারা আবার নূতন করে ঘর

বেঁধেছে, সংসার গুছিয়েছে নূতন দেশে। জীবন সংগ্রামের প্রেরণা জোগাচ্ছে তাদের অন্তরের নিভৃত প্রেম। কিন্তু দেবকীর এ মূল ছেঁড়া প্রাণে আবার কি নূতন পাতা গজাবে কোনদিন? দেখা দেবে সবুজের আভাস?

পায়ের তলায় ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে মাটি। শীত বোধ করে পার্থ। খেয়াল হয় সন্ধ্যা হ'য়ে গিছে। সন্ধ্যার তারা জ্বলছে মাথার উপরে। কোন বাড়ীতে সুর করে ঝিঁ ঝিঁ ধরছে ছেলে মেয়েরা। ডাল সম্বরার গন্ধ ভেসে আসছে কোনও মুসলমান বাড়ী থেকে। কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ার শব্দ। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে কেরোসিনের কুপির আলো দেখা যাচ্ছে। কি মধুর এই গার্হস্থ্য জীবনের সুর! এমনি একটি জীবনের সুরে সাধা ঘরের কামনা ছিল হয়তো দেবকীরও। সে কামনাকে রূপ দিতে চেয়েছিল সে তাকেই জড়িয়ে— লতা যেমন করে বৃক্ষকে জড়িয়ে জড়িয়ে ভরে ওঠে ফুলে ফুলে।···কিন্তু বড় দুর্দিনে, বড় অসময়ে টের পেল সে তা'।

চাষী ভাইদের নিয়ে একটা ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে লক্ষ্মণ, আমিনুদ্দির বাড়ীতে। কৃষকদের সমস্যা সম্বন্ধে বলবে পার্থ। সন্ধ্যার দিকে বসবে এ মিটিং। লক্ষ্মণ দেবকীদের ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে ফিরে আসবে তার আগে। পার্থদের বাড়ীর গরুর গাড়ীতেই তাদের ষ্টেশনে যাবার ব্যাবস্থা হ'য়েছে।

শীতের ছোট বেলা। এখনই রওয়ানা হ'তে হ'বে। লক্ষ্মণ গাড়ীতে ছই লাগাচ্ছে। পার্থ বাদামগাছের তলায় অপেক্ষা করে দেবকীদের জন্য। একটা দমকা উত্তুরে হাওয়া বাদাম গাছটা থেকে কতকগুলো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে ছুটে চলে যায় দক্ষিণমুখে। আচমকা আর্তনাদের মত মনে হয় পার্থর।

দীনবন্ধু দেবকীকে নিয়ে এসে পৌছোয়। পার্থ লক্ষ্য করে দেবকীর গায়ের চাদরখানা। সাত বছর আগে এক শীতের রাতে রেখে গিয়েছিল সে চাদরখানা দেবকীকে মনে করেই। এ চাদরের তলায় কতখানি দুঃখ বয়ে নিয়ে চলেছে সে আজ, বেদনার সঙ্গে অনুভব করে পার্থ সমস্ত হৃদয় দিয়ে। গরু

গাড়ীতে উঠে বসে দেবকী। আধাজীর্ণ শাড়ির আঁচলে মাথায় সামান্ত ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদুরের অস্পষ্ট রেখা।

পার্থ সামনে দাঁড়িয়ে একটা ঠিকানা লিখে দেয় কাগজে। কাগজটা হাতে দিয়ে বলে, "যদি কখনও কোনও কিছুর প্রয়োজন হয়, এ ঠিকানায় খোঁজ করো।"

"শ্রীমতী ভদ্রা চৌধুরী—।" দেবকী ঠিকানাটায় চোখ বুলিয়ে নিঃশব্দে একবার তাকায় পার্থর মুখের দিকে। পার্থ সংক্ষেপে পরিচয় দেয়, "ওখানে এক হিন্দি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ইনি।"

দেবকী আবারও একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় পার্থকে।

গাড়ী ছেড়ে দেয়। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না দেবকী। ঠোঁট কেঁপে ওঠে। হু'চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

ধুলোর ওপর দাগ কেটে কেটে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে শুরু করে গরুর গাড়ীর ভারী চাকা হু'টো।

পার্থ চেয়ে দেখে, বহুদূরে কাঠের পোলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে হাফ্-সার্ট পরা একটি ছেলের পাশে ফ্রক পরা একটি মেয়ে—সাথী আর ইতি।

ক্ষেতের বাঁক ঘুরে চলে যায় গরুর গাড়ীটা। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দেখা দেবকীর শাড়ির আভাসটুকু মিলিয়ে যায় একটা বাঁশ ঝোপের আড়ালে। সে গতিপথের শেষ রেশটুকু এক প্রচ্ছন্ন বেদনার অভিমানে যেন স্তব্ধ হ'য়ে থাকে দূর বন অন্তরালে। অশ্রুহীন ক্রন্দনে ভরে উঠেছে পার্থর নির্বাক, বিদীর্ণ চোখ হু'টি। চারদিকে জমাট বাঁধা বিষণ্ণতা। দূর থেকে ভেসে আসছে গরুর গাড়ীর একটানা আর্তনাদ। ধূ ধূ করছে ক্ষেতের নিস্তব্ধতা। বহুদূরে পোলের ওপর তখনও দাঁড়িয়ে হুটি ভাইবোন—নিথর, নিশ্চল।

পার্থ দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, মিটিং-এর সময় হ'য়ে গিয়েছে। মন্থর পায়ে হেঁটে চলে আনিরুদ্ধর বাড়ীর দিকে।

প্রথম খণ্ড শেষ